স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু

স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু

তপনকুমার দাস

পরিবেশনায়
সৈকত প্রকাশন
৬, জেল-আশ্রম রোড ▫ আগরতলা- ৭৯৯০০৭
ফোন - (০৩৮১)২২২-৫৩৯৭ ▫ মোবাইল - ৯৪৩৬৪৬১১৭০

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SWAMI EKTI GRIHAPALITA JANTU

A collection of humorous short stories in bengali

by

TAPAN KUMAR DAS

ISBN : 978-81-7572-318-4

₹ 125.00

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবাশীষ দেব

লেখকের ছবি
অনুপ রায়

বর্ণবিন্যাস
অন্নপূর্ণা লেজার হাউস
১৩/১, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৯

গ্রন্থতীর্থ ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ থেকে এস.বি. নায়ক
কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন, ডা. এস. সি.
ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত

শ্রী শেখর আহমেদ-কে

লেখকের উল্লেখযোগ্য বই

গভীর গোপন
তিস্তা সব পারে
আজ মুন্নির বিয়ে
উড়ো খই
ভারতের লোককথা
চরণদাসের খড়মপুরাণ
কাপালিক সিদ্ধিবাবা
আতঙ্কিত বিজ্ঞানী
কাক পোষা বড়ো দায়
ছেলেধরা সান্তাক্রুজ
সাতমহলার তুলি
জেবুনের রূপকথা
পিকপিকে সিং
সেই রাজা আর নেই রাজা
ভীতু ভূতের গল্প
আজবপুরের পরীর রানি
স্বপ্নের নিয়তি
টুকরো হীরের দানা
বেড়াল মাসির শেয়াল মামা
লোককথার গল্প
আদিবাসী লোককথা
ঝিলিক মিলিক দুই শালিক
প্রাপ্তবয়স্কের গল্প (সম্পাদিত)
সাড়া জাগানো সেরা গল্প (সম্পাদিত)
শতক সেরা ছোটগল্প (সম্পাদিত)
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কবিতা (সম্পাদিত)
বণিতা বারবণিতা (সম্পাদিত)

ইত্যাদি

গৌ র চ ন্দ্রি কা

সেই গল্পটা মনে আছে নিশ্চয়ই?

সেই যে সেই রাজার গল্প। রানীর ভয়ে ভীত রাজা দরবারে বসে জানতে চাইলেন, তাঁর রাজ্যে কি এমন কোনও স্বামী আছে যে স্ত্রীকে ভয় পায় না? না মহারাজ, ঘাড়ে আমাদের অতো শক্ত মাথা নেই. উত্তরে জানিয়ে দেন সবাই। তবুও বিশ্বাস হয় না রাজার—একজন প্রজাও কি পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। নিশ্চিত বিশ্বাসে রাজার পেয়াদা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জড়ো করলো রাজ্যের তাবৎ স্বামীদের রাজময়দান প্রাঙ্গণে। উদ্দেশ্য ঘোষণা করে দিলো ঘোষক—উপস্থিত স্বামীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীকে ভয় পান তাঁরা চলে যান ডানদিকে। যাঁরা ভয় পান না বাঁদিকে থাকুন। ঘোষণা করতে দেরী হলেও ছুটতে দেরী হলো না স্বামীদের। হৈ হৈ শব্দে মাঠ উজার করে স্বামীরা ছুটলেন ডানদিকে। দেখে শুনে হঠাৎ হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন রাজা—দেখেছ, একজন স্বামী অন্ততঃ পাওয়া গেছে, যার স্ত্রী-তে ভয় ডর নেই। সত্যিই তো! সবার চোখ ঠিকরে পড়ল বাঁদিকে উপস্থিত একমাত্র স্বামীটির প্রতি। আদেশ দিলেন রাজা, বুলাও স্বামী-জীকো! ইনাম দেও স্বর্ণমুদ্রামে! অতএব আহ্বান গেল স্বামীটির কাছে। সত্যিই তুমি ধন্য হে! বললেন রাজা, আমার রাজ্যের মান সম্মান বাঁচালে। তা বাপু, তুমি কি সত্যিই ভয় পাও না স্ত্রীকে? রাজার প্রশ্ন শুনে ফ্যালফেলে মাছের চোখ মেলে রাখেন স্বামীটি। সবাই যখন ডানদিকে গেল, তুমিই একমাত্র বাঁদিক মুখো হলে, বুঝিয়ে বললেন রাজা। আমি তো স্যার অতশত বুঝিনি, হাত জোড় করে মুখ খোলেন স্বামী, এখানে আসার আগে বউ আমার পইপই করে বলে দিলো যে, ব্যাটা মিনসে, খবরদার! সবাই যে দিকে যাবে, সেদিকে কিন্তু পা-ও মাড়াবে না। তাই তো আমি বাঁদিকে—

দাম্পত্য জীবনে দম দেওয়া পতিকূলের যতো অধিবাসী সবাই আমার বাঁ-দিকে। দিগ্‌বিদিক শূন্য হয়ে কর্ষণহীন বেঁচেবর্তে থাকার চেয়ে বাঁদিকে থাকাই শ্রেয়। দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন মেনে চলতে হবে যে! দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ 'স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসন' প্রয়োজন এবং এই আইন 'বিবাহিত পুরুষের উপর বিধান' খাটানোর জন্য। স্বামীর সংজ্ঞা কি? বঙ্কিম মতে ইংরাজীতে 'A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.' বাংলায়—'কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।' দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনে ২(ক) ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।' উক্ত আইনানুসারে 'গোরু বাছুরও স্বামী নহে' কারণ 'তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে।'

পদকর্তা জ্ঞানদাস আক্ষেপ করেছেন, 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্দিলুঁ/অনলে পুড়িয়া গেল/অমিয়া সাগরে সিনান করিতে/সকলি গরল ভেল।' না বাপু, ছত্রে ছত্রে অতো আক্ষেপ না করে ছত্র-পতি হয়ে স্ত্রী-র ছত্র-ছায়ায় সুবোধ ছাত্র হয়ে থাকতে ক্ষতি কি? আইনের সংসারে অসীম ক্ষমতা যাঁরা অধিকার করে আছেন সেই অধিকারিনীদের অধিকারের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে জ্যান্ত শহীদ হয়ে বেঁচে থাকার কি কোনও মানে হয় না। শহীদ বেদীতে তবুও বছরে কেউ না কেউ একবার মালা দেয় (সারা বছর কাকপক্ষী 'আঁ' করলেও)। ভালোবাসার দিনটির, ক্ষণটির জন্যে, অপেক্ষা করতে হয়—আক্ষেপ দূরে নিক্ষেপ করে। স্ত্রীদের ভূমিকা অগ্রণী। তা হোক না, ঈর্ষা করে লাভ কি? গুণের গুণ-নিধি ওঁরা। চাণক্য শ্লোকে তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ—"আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।/যড়গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্ট গুণঃ স্মৃতঃ।।" স্ত্রীরা আহারে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, কর্মে ছয় ও ভোগবাসনায় (পুরুষের চেয়ে) আটগুণ বেশি ক্ষমতার ধারক। সুতরাং ক্ষমতাবানের (স্ত্রীর) কৃপা ধন্য হয়ে জীবনধন্য করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি তো কিছু নেই। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি....।

যতীন্দ্রকুমার সেন যতোই বলুন না কেন—'পত্নী ও পেত্নী শুধু 'এ' কারেতে ভিন্ন/তবে পেত্নী কিছু রসিকা, পত্নী সদা খিন্ন!'—স্ত্রীর ভূমিকা কিন্তু অনস্বীকার্য। ভাবকের ভূমিকা, অভিভাবকের ভূমিকা তাঁর। চোখে চোখে নজরদারির কেউ একজন না থাকলে স্বামীর বাউন্ডুলে হতে কতোক্ষণ? মনুষ্য জীবনে স্ত্রী রত্নের বিকল্প ধারণ যোগ্য রত্ন নেই। 'স্বামী ও স্ত্রী' রতনে রতন। শুধু চিনে নিতে জানতে হয়। বুঝে নিতে বুঝতে হয়। নইলে ঠক্কর। আর ঠক্করের চক্করের মতো অমন রসালো কালমেঘ-রস কি আর পাওয়া যায়? চাণক্য শ্লোকেই বলা আছে—"সর্ব্বেষামেব রত্নানাং স্ত্রীরত্নং অনুত্তমম্।/তস্মাত্তদর্থনিরতস্তয়া ত্যক্তঃ ধনেন কিম্।।"—স্ত্রী রত্নই প্রধান, সুতরাং সেই রত্ন লাভে ব্রতী থাকা উচিত। স্ত্রীধন বিনা সব ধনই বিফল।

সংসারের যাবতীয় 'সার' স্ত্রী-র ভাণ্ডারে। সেই সার সঠিক পরিমাণে টবে (সং-এ) প্রয়োগ করলে তবেই না জীবনের গোলাপ প্রস্ফুটিত হবে। পদ্মপাতায় জলের বিন্দু। পাতাটি হচ্ছেন স্ত্রী। তাঁর বুকে জল বিন্দু—স্বামী টলমল টালমাটাল থাকবেন এটাই নিয়ম। দাম্পত্যের 'দাম' চুকাবেন পতিরা আর উপভোগ-এ অধিকার থাকবে পত্নীদের। প্রবাদ বাক্য তাই তো ধ্রুব—'সংসার সুন্দর হয় রমণীর গুণে'। আর গুণীজনেরা সর্বত্র পূজ্য (পূজ্যা?) এবং গ্রাহ্য (গ্রাহ্যা?)। দাম্পত্যে কলহ থাকলেও কোলাহল থাকে অনেক অনেক বেশি। কোলাহল মানেই তো আনন্দ, সুখ, উচ্ছ্বাস, আহ্লাদ। দাম্পত্যে জীবন সমর্পণ নিত্য-বৈচিত্র্যময়। যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয় রোজ। সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত। Gabriel Garcia Marquez বলেছেন, "The problem with marriage is that, it ends every night after making love, and it must be rebult every morning before breakfast."

দাম্পত্য জীবন ঘিরে টানাপোড়েন, চল দোলাচলের মহিমায় স্ত্রীর প্রভুত্ব বজায় রাখার বাসনা চিরন্তন। মুখ্য স্ত্রীর কাছে স্বামী গৌণ। স্বামীত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় স্বামীরা কিঞ্চিৎ প্রভু (স্ত্রী) ভক্ত হয়ে সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলে ক্ষতি কি? স্ত্রী ভক্ত এই লেখককে পথ বাতলেছিলেন আর এক ভীরু (স্ত্রী-ভয়ে!) সম্পাদক—শেখর আহমেদ। জায়গা দিয়েছিলেন তাঁর 'পত্রপাঠ'-এ (বিদায় না নেওয়ার নিমিত্তে)। এই বইয়ের প্রায় সব কয়টি লেখাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁকে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি। নান্দনিকের সঞ্জয় ভদ্র বইটি প্রকাশ করেছিলেন ২০০৬-এ। নবকলেবরে বর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশে আমার ইচ্ছাপূরণ করেছেন ভ্রাতৃপ্রতিম সন্দীপ নায়ক। তাঁর সঙ্গে আমার 'ধন্যবাদ' বিনিময়ের সম্পর্ক নেই, তিনি তাঁর কর্ম করেছেন, ফলেও আমার অধিকার নেই।

বইটির প্রতি নানান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আমার গুণী বন্ধুমহল। দেবাশীষ দেব, অনুপ রায় বইটিকে অলংকৃত করেছেন চিত্র বিচিত্র বৈচিত্রে ভরিয়েছেন, প্রচ্ছদের পট এঁকেছেন। তাঁদের প্রতি ঋণ মনের ভাণ্ডারে তোলা আছে।

আমার দু-একজন পাঠক-পাঠিকা, যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেন, প্ররোচিত করেন, তর্জনী তুলে সমালোচনা করেন, আরও ভালো লিখতে আদেশ দেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর এই সুযোগ কলম ছাড়া করতে চাই না।

বইটি উদ্দেশ্য দাম্পত্য জীবনে রসের আস্বাদন সংগ্রহ করার চেষ্টা। হয়তো কোনও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব মিশে গেছে—বাস্তবিক তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কাউকে আঘাত দেওয়া নয় বরং অনাবিল আনন্দে সেই আঘাতের প্রলেপ খোঁজাই বইটিতে প্রকাশিত গল্পগুলি ও প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। মিলনান্তক মিলে মিলমিশ করিয়ে দেওয়া। সে উদ্দেশ্য সফল হলে ধন্যবাদ না জানালেও ক্ষতি নেই কিন্তু অপারগতায় প্রাণ খুলে গালি দেবেন না প্লিজ।

সূ চি প ত্র

কলুর বলদ

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা যায় কিন্তু রসগোল্লা গেলা যায় না। পটলচেরা না হোক, আকাশচেরা চোখের ফাটলে অমন বিদ্যুৎ ঝলসে থাকলে অনুরোধের তাবৎ লোভে লাগাম টানাটাই বাধ্য ছেলের সাধ্য হওয়া উচিত। না মশাই না, রসগোল্লা আপনার চিম্‌টেয় ধরা থাক—আমার পিঠে চিম্‌টির জ্বালা সইবার মতো অত পুরু চামড়া নেই।

—মা, বাবা আবার রসগোল্লা নিচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা মেয়ের মুখের খবরটা শুনেই রাজভোগ মুখে পোরা গালফোলা গোবিন্দ, থুড়ি, মামনের মায়ের চোখ দু'টো ফুলে ওঠে ড্যাবা ড্যাবা ধমকে।

—আপনি তো রসগোল্লা ভালোবাসেন। তাছাড়া ব্লাডসুগার কিংবা ডাইবিটিস যখন নেই—

আর ভালোবাসা! জিভ চুঁইয়ে ঝরে পড়া লোভের জল কঁৎ করে না গিলে উপায় কি। গৃহকর্তার আপ্যায়নে আন্তরিকতা যতই থাকুক ভালোবাসা এখন পরাধীন। শুকনো কাঠের ঢেঁকিতে শর্করা কম, তাই অনুরোধে গিলে ফেললেও রক্তে মধু সৃষ্টি করে মধুমেহ ঘটাবে না। কিন্তু রসগোল্লা? নৈব নৈব চ।

—ঠাকুরপো, প্লিজ! ওকে আর রসগোল্লা দেবেন না। পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে, এখন একটু সংযম করতে দিন।

অনুরোধ আন্তরিক নয়, মুণ্ডু চিবিয়ে খাওয়ার মধু মাখানো আদেশ। এমন সুন্দর কথা বলার ভঙ্গী দেখতে দেখতে তাপসের এক-একবার মনে হয়, সাধনা রাজনীতি করলেই তো পারতো। এমন স্বাস্থ্যসচেতনতা, পরহিত চেতনা চৈতন্যের কোয়ালিটি, রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবা করলে দেশের উন্নতি না হোক, নতুন কোনও অবনতি হত না।

—কি যে বলেন বৌদি! দাদার যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে আপনার কত?

যা! মুখ ফসকে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে দিলে হতভাগাটা? মেয়েদের বয়েস নিয়ে কটাক্ষ? চুপ্‌সে গুম্‌রে মনের মাঝেই প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। মেয়েদের মন—কালবোশেখীর আকাশের মতো। ঈশান কোণ কালো করে

রাখলেও, তর্জন গর্জন করলেও শেষপর্যন্ত বর্ষণ হবে কি না—ভগবানের আবহাওয়া দপ্তরও অনুমান করতে কষ্ট পায়।

—আপনার কি মনে হয়? চাটনির বুকে ভেজানো পাঁপড় তো নয়, কড়্ মড়্ শব্দে হাড় চিবোয় সাধনা।

—না, মানে—এই একটু জোক করলাম আর কি! নিস্তার পাওয়ার অন্য উপায় খুঁজে না পেয়ে গদগদ হয় মিহির।

—তবু? ছাড়বার পাত্র নয় সাধনা। হরধনুর ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে—মনের ভিতরের ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দ্যাখোনি ভাব চেপে।

—কত আর হবে, তিরিশ?

—ওয়াক্! রসগোল্লার শেষ কুচি গলায় আটকে চোখ ঠিক্‌রে বেরোতে বাকি। বলে কি মিহির? মহিলা দেখলেই চনমনিয়ে উঠতে হবে? চকচকে রাখতে তেল ঢালতে হবে তেলা মাথায়! ঢাল, বাবা ঢাল। ক্ষতি নেই। কিন্তু তেল ঢালার পাত্রটাকে তো দ্যাখ।

—সাঁইত্রিশ। আমার তেরো, মায়ের যখন চল্লিশ বছর বয়েস—

—থাক তোমাকে আর বিন্যেস করতে হবে না। ঠোঁটে মাখানো জবা রঙ বাঁচিয়ে তর্জনী চুষে নিয়ে মামনকে ধমকে দেয় সাধনা। মিহিরের অনুমান উবছে পাক্কা সাত বছর বেমক্কা বাড়িয়ে দিলে কার না রাগ হয়?

—সে তো সার্টিফিকেটে লেখা ছিল। মজা করার ইচ্ছে হয় তাপসের?

—মানে? ঠিকুজি-কুষ্টি কিনা বিচার করেছিল তোমার মা? ভুলে গেলে? রাশি, গণ, নক্ষত্র? ভুলে গেলে সে সব কথা?—বেদেনী ঝাঁপির ঢাকনা খুলে ফোঁস করে ওঠে অভিযোগের সাপ।

—বাদ দিন ওসব কথা। মধ্যস্থতায় নামে মিহির, রান্নাবান্না সব ঠিক ছিল তো? আমাদের জানাশুনো ক্যাটারার। আরে গগনদা, আপনি তো কিছুই নিলেন না? না চিকেন, না পাব্‌দা—

কোনোমতে পাঁকাল মাছের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে চার-চারটে রো ডিঙিয়ে মিহির সটান সট্‌কে যায় গগনদার সামনে। জোরে জোরে ছ'বার নিঃশ্বাস নিয়ে তবেই শান্তি।

—দ্যাখো, তোমাকে একদিন নিষেধ করেছি—

—কী? দাঁতের ফাঁকে টুথপিক চালান করে তাপস।

—আমি জানি! মুখের ভেতর হজমিগুলি নাচাতে নাচাতে নেচে ওঠে মামন।

—কী? কী জানিস? ট্যাক্সির জানলা দিয়ে পথের আলোয় নজর ছুঁড়ে দেয় সাধনা।

—ওই যে, বাবা যেন তোমার বয়স নিয়ে খোঁটা না দেয়। হাততালি দেওয়ার মতো চটাপট জানিয়ে দেয় মামন।

—তা যা বলেছিস, মেয়েকে সমর্থন করে তাপস, কোনদিন শুনবি, বলে দেবে, তুইও তোর মায়ের চেয়ে বয়েসে ছোট।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে মজা পায় তাপস। ঠ্যা ঠ্যা হেসে ওঠে গাড়ির ঝাঁকুনির সঙ্গে নিজের শরীর ঝাঁকিয়ে। সে হাসির সুরে সুর মেলায় ট্যাক্সির ড্রাইভারও।

—নিজের বউকে যারা সবার সামনে ছোট করে....

গজ্‌গজে রাগে নিজের বক্তব্যের খেই ধরে রাখতে পারে না সাধনা।

—আহ! বাবা, চুপ করবে? মা কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই রেগে যাচ্ছে। বিচারকের ভূমিকায় নেমে পড়ে মামন।

তুলসিদা ঠিকই বলেছিলেন—গাড়ির অন্ধকারের ভিতর কানের লতিতে হাত ছুঁইয়ে নেয় তাপস।

তুলসিদা মানে তুলসি ভট্টাচার্য। সেতার শেখাতেন। বিয়ের আগে বারো বছরেরও বেশি সময় তাপস সেতার শিখেছিল তুলসিদার কাছে। ব্যাচেলার না হয়েও ব্যাচেলারের মতো থাকতেন তুলসিদা। স্ত্রী-পুত্রদের ছেড়ে পাক্কা সাতবাড়ি তফাতে। সেদিন সেতারের ক্লাস ছিল না তাপসের। বিয়ের নিমন্ত্রণ সারতে কার্ড হাতে সাতসকালেই পৌঁছে গেছিল তুলসিদার দমদমের বাড়িতে। ছাত্র-ছাত্রীদের কারো বিয়ের ব্যাপার উঠলেই বিরক্ত হতেন তুলসিদা। তাপসের বিয়ের কার্ড হাতে নিয়েই তেড়ে এসেছিলেন রে রে শব্দে,—বিয়ে করছ? করো, পয়সা খরচ করে গুচ্ছের অশান্তি আর অসুখ কিনতে চাইছ? কেনো!

—অশান্তি? অসুখ? অবাক হওয়া মনের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল তাপসের।

—নয় তো কি? সেতারের কান মলে জুড়ির তারে সুর বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিয়েছিলেন তুলসিদা,—অশান্তি? বুঝবে বছরখানেক পরে। এতদিন ঘুরতে ধম্মের ষাঁড় হয়ে, এবার ঘুরবে কলুর বলদের মতো। চাই চাই, নেই নেই, দাও দাও, করলে কেন, বললে কেন—এইসবই হবে ইমন, বিলাবল, খাম্বাজ, কানাড়ার সুর, গৎ। আর অসুখ? প্রথমে হাঁচি, তারপর পেটব্যথা, বুক ধড়ফড়, কোমরে যন্ত্রণা, অনিয়মিত মাসিকের গঞ্জনা, এ ডাক্তার ছেড়ে সে ডাক্তার। কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ ছেড়ে হিল্লিদিল্লি। ঘুরপাক আর ঘুরপাক খেতে খেতে, খেতে খেতে একদিন দেখবে অম্বল, বদহজম, মধুমেহ, হৃদবৈকল্য আর—

—কিন্তু...

—হ্যাঁ। তাই বলে কি আর কেউ বিয়ে করছে না? করছে। বিয়ে করেই বছর

ঘুরতে না ঘুরতেই দার্শনিক হয়ে উঠছে। জিজ্ঞেস করলে বলছে—এই তো জীবন। ঝগড়া মারামারি অশান্তির মরুভূমিতে মরীচিকা খুঁজছে। বিরাট নিঃশ্বাস ছেড়ে জানিয়েছিলেন তুলসিদা।

—ওসব জানি না। আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে। মা বারবার বলে দিয়েছেন। মিনতি করেছিল তাপস গুরুজির কাছে। তবু তাপসের বিয়েতে হাজির হননি তুলসিদা। পরে শুনিয়েছিলেন অজুহাত—একদম সময় পাইনি রে।

—বাবা কি ঘুমুলে? স্মৃতি-র পর্দার আড়ালে লুকিয়ে চুরিয়ে পুরোনো সে দিনের কথাকলি নিয়ে লোফালুফি খেলা শুরু করতে না করতেই হাঁড়ি ফাটানো চিৎকার মেলে দিল মামন।

—ঘুমাবে না? খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আছেটা কি? সাধে কি আর গণেশের মতো ভুঁড়ি হচ্ছে? মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয় মেয়ের মা।

হায় রে! চোখ বন্ধ করে পুরোনো সে দিনের কথা ভাববো তারও উপায় নেই? মনে মনে ভাবে তাপস। ধুস, চোখ মেলে রাখাই ভালো। কিন্তু কান? কান খোলা রাখার বড় জ্বালা। চোখ তবু খুলে রাখা যায়—কান খুললেই যত অশান্তি। কান যে কামানের মতো। বারুদ ঠেসে আগুন জ্বালায়। কানে ঠাসা বারুদের গোলা মুখ দিয়ে ছুঁড়লেই শুরু হয় সব অশান্তির গোল্লাছুট খেলা।

যাক বাবা। বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছনো গেছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের মতো একজন একক সংখ্যার তৃতীয় পুরুষের সামনে মা-মেয়ের তুবড়ি প্রতিযোগিতার ফাঁদে মুরগী তো হতে হবে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে তাপস। কিন্তু দড়াম্ করে দরজা টপকে নামতে গিয়েই মুখ টপকে ঠিকরে পড়ে আর্তনাদ—আঁ।

—কী হল স্যার? মিটারের অঙ্ক পড়া ছেড়ে জানতে চায় ড্রাইভার।

—গর্তে পা—

—পড়বে না? চোখেও যে চালসে ধরেছে। কাঁথা সেলাই শাড়ির আঁচল ট্যাক্সির সিটে রেখে আধখানা বুকের বিজ্ঞাপন বাতাসে মেলে গজগজ করে পথে নামে সাধনা।

—পা ভাঙেনি তো? বাবার পাশে এসে দাঁড়ায় মামন।

—ভাঙাই উচিত। কতদিন বলেছি, মিউনিসিপ্যালিটি না করে—তুমি করো। পাড়ার কমিটি করুক। এক লরি ঝামা কিনে—

—মশা মারতে কামান দাগি আর কি! পায়ের যন্ত্রণা ভুলে হিপ-পকেটের ওয়ালেট ছোঁয় তাপস, —কত ভাই?

—দেখলেন ভাই? শুনলেন লোকটার কথা? নিজের বাড়ির সামনে গর্ত? ঝামা কিনে ভরাট করলে লাভটা কার হবে?

—এক লরি ঝামা কি হবে মাসিমা, এইটুকু তো মোটে গর্ত। দু'টো থান ইট চাপা দিলেই তো—

—থাক, আপনাকে আর ওকালতি করতে হবে না। খুব বোঝা গেছে। একটুকরো ঢিল জুটছে না—উনি শোনাচ্ছেন থান ইটের গল্প। এক ধমকে ড্রাইভারকে থামিয়ে দেয় সাধনা। রাগে ঝিমঝিম করে মগজের যতো কোষ। কত বড় সাহস। তাকে কি না বলে 'মাসিমা'? কেন, 'বৌদি' বলতে লজ্জা করে। ফুঁসে ওঠে মনে মনে। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়,—আয়, চলে আয়।

—ম্যাডাম খুব রাগী। তাই না স্যার?

কি আর উত্তর দেবে তাপস। ট্যাক্সি ড্রাইভারের এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাও করে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢোকে কোনওমতে।

ঘরে না আছে একদানা আর্ণিকা, না একটা ব্রুফেন ট্যাবলেট। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি দু'টো কৌটোই ভোঁ-ভাক্কা। হাবিজাবি ট্যাবলেটের ডাঁই। একটা পেনকিলার যদি ঘরে থাকে তখনই নানান ব্যথার কাতরানি শুরু হবে সাধনার। আচ্ছা, ওর পার্সটা খুলে দেখলে কেমন হয়? মনে মনে ভাবে তাপস। একটা-দু'টো ব্রুফেন মিললেও মিলতে পারে।

হ্যাঁ ঠিক, যা ভেবেছে তাই। গোড়ালির যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে মাতোয়ারা হয় তাপস। বাব্বা, একেবারে ট্যাবলেটের চেন। চকাস্ করে ভেঙে নিতে না নিতেই ঘুমচোখ ঠেলে বিছানার ওপর থেকেই গর্জে ওঠে সাধনা,—তাই ভাবি, আমার ব্যাগের টাকাপয়সাগুলো কোথায় যায়। ঘরের চোরে—

—কি যা তা বকছ? প্রতিবাদ করে তাপস। ভরসা মামনের অনুপস্থিতি। সে তো গেছে ঠাম্মার কাছে শুতে।

—রাতদুপুরে আমার ব্যাগ হাতড়াচ্ছ কেন? তাপসের হঠাৎ প্রতিবাদে একটু যেন মুষড়ে পড়ে সাধনা।

—হাঁতড়াচ্ছি কি আর সাধে? হাতড়াচ্ছি যন্ত্রণায়। সব পেইনকিলারগুলো ব্যাগে ভরে রেখেছে। হাঁটুর যন্ত্রণায় গোঙায় তাপস।

—পেইনকিলার ব্যাগে ভরে রেখেছি আমি? তড়াক্ করে বিছানায় উঠে বসে সাধনা।

—নয় তো কী এগুলো? ট্যাবলেটের ফয়েল সাধনার ভাতঘুম তাড়ানো চোখের সামনে মেলে ধরে তাপস।

—তুমি খেয়েছ?

—না খেয়ে উপায়? বলতে বলতে জলের বোতল হাতে তুলে নেয় তাপস।

বাঘিনীর মতো তাপসের হাতের ট্যাবলেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধনা,—তোমার মাথাটা একদম গেছে। নইলে পেইনকিলার ভেবে কেউ কন্ট্রাসেপটিভ—

—ধুস! হতাশার গহ্বরে পৌঁছে যায় তাপস,—একটু চুনহলুদও তো গরম করে দিতে পারতে?

—আমার দায় পড়েছে? মাঝরাতে এখন চুনহলুদ—পাড়ার ছেলেরা তোমাকে ঠিক নামেই ডাকত—আবার বিছানায় শরীর বিছিয়ে দেয় সাধনা।

রান্নাঘরে গ্যাস জ্বেলে চুন-হলুদ খুঁজে গরম করার চেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়াই ভালো। বিবেকানন্দের বাণীর প্র্যাক্‌টিকাল করার চেষ্টা করাই উচিত। ব্যথার জায়গা থেকে যোগবলে মন তুলে নেওয়া। ব্যথাও থাকল অথচ ভোগান্তিও হল না। মনের ভাবনা মনের ভেতর তলিয়ে দিতে দিতে বোতলের জল গলায় ঢালে তাপস। মুখে বলে ফেললেই শুনতে হবে সাধনার খোঁটা—পাড়ার ছেলেদের 'বলদা' ডাকার গল্প। কিন্তু 'বলদা' ডাকলেই তো আর সে বলদ হয়ে যাচ্ছে না। দাসদা, বোসদা, সেনদা, চ্যাটার্জিদা হলে বলদা হবে না কেন? নামই তো তার তাপসকুমার বল। পদবীর সঙ্গে 'দা' যোগ কী এমন অসম্মানের? যতই তোমার পদবী থাকুক 'সরকার' —বিয়ের পর এখন আমার দৌলতে 'বল'—মনে মনে আনন্দে মাথা দোলায় তাপস। কেউ যদি তোমাকে দিদির 'দি' জুড়ে 'বলদি' বলে ডাকে? বলদের স্ত্রীলিঙ্গ বলদি হয় না ঠিকই, কিন্তু গরু বোঝাতে—

সে যাক গে। যার যা ভাবনা। তবে হ্যাঁ, 'বলদা' শব্দটা শুনতে একটু কানে বাজে বইকি! ভাবতে ভাবতে আলো নিভিয়ে নিজের স্থান করে নেয় বিছানার এক কোণে। মামনের জন্মদিনে সমীর সেদিন ঠিকই বলেছিল রাজুকে। রাজুর সঙ্গে সমীরের অনেকদিন পরে দেখা তাপসদের বাড়ি।

—কেমন আছ সমীরদা? জিজ্ঞেস করেছিল রাজু।

কোনও উত্তর না দিয়েই জন্মদিনে ফোলানো এখানে ওখানে ঝোলানো বেলুন গুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সমীর।—এক দুই তিন চার—

—কথা বলছ না যে? কেমন আছ? নাছোড়বান্দা রাজু উত্তর না কেড়ে ছাড়বেই বা কেন!

—ওই ওকে জিজ্ঞেস করো—চোখের ঝলক নাচিয়ে জবাব দিয়েছিল সমীর।

—কাকে? অবাক রাজুর চোখে ছিল বিস্ময়ের প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

—কাকলিকে।—বারো, তেরো, চোদ্দো। সংক্ষেপ না আক্ষেপ বুঝতে না পেরে সমীরের ব্যবহারে আঘাত পেয়েছিল রাজু।

—বৌদি নয়, তুমি কেমন আছ জানতে চেয়েছি। ভুল বোঝাবুঝির জাল সরাতে

আবার বুঝিয়ে বলেছিল রাজু।

—আমিও তো সেই কথাই বলছি। হাঁড়ি না ভেঙে গম্ভীর হয়েছিল সমীর—জীবনের আসল ধর্ম তো পালন করলে না—বুঝবে কেমন করে, কোন প্রশ্নের উত্তর কার কাছে মজুত থাকে?

—তোমার মনেই বা এমন স্প্রিংয়ের প্যাঁচ কেন? মধ্যস্থতা করতে আসরে হাজির ছিল তাপস নিজেই।

—যাব্-বাবা! আমার কথায় তুমিও প্যাঁচ দেখলে?

কাঁচাপাকা গোঁফের নিচে ঠোঁটের গুহায় বিভীষিকা ছড়িয়ে কিছু বলার আগেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল কাকলি।

—কেমন আবার থাকবে, আপনাদের সমীরদা ভালোই আছে,—টকাটক্ উত্তর ঝরে পড়েছিল কাকলির শরৎ-শিউলির জবাবে।

—শুনলে তো? রাজুর গায়ে টোকা দিয়েছিল সমীর। আইবুড়ো ঢেঁকি কোথাকার। কোনও স্বামীর ভালো থাকা, মন্দ থাকার খবর থাকে তার স্ত্রীর কাছে।

—কেন বলো তো রাজুদা? চনমন করে উঠেছিল কাকলি।

—কেন? বোকার হদ্দ হয়ে ড্যাবডেবে চোখ মেলে দিয়েছিল রাজু।

—কারণ, স্বামীর স্মৃতি সত্ত্বা ভবিষ্যৎ বিয়ের দিনেই মালাঞ্জলি হয়ে যায় মালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে, বুঝিয়ে বলেছিল সমীর,—বিয়ে মানেই দশমীর সন্ধ্যা। স্ত্রীর কাছে স্বামীসত্ত্বার বিসর্জনের বাজনা। ঢ্যাম কুড়কুড় বাজনা—সত্ত্বা থাকবে কতক্ষণ.... সত্ত্বা যাবে....

—ওঃ, কিছুই বুঝতে পারেনি রাজু সেদিন।

—ভালো স্বামী আসলে গৃহপালিত জন্তু। আমরা যেমন পালন করব ঠিক তেমনিই পালিত হবে—তাই না সাধনাদি? সাধনার সাক্ষ্য প্রমাণের তোয়াক্কা না করেই নিজের বিচারে নিজেই জয়ের মালা পরেছিল কাকলি।

উম্। গোড়ালির যন্ত্রণাটা আবার টনটন করে ওঠে। অন্ধকারে নিজের মুখের আদল মেলাতে চায় ব্যথা ভুলে। পারে না। যন্ত্রণার গোঙানি রাতের নীরব বিছানায় বাজ পড়ার শব্দে বেজে ওঠে।

—আহ্! হলটা কি? সারাটা দিন পরে একটু শুয়েও শান্তি নেই? ঝন্‌ঝন্ শব্দে কাঁসার থালা নয়, সাধনার গলার বিরক্তি ঝরে পড়ে।

—না, গোড়ালিটা মনে হয় মচ্‌কে গেছে।—কোনওমতে যন্ত্রণার কারণ আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চায় তাপস।

—রাতদুপুরে অঃ আ করে কাতরালেই মচকানো ভালো হয়ে যাবে? অন্ধকারেও তাপস দেখতে পায় কোলবালিশ জড়িয়ে সাধনার পাশ ফিরে শোওয়ার ভঙ্গি।

মনে পড়ে সমীরের কথা। রাজুর কথা। কাকলির কথা। স্বামী কি সত্যিই গৃহপালিত জন্তু? স্ত্রী-প্রভুর মর্জি-জাবনায় মুখ রেখে শুধু জাবর কাটাই তার ধর্ম, শান্তি, স্বস্তি—সবকিছু? প্রভু তাকে বকবে ঝকবে, রুটির টুকরো ছুঁড়ে আদর করবে। আর স্বামী? গদগদ হয়ে শুধু লেজ নাড়াবে জীবনভর? দুঃখে যন্ত্রণায় হতাশায় গ্লানিতে কখনো ঘেউ ঘাঁক্ করবে না। করা উচিতও নয়, কারণ দুঃস্থ সংসারের ভাণ্ডারী তুমি—তুমি অভিভাবক, শান্তির সাদা পায়রার খাঁচা। সেই খাঁচায় প্রতিবাদের খোঁচা দিলে শান্তিভঙ্গ হবে যে!

গোড়ালির যন্ত্রণাটা আবার ফিরে আসে গোড়ালিতে। কিন্তু না, গোঙানির শব্দ এবার কিছুতেই ঠোঁটের বাইরে আসতে দেবে না তাপস। দু'হাতের তালুতে জোরে চেপে রাখে ঠোঁটের কপাট। কি যে ছিলো নাটকের সেই গানের কলি? মনে করার চেষ্টা করে—কেউ শব্দ করো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না—

শখ-আহ্লাদ

—বাবা!

—হুঁ!

—তোমার কোনো শখ নেই?

—নেই আবার!

ডাইনিং স্পেসের ঠিক সামনে রান্নাঘর। রান্নাঘরে এখন সকালের পিক পিরিয়ড। বন্দনাদি থাকলেও কুট্‌নো কাটা আর বাসন মাজা ছাড়া কিংবা কখনো সখনো রাইস কুকার খারাপ হলে ভাতের মাড় গালা ছাড়া অন্য কাজে তার ডাক পড়ে না। তবু বন্দনাদি আছে। রান্না করার দিদি। মায়ের দিদি, বাবার দিদি, মেয়ের দিদি। সকলের দিদি হয়েই জন্ম বন্দনাদির। রান্না করুক না করুক রাঁধুনী। মামনদের বাড়ি রাঁধুনি আছে। পড়শিরা জানে। জানে আত্মীয়-স্বজন। তাপসের বন্ধু-বান্ধব অতশত খবর না জানলেও সাধনার বান্ধবীরা জানে।

—ঘোড়ার ডিম আছে।

মায়ের কথার রেশে বাতাসে বুড়ো আঙুল ছুঁড়ে দেয় মেয়ে।

—কেন, সাতসকালে খবরের কাগজে মুখ গুঁজে কেচ্ছা-কাহিনী পড়ার অমন শখ ক'টা লোকের থাকে শুনি?

সাধনার গলার স্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কড়াইয়ের সম্বরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসুর ডালের বাঁধভাঙা বন্যা—ছ্যাঁক্!

—খবরের কাগজের মজা তুমি কী বুঝবে? রিডিং গ্লাসের আড়ালে থম্‌কে থাকা চোখদু'টো খবরের কাগজের বুকে সিঁটিয়ে রেখে পাল্টা প্রশ্ন করে তাপস।

—আমার বুঝে কাজ নেই।

—না বোঝাই ভালো। গেরস্তের বউ সংসারধম্মো নিয়ে—

—সংসার-ধম্মো! কড়াইয়ের ডাল ফুটে ওঠার ফাঁকে খুন্তি হাতে রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় সাধনা,—জেলখানাও এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

—দরখস্ত করে দাও মা।

—দরখস্ত? কিসের দরখস্ত? কোথায় দরখস্ত? খবরের কাগজের বুকে চোখ রেখেই অবাক হয় তাপস। মেয়ের পরামর্শের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করতে দেরি হয়।

—পেনশনের দরখস্ত।—এক টুস্‌কিতে ফাঁস করে মামন।

—তোমার বাবার মতো তো অমন আয়েশের চাকরি করি না যে পেনশন পাব। গলার স্বরে ধানিলঙ্কার ঝাল যথাসম্ভব মোলায়েম করে জবাব দেয় সাধনা,—আমার মতো খাটতে হলে বুঝতাম!

—তুমি না—চুলের গোড়ায় চিরুনির লাঙল চালায় মামন, —আমি কি সেই পেনশনের কথা বলেছি? তুমি জেলখানার কথা বললে, তাই...

—মানে? জেলখানা মানে? মা আর মেয়েকে একচোট লড়িয়ে দেওয়ার সুলুক খোঁজে তাপস।

—এই বাড়িটা মায়ের কাছে জেলখানার চেয়েও খারাপ। অর্থাৎ এই বাড়ির চেয়ে জেলখানা ভালো—পাকা দিদিমণির মতো বোঝায় মামন,—সুতরাং জেলখানার অভিজ্ঞতা মায়ের আছে। যাদের জেলখানার অভিজ্ঞতা আছে তারা—

—তো? খবরের কাগজ ছেড়ে চোখ বড় করে তাপস।

—দরখস্ত। ফ্রিডম ফাইটাররা পেনশন পায়, আর মা পাবে না? আফটার অল সাফারার। চিন্তা কোরো না মা—সাফারার পেনশন স্কীম চালু হল বলে। —মুখ টিপে হাসে মামন।

—কথার কি ছিরি! হবে না কেন? যেমন বাপ তেমনি না হলে কি আর মেয়ে? খুন্তি হাতে এন সি সি প্যারেডের 'পিছে মুড়' হয় সাধনা।

—দিলি তো সকালটা মাটি করে? একে বন্দনাদিকে বাজারে পাঠিয়েছে, তার ওপর তোর ফোঁড়ন। আজ ভাত জুটলে হয়!

তাপসের কথা বোধহয় কানে যায় না সাধনার। গেলে আর রক্ষে ছিল না। সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে অসুর নিধনে মেতে উঠতে দেরি করত না মোটেও। কড়াইয়ের ডাল ততক্ষণে ফুটে গেছে। মুসুরের সে ফুটন্ত ডাল স্টেনলেস স্টীলের ডেক্‌চি বন্দী করতে করতে পুরনো কাসুন্দি আবার ঝেড়ে দেয় সাধনা,—শখ। শখ করে কোনওদিন একটা জিনিস হাতে করে ঘরে তুলেছে? বউয়ের জন্যে না হোক মেয়ের জন্যেও লোকে শখ করে এটা ওটা কেনে।

—আনিনি? এবার প্রতিবাদ করতে ভুল করে না তাপস। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের মুঠো হাত 'চলবে না, চলবে না' বলার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সাধনার কানের গোড়ায়।

—কী? কী এনেছ শুনি?

—এই তো সেদিন কার্ডিগানটা আনলাম।

[illegible] মধ্যে ওই একটাই কম্মো। ধুম্‌সো বউটার গায়ে পড়া অনুবোধ [illegible]

[illegible] দাঁড়ানো ঠিক হবে না। বউগুলো পারেও বটে। সেই [illegible] ঠিক মনে মনে পুষে রেখেছে। ফি-বছর মেয়েটা শীতের

আগে চলে আসে অফিসপাড়ায়—শাল, সোয়েটারের পসরা নিয়ে। দাদা, কাকা, নিন না, দেখুন না—বলে গছিয়েও দেয় একে ওকে—চারমাসের কিস্তিতে শোধ করার সুযোগ দিয়ে। সঙ্গে অরশ্য ওর স্বামীটাও থাকে। কিন্তু মিইয়ে থাকে, ভিজে বেড়ালের মতো। দরদস্তুর খদ্দের বধ সবকিছুর দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে রাখে মেয়েটা। স্বামীর কাঁধে থাকে শুধু পসরার পাযান। পাক্কা সেল্‌সম্যান। গতর ঢলিয়ে, চোখ বাঁকিয়ে দেড়শ টাকার সোয়েটার তিনশ আর পাঁচশ টাকার শাল সাতশয় গছিয়ে দেয়। তাপসকে অবশ্য বাগে আনতে পারেনি এতদিন।

—সেটাও তো তুমি হাতিয়ে নিলে।—বাবার জায়গা এবার মেয়ে দখল করে।

—অ্যাই! ছোট মুখে বড় কথা বলছিস যে বড়? ওটা একটা রঙ? পরলে মানাত তোকে?—নিজের সমর্থনে নিজেকে সমর্পণ করে তড়পে ওঠে সাধনা,—কেন? এই যে এত মেলা হয়, এক্সপো হয়, একদিন শখ করে নিয়ে যেতে পারে না?

—সময় কোথায়? খবরের কাগজের শেষ পাতায় শেষবারের মতো চোখ বোলায় তাপস। স্নানে যাওয়ার সময় হল তো।

—শনি রবিবার সারা দুপুর ভস্‌ ভস্‌ নাক না ডাকালেই তো পারো। পিন্টুকাকুকে দেখে শেখো। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে কেমন শখ-আহ্লাদের জীবন কাটাতে হয়।

—রিম্পারা পরশুদিন অরাকু যাচ্ছে। —সংবাদ পরিবেশন করে মামন।

—সবাই যায়। বছরে অন্তত একবার একটু জেলখানা ছেড়ে বাইরের হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগিয়ে আসে। —মেয়ের কথার পিঠে কথার ইন্ধন জোগায় সাধনা, এমন লোক আমি জন্মেও দেখিনি বাপু। না আছে বেড়ানোর শখ, না কিছু কেনাকাটার, আর খাওয়া-দাওয়ার কথা তো স্বপ্নের চেয়েও অলীক। শুধু বাড়ি আর অফিস।

—আর ক'টা বছর পরেই তো রিটায়ার করব। মামনেরও বিয়ে হয়ে যাবে। তখন শুধু ঘুরব আর ঘুরব। আমি আর তুমি। তুমি আর আমি। বুড়ো আর বুড়ি। শখ মিটিয়ে আহ্লাদ ছড়িয়ে খালি ঘোরা আর ঘুরি। ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা ঘুরিয়ে দেবো একদম, স্নানে যাওয়ার আগে বেসিনের সামনে গালে-মুখে সাবানের ফোম স্প্রে করে তাপস।

—চলো না বাবা, কাছেপিঠে কোথাও! যেমন ধরো কালিম্পং কিংবা শিলং, কন্যাকুমারী কিংবা কোভালম, বায়না ধরে মামন।

—তা যা বলেছিস। জায়গাগুলো খুবই কাছে। এবেলা গিয়ে ওবেলা চলে আসা যাবে। রেজারের টানে গালের সাবান চষে নিতে নিতে উত্তর দেয় তাপস।

—শুনলি তো? সবসময় হেঁয়ালি, এড়িয়ে যাওয়ার সুলুক খোঁজা।

—আমার মাথায় কিন্তু একটা প্ল্যান আছে।

—কি প্ল্যান বাবা? মাকে টপকে বাবার সঙ্গে সন্ধি করে ফন্দি জেনে নিতে চায় মামন।

—বাস কেনার প্ল্যান। —রেজারের শেষ টান গালে বুলিয়ে নিজের মুখটা দেখে নিতে নিতে শুনিয়ে দেয় তাপস।

—*বাস না বাঁশ? মুরোদ তো জানা আছে। বিশ বছর চাকরি করে একটা* সাইকেল কেনার পয়সা যে জমাতে পারে না, তার বাঁশ কেনার কথাও মুখে আনা উচিত নয়, রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই ঝেঁকে ওঠে সাধনা।

—রুট পারমিট যোগাড় করতে কত হাঙ্গামা জানো?—মায়ের কথা কানে তোলে না মামন। শুধু বিজ্ঞের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় বাবার কানে।

—দরকার নেই, পারমিট কি হবে? —কথার ভাঁজে আফটার শেভ লোশনের জ্বালা ভুলতে চায় তাপস,—রিটায়ার করার পর টাকা-পয়সা যা পাব, একটা বাস হয়ে যাবে। বডিটা অবশ্য বানাতে হবে হিসেব করে। চেসিসের ওপর ড্রইংরুম, কিচেন বেডরুম সব হিসেব করে করতে হবে।

—বাবা!

—হুঁ।

—তুমি কি আজকাল কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখছ?

—কই, না তো। চারদিকে অত বাস্তুবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি, এখানে ব্যাঙ, ওখানে ড্রাগন সেখান হাসিমাখা বুদ্ধ রাখার চিন্তায় কল্পবিজ্ঞান পাত্তাই পাবে না!

—তবে যে বলছ বাসের চেসিসে কিচেন, বেডরুম?

—সব তোর মায়ের জন্যে। মায়ের ইচ্ছেতেই হবে। অনেকটা সাধুদের 'বোম্ তারা! কালি কালি!' বলার ঢঙে বলে তাপস। বাড়িটা তো তুই দখল করে আমাদের গলাধাক্কা দিবি। তখন শুধু বেড়ানো। সারাদিন, সারাদিন শুধু বেড়িয়ে বেড়াব। আর রাত্রি হলে কোথাও কোনো গাছতলায় গ্যারেজ করে—

—গাছের বিশুদ্ধ হাওয়া খেয়ে পেট ভরাবে। —শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে সাধনা—যত্তো সব আদিখ্যেতার কথা। শুনলেও পিত্তি জ্বলে যায়।

—মা!

—বলে ফ্যালো!

—আমি পিসিকে বলে দেব?

—কি?

—আমরাও ওদের সঙ্গে যাব!

—বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

—মা আর মেয়ের কথায় চমকে ওঠে তাপস। কল্পবিজ্ঞানের বাসের গল্প শিকেয় তুলে আঁৎকে ওঠে,—ছি মামন, বায়না করতে নেই। ওরা ওদের মতো বেড়াবে। তোমরা গেলে অসুবিধে হতে পারে।

—কেন? অসুবিধে হবে কেন?

—সে তুমি বুঝবে না।

—বুঝবে কেন? তোর বাবার টাকা খরচ হবে যে! কথাটা মন্দ বলেনি সাধনা। মনে মনে ভাবে তাপস। পিসি-পিসেমশাই তো নিয়ে যেতেই চায়। কিন্তু খালি হাতে তো আর মেয়ে-বউকে ছোট বোন-ভগ্নিপতির সঙ্গে পাঠানো যায় না। এই তো সেবার দিল্লি ঘুরে এল। গোবিন্দদের সঙ্গে। নেই নেই করেও সাড়ে তিন হাজার নগদে আর জিনিসপত্রে আরো দুই নামিয়ে ফিরল। সে ঘাটতি মেটানোর খেসারত এখনো গুনে চলেছে সুদে-আসলে। অতএব মা-মেয়ের কথার জালে বেশিক্ষণ আটকে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সুড়ুৎ করে বাথরুমে ঢুকে পড়ে মা-মেয়ের তেহাইয়ের হাত থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা করে।

তাপস বাথরুমে ঢোকার পরই মামন চলে যায় পড়তে, নিভা দিদিমণির বাড়ি। সাধনা আবার ফিরে আসে নিজের মন্দিরে, রান্নাঘরে।

—মাছ? আজ মাছ নেই বুঝি? ডালের পরে সাধনার সাড়া না পেয়ে ডাইনিং টেবিল থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তাপস।

—সপ্তায় কদিন বাজার করো? নেহাৎ অনিলটা বাড়ি বয়ে মাছ দিয়ে যায় তাই আঁশটে গন্ধ পাও। নইলে—

—একটা ডিম তো ভাজতে পারতে?

—ডিমপাড়াটা এখনো শিখে উঠতে পারিনি।

—কেন, ফ্রিজে ডিম নেই?

—ছিল, এখন জমে আইসক্রীম হয়ে আছে।

—সব কথাতেই বাঁকা বাঁকা উত্তর দেওয়া তোমার স্বভাব হয়ে গেছে। —ডাল-ভাত মাখা হাত জিভে চেটেপুটে নেয় তাপস। অফিসের পথে এখন ঝগড়া-ঝাঁটি করে মেজাজ বিগড়ে নিতে চায় না।

—সোজা কথা যাদের কানে ঢোকে না তাদের কানে উচিৎ কথাগুলো একটু বেঁকিয়েই শোনাতে হয়।

—তা আর হবে না? উকিলের মেয়ে বলে কথা! জলের গেলাস ঠোঁটের কাছে আনতেই বিষম। ভীষণ বিষমে কাশির দমকা ঝড় ছুটে আসে তাপসের বুকের ভেতর থেকে। কথার পিঠের কথা কেড়ে নেয় বিষমের ধাক্কা।

—কী? সহ্যের একটা সীমা আছে। তাপসের বিষমের কাশি গ্রাহ্যই করে না সাধনা। একটু আগে বললে স্বভাব। এখন আবার বাপ তোলা? কেন? উকিলের মেয়ে বলে কি মানুষ না? এই উকিলের মেয়ে ছিল বলেই তো বর্তে গেলে। বর্তে গেল তোমাদের চোদ্দ পুরুষ। কেরানির ঘরের কেরানি ছেলে উকিলের মর্ম বুঝবেটা কি শুনি? ঝাঁকা ভরে মাছ ডিম এনে ঘরে জিইয়ে রাখলেই তো পারো।

কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে তাপসের। কোনওমতে একঢোক জল

গলার ভেতর চালান করে ছুটে আসে বেসিনে। গড়গড় উগরে দেয় উচ্ছে ভাজা থেকে শুরু করে ফোঁড়ন দেওয়া মুসুরডাল পর্যন্ত গলাধঃকরণ করা যাবতীয় সামগ্রী।

—ভালো করে বেসিন পরিষ্কার করে যাবে। পাপ, বুঝলে পাপ! আমার বাবাকে তোলার ফল।—তাপসের চোখ উগরানো কাশি, দম বন্ধ করা বমি উপচে ধম্মো দেখার ধম্মোবাণী ছড়িয়ে গজগজ করে সাধনা।

বমি বন্ধ হলেও কাশি বন্ধ হয় না তাপসের। মাথা ঝুঁকিয়ে বেসিনের কল খুলে জিভ বের করে কাঠ-গ্রীষ্মের দুপুরে রাস্তায় দাঁড়ানো কুকুরের মতো লালা ঝরাতে থাকে।

—জল তুলতে কারেন্ট নষ্ট হয়। —দমকা হাওয়ার বেগে ছুটে এসে বেসিনের কল বন্ধ করে দেয় সাধনা।

—কী মামনের মা, দাদাবাবুকে ধরো। কাশতে কাশতে ফুসফুসটা বেরিয়ে আসছে যে। বেষম লেগেছে। বুকে পিঠে তেল-জলের হাত বুলিয়ে দাও না গো, বাজার ফেরৎ বন্দনাদি সব দেখে শুনে ছুটে আসে তড়িঘড়ি।

—বেশি আদিখ্যেতা না করে মালপত্তরগুলো গুছিয়ে রাখো গে যাও। —এক ধমকে বন্দনাদিকে থামিয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে মিলিটারি পা মেলে দেয় সাধনা।

চোখে মুখে জল দিয়ে বেসিনের বুক থেকে নিজেকে সামলে নেয় তাপস। আর দেরি করলে ন'টা সাতচল্লিশের ট্রেন স্টেশন ছেড়ে যাবে। ট্রেন ছেড়ে গেলে হাজিরা খাতা চলে যাবে বড়সাহেবের টেবিলে। মুখ কাঁচুমাচু করে কতদ্দিন আর ওয়াইফের শরীর খারাপের দোহাই দেওয়া যায়?

—এক গেলাস জল দেব দাদাবাবু? জিজ্ঞেস করে বন্দনাদি।

—দাও।

—তাহলে ওই কথাই রইল। কালবোশেখির গতিতে সামনে এসে দাঁড়ায় সাধনা,—আমি আজই ফোনে ছোটদিকে বলে দিচ্ছি রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে।

—এ বছরটা না গেলে হত না? কো-অপারেটিভে অতগুলো টাকা বাকি।—মোজার ভেতর পা গলাতে গলাতে খুসখুসে গলায় বলি হওয়ার আগে শেষ মন্ত্র শোনার চেষ্টা করে তাপস।

—ছা-পোষা কেরানিদের সারাজীবনই কোথাও না কোথাও ধার দেনা থাকে, থাকবেও। তাই বলে তোমার মতো সব শখ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে পারব না, একতরফা রায় শুনিয়ে দেয় সাধনা।

—ধার করে ঘি খাওয়ার কোনও মানে হয় না। বিড়বিড় করে তাপস।

—না হোক। তবু আমি খাব। স্বামী হয়ে যখন বিয়ে করতে পেরেছ, আর পাঁচজনের মতো স্বামীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করো—মেনিমুখো বিড়াল না হয়ে দাঁত বের করে নেকড়ে হওয়ার চেষ্টা করো। আঙুল তুলে চোখ পাকিয়ে পরামর্শ দেয় সাধনা।

তা যা বলেছ। মনে মনে বলে তাপস। মুখে প্রকাশ করার সাহস হয় না। স্বামীরা আসলে ভুল করে ফুলশয্যার রাত্রেই। গদগদ মেনিমুখো স্তাবক হয়ে নিজেকে সঁপে দেয় স্ত্রীর কাছে। হ্যাংলা মেনিরা যেমন পাত-কুড়োনো কাঁটাকুটির জন্যে দূরে বসে মিঁউ মিঁউ করে, ঠিক তেমনি। তারপর হাজার চেষ্টা করলেও সে মেনি বেড়ালটাকে মেরে নেকড়ে কিংবা সিংহ হয়ে ওঠা হয় না। ক্ষমতা অক্ষমতার সব ক'টা তীর তখন চলে যায় স্ত্রীদের হাতে। প্রতিবাদ করলেই বাদানুবাদ। অশান্তির চরম। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বরং অনেক সুখ। শখ-আহ্লাদ মেটাতে মেটাতে ফতুর হওয়া অনেক অনেক আনন্দের। ন্যাংটোর কি বাটপাড়ের ভয় থাকে? দু'কান কেটে কেমন সুন্দর সংসারে সংসারে লাজ-লজ্জাহীন ফুরফুরে আনন্দে ঘুরে বেড়ানো যায়!

—আমার টিকিটটাও কাটতে বোলো, —জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় তাপস।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ।

—যেতে পারো, কিন্তু একটা শর্তে।

—কি?

—পদে পদে কিন্তু বাধা দিতে পারবে না। —খোলসা করে শর্ত শুনিয়ে দেয় সাধনা—এটা খেয়ো না, ওটা কিনো না। তোমার বোন-ভগ্নিপতির সামনে আমার মাথা যেন হেঁট না হয়।

সাধনার মাথা হেঁট হোক না হোক তাপস মাথা হেঁট করে দরজা ডিঙিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। ন'টা সাতচল্লিশের ট্রেন ধরার চেয়েও বড় চিন্তা ঢুকিয়ে নেয় মাথার খুপরিতে—টাকার চিন্তা। বউ-মেয়ের বেড়ানোর শখ মেটাতে কড়ি জোগানোর চিন্তা নিয়ে পাড়ি দেয় অফিসের পথে, মনে মনে মুসাবিদা করতে করতে—পি.এফ.-এ ধার চাওয়ার কারণ কি দেখাবে? স্ত্রীর চিকিৎসা? মেয়ের হায়ার স্টাডি? মায়ের শ্রাদ্ধ? নাকি নিজের? কি? কী?

শাস্তি

ইচ্ছে থাকলেও কাজীর আদেশ অমান্য করা যায় না। কাজীর মতো কাজী হলে রাজি না হয়ে কী আর উপায় থাকে? নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছেকে ইচ্ছের ঘোড়ায় সওয়ার করাতে হয়।

তাপসের কাজীর নাম শেফালি পিসিমা। যেমন চেহারায় ভারিক্কি, তেমনি ভারি আদেশের ভার। সাত কথা দূরে থাক, এক কথাও বলেন না, বলেন ঠিক অর্ধেক। অর্ধেক কানে শুনে বাকি অর্ধেক মনে বুঝে জেনে নিতে হবে আদেশের বহর।

—কিন্তু পিসি, আমি, মানে আমাকে....

—শেফি পিসির রায় নিয়ে কেউ কখনো অমন আম্‌তা আম্‌তা করে না, কাঁধে হাত রাখে অরুণ। সাধনার চোখে চোখ লেপ্টে সাক্ষী সংগ্রহ করে,—তুমিই বলো বৌদি। বিয়ে বাড়িতে এখন কি কোনও কাজ আছে? সব কন্ট্রাক্ট দেওয়া। ক'দিন পরেই চালু হয়ে যাবে প্যাকেজ। সারাদিন ঘরে বসে করবেটা কি শুনি?

—না মানে, চেনা নেই, শোনা নেই, নতুন কুটুম বলে কথা!—মামাতো ভাই অরুণকে বোঝাতে চেষ্টা করে তাপস। তাছাড়া মামনটা যা দুষ্টু, তক্কে তক্কে না রাখলে কোথায় পড়ে ঝরে....

—ভূতের মুখে রাম নাম। শুনতেও ভালো লাগে, উদোম কালবোশেখির ঝড় নয়, ঝড়ের আগের থমথমে আঁধার ছড়ায় সাধনার গলায়,—তিন বছর ধরে মেয়েকে অনেক দেখেছ। আজকের দিনটা না দেখলেও চলবে।

—দেখিনি? যতক্ষণ বাড়ি থাকি....

—নারদ! নারদ! —হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে অরুণ।

—তিনটের সময় গাড়ি আসবে। —চারটে মোটে শব্দে শেষ রায় শুনিয়ে অন্য কাজে চলে যান শেফালি পিসিমা।

—তাপসদা, তোমরা সারাদিন ঝগড়া করো, অথচ একে অপরকে ছাড়া এক পা-ও চলতে পারো না। —সাধনা আর তাপসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মতামত ছড়ায় অরুণ।

—সে তুই বুঝবি না। আগে বিয়ে কর, তারপর বুঝবি, ঝগড়াটাই হল প্রেমের আসল....কী বলো? —খোসমেজাজি মেজাজ খোলসা করে সাধনার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাপস।

—ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে। চোখ জিলিপির পাকে বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে উত্তর দেয় সাধনা।

—অরুণ এক বালতি জল ঢেলে দে তোর বৌদির গায়ে। —একই ভঙ্গী এবং সুরে পরামর্শ দেয় তাপস।

—কেন, জল কেন? এখন তো জলযোগের সময়। চলো দেখি লুচি ভাজা হল কি না, —বয়সে মোটে সাতমাসের ছোট পিসতুতো ভাই হাত রাখে তাপসের কাঁধে।

—শুনলি না, তোর বৌদির গা জ্বালা করছে। আসলে কি জানিস, আমরা হলাম হাঁড়ি-কড়াইয়ের মতো। পাশাপাশি থাকলে হাওয়ার দোলায় ঠুং ঠাং তো একটু হবেই। কিন্তু অরুণ, তুই একবার পিসিমাকে বুঝিয়ে বল না, বিশু কিংবা খোকনকে পাঠাতে। —পুরনো প্রসঙ্গে দুলে দুলে ফেরে তাপস।

—কোথায়? —অবাক হয় অরুণ।

—কেন, বেহালায়। বরের বাড়ি।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? মা-কে বোঝাব আমি? —বলেই সাধনার সামনে আয়নার মতো দাঁড়ায় অরুণ, —তুমিই ঠ্যালা সামলাও বৌদি।

—পিসিমারও বলিহারি! সিলেক্ট করল একটা মেনি বেড়ালকে। এসব কাজে স্মার্ট লোক চাই, —অরুণ বোঝাক না বোঝাক, তাপসকে বুঝিয়ে ছাড়ে সাধনা,— অমন একটা মিনমিনে মিন্‌সে দিয়ে কেরানির চাকরি ছাড়া আর কিছুই করানো যায় না।

—কী! আমি স্মার্ট নই? —এত বড় বদনাম সহ্য হয় না তাপসের, —এখনো দশ-বিশটা মেয়েকে ভিরমি খাওয়াতে পারি, বুঝলে?

—ব্রেভো তাপসদা! ব্রেভো! হয়ে যাক চ্যালেঞ্জ।—তালহীন তালে নেচে ওঠে অরুণ। উৎসাহ দিয়ে উস্‌কে দিতে চায় তাপসের সাহস।

—মুরোদ জানা আছে আমার!

—দ্যাখো, আগুনকে হাওয়ায় উসকে দিও না বলছি!

—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করবে—তাই তো?

—চালিয়ে যাও বৌদি! জমছে!

—কী জমছে রে বড়দা? আজকের নায়িকা, মানে বিয়েবাড়ির কনে বুড়ি, গুঁড়ি গুঁড়ি পায়ে এসে দাঁড়ায় বৌদির কাঁধে হাত রেখে।

—মোটেও না। দাউ দাউ জ্বলে চোখ ঝলছে দেবে। —বুড়ি কিংবা অরুণকে তোয়াক্কাও করে না তাপস।

—সব্বোনাশ! তাহলে যে শঙ্কর নেত্রালয়ে ছুটতে হবে! —আগা-পাশতলা না বুঝেই বিয়ের দিনে কনেরা যে কত ফুরফুরে থাকে তার প্রমাণ ঢেলে দিয়ে আঁতকে ওঠে বুড়ি।

—ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। —চোখের ইশারায় বুড়িকে দেখিয়ে দেয় অরুণ, —চলো চলো, খাবে চলো।

—তুই কিন্তু সাক্ষী থাকলি। —এক কদম এগিয়ে দু'কদম পিছিয়ে যায় তাপস।

—কিসের?

—ওই যে, স্মার্টনেস আর মুরোদের।

—আলবাৎ। করো, কিছু একটা করে দেখাও,—সাক্ষরতার আবেদনমূলক পোষ্টারের স্লোগান নকল করে অরুণ, —এখনো উইথড্র করো বৌদি। নইলে বর আনতে গিয়েই কিন্তু কিছু একটা করে বসবে। তোমার বরটা হয়তো বর্বর হয়ে উঠবে। তখন কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।

—বললাম তো ভাই, আমার জানা আছে।

—তখন যদি তোমাকে জায়গা ছাড়তে হয়? —পরে এলেও একটু একটু বুঝে নেয় বুড়ি।

—জায়গা কেউ ছাড়ে না রে, ছাড়াতে হয়। —বাউল ফকিরের মতো উদাস হয় তাপসের গলা।

—একবার ছাড়ানোর চেষ্টা করে দ্যাখো—

—তোরা খেয়ে আয়। —তিনটি মাত্র শব্দে ভেতরের ঘর থেকে শেফালি পিসিমার নির্দেশ এসে ভাগ্যিস আছড়ে পড়েছিল, নইলে দশা যে কী হত কে জানে। কথার দফা বেড়ে বেড়ে বিয়েবাড়ির আনন্দটারই হয়ত দফারফা হয়ে যেত।

—মা, তোমাকে না একটা ঠাক্‌মা ডাকছে। —মামন এসে রফা করে দফারফা হওয়ার হাত থেকে বাঁচায় তাপসকে।

ঠিক তিনটে পনেরো মিনিটে গাড়ি পৌঁছে যায় বসুবাড়ির 'আঙিনা'য়। সাদার গায়ে সেলোটেপ ঠাসা লাল গোলাপের ছোপ মাখা গাড়ি। ফুলে ফুলে ফুলেল ঠিক নয়, নারায়ণ-অঙ্গে সেই অভিশাপের তুলসী ছাপের মতো ফুলো ফুলো ফুলে সাজানো। তা বর-বাহন একটু ফুলে ফোলা না হলে কি মানায়?

—তাপস! দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে—

—হ্যাঁ পিসিমা। —আর দুগ্‌গা বলা! দুগ্‌গার দশ হাত আর আয়ত-লোচন তাপসকেই অসুর বানিয়ে বধ করে ছাড়ে। খেয়ে উঠে কোথায় একটু প্যাণ্ডেলে বসে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গুলতানি করবে, তা নয়, বর-বাহনে একলা সওয়ার হয়ে নিজের মনে বেহাগ রাগে বেহালা বাজাতে বাজাতে ছুটতে হবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সেই বেহালায়—বুড়ির হবু বরকে বরণ করে আনতে, সঙ্গে বরানুগামীদের আগমনও সুনিশ্চিত করতে।

তিনটে ত্রিশ। উলু শঙ্খ ছাপিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে তাপসকে পিছনের সীটে

বসিয়ে রওনা হয় বর-বাহন। রবিবারের দুপুর। সুনশান রাস্তা। সোঁ সোঁ উড়ে চলে গাড়ি। গাড়ি ওড়ে আর সেলো টেপের ভাঁজ খোলে। সেলোটেপমুক্তো গোলাপের ফুলঝুরি ঝুরঝুর লোটায় পিচ-পাথরের রাস্তায়। চোখ বুজে ঘুম ঢুলু ঢুলু সওয়ার তাপস অবশ্য কিছুই জানতে পারে না।

—ম্যা গো! সাজানোর ছিরি দেখেছ? —বেহালায় পৌঁছে বরের বাড়ির অভ্যর্থনা কানে ঢুকতেই ধড়ফড় উঠে টান টান হয় তাপস। টান টান না হয়ে কি উপায় আছে! কোলাহলের হলাহল কি কম? কোথায় অভ্যর্থনা করবে—কনের বাড়ির আত্মীয় এসেছে, তা নয় সাজ গোজের ছিরি নিয়ে পড়লো। তা পড়ুক, বিয়ে বাড়ি একটু সাজগোজের দরকার হয় বই কি!

—ও মশাই, আপনি কনের কে হন জানিনে। তবে পষ্ট বলে দিচ্ছি, এ গাড়িতে আমরা বর পাঠাব না। এতবড় গাড়িতে ওই ষোলোটা গোলাপফুলের কুঁড়ি? ম্যা গো!

—আঃ বনি, চুপ কর! মৃদু ধমকে দেন প্রৌঢ়া।

—কেন মাসি? বনি চুপ করবে কেন? এটা কোনও বিয়ের গাড়ি সাজানো হয়েছে? ক'গাছা গাঁদার মালা ঝোলালেও...

বনির সমর্থনে আত্মীয়-নদীতে সাঁতার কেটে সামনে এসে দাঁড়ায় ধুমসো বউটা।

—তুমিই বলো রিণিবৌদি! —রি রি জ্বলে ওঠে বনি।

—দেখুন, গাড়ি ঠিকই সাজানো ছিল, —এতোক্ষণে নজর পড়তে মিন্ মিন্ করে তাপস, —আসলে হাওয়ায় সেলোটেপ খুলে—

—তা মশাই, যে রাস্তায় হাওয়া ছিল না সেখান দিয়ে আসলেই তো পারতেন। —থল্‌থলে রিণিবৌদি থম্‌থমে গলায় জানিয়ে দেয়।

—আঃ! কী শুরু করেছিস তোরা! নতুন কুটুম কী ভাববে বল তো? —সামনে এসে দাঁড়ান এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক,—আসুন, বাবা আসুন! আমি মিন্টুর কাকা। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। গাড়ি সাজানোর ব্যবস্থা আমি এক্ষুনি করে দিচ্ছি। —বলেই মিন্টু, মানে বর, মানে পাত্র, মানে আজকের নায়কের কাকা হাঁক দেন ডেসিবেলের শেষ চূড়ায়,—রতন, যা তো গাড়িটা নিয়ে।

—কোথায়? —একরাশ আত্মীয়ের ঢেউ ঠেলে শুধু রতনের জবাব ভেসে আসে, রতন নামক মনুষ্যটির আকৃতির টিকিটিও দেখা যায় না।

—গোপা নার্সারিতে! প্রাণগোপালকে আমার কথা বল গিয়ে। —মিন্টুর কাকা সমান পর্দায় জানিয়ে দেন, রজনীগন্ধার নেট আর মালা দিয়ে সাজিয়ে দেবে।

—ঘেঁটু, ধুতরো আর আকন্দ নয় কেন? রিণরিণ বেজে ওঠে রিণিবৌদির গলা। অমনি মেয়েমহলে ছড়িয়ে পড়ে খিল্‌খিল্ ধ্বনি।

—বেঁচেবর্তে থাকলে তোর মেয়ের বিয়ের গাড়ি আমি সাজিয়ে দেব—কুমড়ো

ফুলে। —সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন মিন্টুর কাকা।

—কুমড়ো ফুল? —এতক্ষণে সামনে চলে আসতে পারে রতন।

—গাড়িও সাজবে, বড়া ভাজাও খাওয়া হবে। —সাফ জবাব মিন্টুর কাকার। এসো বাবা, এসো! ওদের কথায় থেকো না। সব ফাজিলের দল। প্রাণগোপালকে বলবি একটু কমসম নিতে। —বলেই তাপসের মুখোমুখি দাঁড়ান মিন্টুর কাকা, —দাও বাবা, শ-পাঁচেক দিয়ে দাও। বাকিটা না হয় আমরা বুঝে নেব।

—শ-পাঁচেক? লগনশা-র বাজারে হাজারের কমে কথাই কইবে না। গাঁদা ফুলেরও আকাশ ছোঁওয়া দাম—ঘোর আপত্তি করে রতন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, সাতশ-ই দিয়ে দাও। কী করবে বলো, হাওয়ারা যে ভীষণ দুষ্টু হয়। সেলোটেপ খুলিয়ে ফুল ফেলে দেয়। হাওয়ায় সেলোটেপ খুলে না গেলে তো আর এই গচ্চা দিতে হতো না।

সব্বোনাশ! পাথর হয় তাপসের শরীর। এখন সাতশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হবে গাড়ি সাজাতে? আর এ টাকা শেফালি পিসিমা কিংবা অরুণ কারো কাছ থেকে আদায়ও করা যাবে না। সাধনা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে। সাড়ে চার হাজারের সোনার ওপর আরও সাতশ! জ্বলে উঠবেই বা না কেন? জ্বলারই তো কথা, টাকাপয়সার এমন জলাঞ্জলি কোন বউই বা পছন্দ করবে?

—দিন দাদা, তাড়াতাড়ি। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এরপর দেরি করলে রাত দশটার আগে রওয়ানা হওয়া যাবে না। —হাত পাতে রতন। অগত্যা হিপ্ পকেট থেকে হিপ্ হিপ্ হুররে-র ঢঙে গুনে গুনে সাতশ টাকা উড়ো খই বের করতে হয় তাপসকে।

—আমি মিন্টুর মা! তুমি বাবা কৃষ্ণার কে হও? থাক থাক! —ধব্‌ধবে দুধসাদা থান পরিহিতা পৃথুলা ভদ্রমহিলা ধরে নেন নতজানু তাপসকে।

—কৃষ্ণা? কৃষ্ণা কে? অবাক হয় তাপস।

—ও মা! শোনো কথা। মেয়ের বাড়ি থেকে বর নিতে এয়েচ অথচ কনের নামই জানো না? তা বাপু তুমি কি কোনও আত্মীয় না ভাড়াটে? আজকাল তো বিয়ে-সাদিতে সবকিছুই ভাড়া পাওয়া যায়। বর নিতে আসার লোকও ভাড়ায় পাওয়া যায় নাকি? —অবাক হন মিন্টুর মা।

—ও, বুড়ির কথা বলছেন? —খোলসা করে জানতে চায় তাপস। আসলে আমাদের ভাইবোনদের ছোটবেলা থেকে এতো মিলমিশ যে কারও ভালো নাম মানেই থাকে না।

—বড়দা! 'বুড়ি'! বুঝলি? আমাদের নতুন বৌদি বুড়ি। —ধিতাং ধিতাং নাচতে নাচতে পাশের ঘরে খবর পৌঁছোতে রানার হয় রিণি।

—বুড়ি, মানে কৃষ্ণা আমার পিসতুতো বোন। —আগের রেশ টেনে পরিচয়

পর্বের রাশ খোলে তাপস।

—তবুও ভালো, মাসতুতো বলেননি। মাসতুতোতে আবার একটু ইয়ে-টিয়ের গন্ধ-বাতাস পাওয়া যায় কিনা। —ডাঙায় ছাড়া কই মাছের মতো খলবল করে রিণিবৌদি। রাগে পিত্তি জ্বলে তাপসের। একে সাতশ টাকা নগদ খসার ফোস্কা, তার ওপর চ্যাটাং চ্যাটাং সব কথায় ছ্যাঁকা। কি কুক্ষণেই যে বিয়েবাড়ি ঢুকেছিল কে জানে।

—তুমি বসো বাবা। আমি একটু ওদিকটা সামলাই। সময় মতো রওনা না করালে ওরা রাত কাবার করিয়ে দেবে।

বাতে ফোলা শরীর তুলে ভেতরে চলে যান মিন্টুর মা।

সুনশান ঘরে বন্‌বন্ পাখার হাওয়া কাটানো ছাড়া কোনো শব্দ নেই। একা তাপস বসে বসে শাস্তির মেয়াদ কাটায়। এ বাড়ির মেয়ে-বউগুলো যেন কেমন। কথাবার্তায় লাগাম নেই একটুও। শুধু কি মেয়েরা? মিন্টুর কাকা, রতন—সব হাড়-চশমখোর।

—নাও বাবা, চা খাও! সব বরযাত্রী হওয়ার সাজুগুজুতে ব্যস্ত। কুটুম বাড়ির লোক, এক কাপ চা করে দেবে সে ফুরসতও নেই। তা এ আমাদের নিতাইয়ের চা, ভারি ভালো বানায়। দোকানটাও তো দেখলে, ঠিক বাড়ির উল্টো দিকে। বিস্কুট খাবে?

—না না, থাক। মাটির ভাঁড়ে ঠাণ্ডা চা মিন্টুর কাকার হাত থেকে নিজের হাতে নেয় তাপস। মনটাও যে চায়ের জন্যে আনচান করছিলো।

—লজ্জা করো না। চা-টুকু টুক্ করে খেয়ে নাও। রতন এলেই মিন্টুকে রওনা করিয়ে দেব। বাপন বাস আনতে গেছে। তা বাবা বাসের ভাড়াটা সঙ্গে এনেছ তো?

মিন্টুর কাকার প্রশ্ন শুনে গলার কাছে চা আটকে একদলা কাশি ঠেলে ওঠে তাপসের মুখে। কাশির গমকে শরীর নড়ে, শরীর নড়ার দাপটে ভাঁড়ের চা চল্‌কে পড়ে পাঞ্জাবিতে। ইস! আর একটা ইস্যু হলো। সাধনার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া বিয়ের গরদের পাঞ্জাবী—ভাঁড়ের চা ভেসে কলংকিত হয়ে গেল। সে কলঙ্ক ঘোচাতে ঝাড়ের পরিমান যে কতটা হবে কে জানে?

—আমাকে তো পিসিমা তেমন কিছু বলে দেননি!

—ও! আচ্ছা, আমি দেখি কি করা যায়। —বলতে বলতে প্রস্থান করেন মিন্টুর কাকা। আর তাপস? নিথর স্থবির বসে ভাবতে থাকে পালাবে কি না। সাতশ টাকা আক্কেল সেলামি দেওয়ার পর পকেটে হয়ত বড়জোর শ-খানেক থাকতে পারে।

—দাদা! প্লীজ আপনি একটু পাশের ঘরে বসবেন? আমরা চেঞ্জ করব। —রিনির সঙ্গে আরো পাঁচ-সাতজনের এক তন্বী বাহিনী কুইক মার্চ করে ঢুকে পড়ে ঘরে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। —দাঁড়িয়ে দরজা-মুখো হয় তাপস।

—আসুন এই ঘরে বসুন। চা খাবেন? জানতে চায় বনি।

—না, না! এই তো খেলাম। হাতের ভাঁড় প্রমাণ স্বরূপ তুলে ধরে তাপস।

—রিণিবৌদি দরজা খোলো। —পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দেয় বনি।

—কেন রে? এখন খোলা যাবে না, কাপড়-চোপড় খুলে পাউডার মাখছি। ভেতর থেকে একেবারে খোলামেলা জবাব ভেসে আসে।

—আসুন, মিন্টুদার ঘবে বসবেন আসুন। দমাদম্ পা মেলে ডাইনিং স্পেসের স্পেস টপকে আর এক দরজার সামনে হাজির হয় বনি, —ভেতরে কে?

—আমরা।

—যাক, পুরুষ কণ্ঠ, সোয়াস্তি পায় তাপস।

—তোমার এখনো হয়নি মিন্টুদা? —জানতে চায় বনি।

—না, একটু দেরি হবে। —ভেতরে থেকে জবাব আসে।

—কি রে বনি, অমন ছটফট করছিস কেন? মিন্টুর দরজার সামনে তাপস ও বনির আসরে হঠাৎ অবতীর্ণ হন মিন্টুর মা।

—দ্যাখো না জ্যেঠিমা, ভদ্রলোককে কোথায় যে একটু বসাই! —নিজের অসহায় অবস্থা জানিয়ে দেয় বনি।

—সময়টা বড্ড খারাপ বাবা। সব ঘর মেয়েদের দখলে। বসো না, এখানেই বসো।

ডাইনিং স্পেসে ডেকরেটরের চেয়ার দেখিয়ে দেন মিন্টুর মা। আর তাপসকে মিন্টুর মায়ের হাতে গুঁজে পালিয়ে বাঁচে বনি।

—না না! আমি বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। —বিনয়ে গদগদ হয় তাপস, পালানোর পথ খোঁজে।

—ঠিক আছে বাবা, এক্ষুনি ওরা রওনা হবে। বেশী দেরি করো না কিন্তু! —তাপসকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাজ তদারকি করতে চলে যান মিন্টুর মা।

বাড়ির বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তাপস। নিঃশ্বাস নেয় বুক ভরে। আর এক ভাঁড় চায়ের ইচ্ছে উঁকি দেয় মনের ভেতর। বাড়ির সামনেই চায়ের দোকান। কিন্তু ভয় করে, যদি কেউ দেখে ফেলে। কনেপক্ষের লোক বরপক্ষের দুয়ারে দোকানে দাঁড়িয়ে ভাঁড় হাতে চা পান করবে?

—দেখুন দাদা! কেমন হল?—ভাবনার পাথারে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থামায় রতন। হাজারখানেক খরচ করলে আরো ভালো হত।

—সুন্দর! খুব সুন্দর হয়েছে। আমাদের সাজানোটাও খারাপ ছিল না। আসলে সেলোটেপগুলো হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারায়....। তারিফ করে তাপস সঙ্গে আত্মপ্রচারও।

—এ যা সাজানো হয়েছে না দাদা, হাওয়া কেন, তিনশ মাইল বেগে সাইক্লোন হলেও কোনো ভয় নেই। গাড়ি উড়ে যাবে কিন্তু সাজ নষ্ট হবে না।—বলতে বলতে বাড়ির ভেতর নিজেকে চালান করে দেয় রতন।

না, বেশিক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গজায়মান পাড়ার বাড়িগুলো অবলোকন করতে হয় না তাপসের। ঢাউস একটা বাস বর-বাহনের পিছনে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। টুকটাক বয়স্ক বরযাত্রীরা শুরু করেছেন সওয়ার হতে। হঠাৎ দিগ্‌বিদিক চমকে শঙ্খ উলুধ্বনি মুখরিত হয়। সঙ্গে জনাতিনেক কাপ্তেন-মার্কা যুবক আর ডোন্টকেয়ার মার্কা বৌদির দঙ্গল বেষ্টিত হয়ে মিন্টু এসে চেপে বসে বর-বাহনের পিছনের সীটে। যাক, বাঁচা গেল। হন্ হন্ পায়ে এগিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসার উপক্রম করে তাপস।

—আরে আরে, আপনি উঠছেন কেন? সাতজনের জায়গা হবে না।—ঠন্‌ঠন্ করে ওঠে রিণিবৌদি।

—না, মানে আমি না থাকলে রাস্তা চেনাবে কে?

—কেন, ড্রাইভার! ড্রাইভার রাস্তা চেনাবে, এতক্ষণ চিনে যখন আসতে পেরেছে, চিনেই নিয়ে যাবে।—চিনচিনে গলায় রিণিবৌদিকে ঠেলে উথলে পড়ে আরেক বৌদি, মিন্টুর অফিস কলিগের স্ত্রী।

—এই যে ভাই! আপনি বাসে আসুন।—নির্দেশ দেয় মিন্টু স্বয়ং। এখানকার ড্রাইভার ওদিকের রাস্তা চিনবে না।

নির্দেশ তো নয়, সুপ্রিম কোর্টের রায়। উলু শঙ্খের সঙ্গে কোলাজ করে বর-বাহন উধাও হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয় বাসে ওঠার। সবার পিছনে নীরব দর্শক তাপস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে পরের মুহূর্তগুলোর কথা। বরযাত্রী সহ আসন্ন সফরের পরিণতি যে কী হবে কে জানে। ছেড়ে দিলে বরং ট্রামে চড়ে কেঁদে বাঁচবে।

—কনেবাড়ির ছোকরাটা ছাড়া আর কেউ বাদ নেই তো?—বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চান মিন্টুর কাকা।

—না ঠাকুরপো, সবাই উঠে গেছে। এবার দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে যাত্রা শুরু করো।—সম্মতি দিয়ে দেন মিন্টুর মা।

—আসি মাসিমা!—শেষ সৌজন্য ছড়িয়ে বাসের দরজায় পা রাখে তাপস। নিচে দাঁড়িয়ে থাকা অযাত্রী মহিলারা আর একবার শঙ্খ উলুধ্বনি দিতেই গড়াতে শুরু করে বাসের চাকা। বাঁ হাতের কব্জিতে এক ঝলক নজর ফেলে সময় দেখে নেয় তাপস—সাড়ে সাতটা।

—তুমি বুঝি জায়গা রাখোনি বাবা? দরজার ঠিক সামনের সীটে বসে জানতে চান মিন্টুর কাকা।—বরকর্তা বলে কথা! খবরাখবর না রাখলে কি চলে?

—না, না, ঠিক আছে। এইটুকু তো রাস্তা। আপনারা বসুন।—আচমকা

ব্রেক-করা বাসে হুমড়ি খেতে খেতে নিজেকে সামলে নেয় তাপস।

—আমি তখনই বুঝতে পেরেছি, আপনি একটা বাতাবীলেবু মার্কা লোক। —আলো-আঁধারী মায়াময় বাসের পিছন থেকে হঠাৎ হরিণ গতিতে ছুটে আসে বনি। ওর বলার ভঙ্গিতে বাস জুড়ে চলকে পড়ে হাসির ফোয়ারা,—আসুন আসুন, আমার সঙ্গে।

—না না, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।—লজ্জায় কুঁকড়ে যায় তাপস।

—আমাদের হচ্ছে।

—দেখিস বনি, ফেঁসে যাস নে যেন!—আওয়াজ ওঠে মাঝ-বাস থেকে।

—হিংসে করিস না। একেবারে গোবেচারি। ফাঁসুড়ে হলে তো কথাই ছিল না।—তাপসের হাত ধরে হিড় হিড় টেনে নিজের পাশে নিয়ে ধপাস্ করে বসায় বনি।

—বেড়াল তপস্বী।—আওয়াজ আসে বাসের সামনের সীট থেকে।

—ভিজে বেড়াল। নিশ্চিন্তে থাক, মিঁউ বলতেও জানে না।—আওয়াজের উত্তর আওয়াজে দেয় বনি। আওয়াজে আওয়াজে বেশ সরগরম হয়ে ওঠে বরানুগামী বাহক বাস। আর তাপস গুটিসুটি বসে সাধনার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করে বনিকে। সকালেই মিন্‌মিনে কেরানি বলে খোঁটা দিয়েছে। কী চায় ওরা? মেলামেশা করলে হিংসে করে। চুপচাপ নিজের ছন্দে লুকিয়ে থাকলে ভিজে বেড়াল বলে ব্যঙ্গ করে। মনে পড়ে রিণিবৌদির কথা—কী সুন্দর জমজমাট রেখেছে নিজেকে। হাসি ঠাট্টা প্রগল্‌ভতা কিছুই তো ফুরোয়নি। অথচ ছেলেরা—বিবাহিত হলেই বাতাবীলেবু হয়ে যাবে? গোবেচারি ভিজে বেড়াল হবে? না, হবে না। তাপসের আসল ফর্ম তো বাবু দ্যাখোনি। তাই বলছ। আজ একবার আবার লড়ে যাবে তাপস। বনির সঙ্গে। দেখবে কত স্মার্ট হয়েছে সে। ভাবতে ভাবতেই জার্ক! ইচ্ছের আড়ালে অনিচ্ছের ছায়ায় বনির শরীর ছুঁয়ে দেয় তাপস। মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে—স্যরি। উত্তরে বাসের আধো অন্ধকারে মুচকি হাসিতে মুখ ভরায় বনি। চলতে চলতে চলন্ত বাসে চলমান ছোঁয়াছুঁয়ি চলতে থাকে। সঙ্গে কথার ফুলঝুরি। বেশিরভাগ বনির মুখ-নিঃসৃত। সময়ের হিসেবে মাত্র আধঘণ্টা হলেও তাপস আর বনি সময় নষ্ট না করে স্বচ্ছ সাবলীল হয়ে ওঠে একে অপরের কাছে। মাঝেমধ্যে বাস ভেঙে আওয়াজ আসলেও শক্ত বাঁধ দিয়ে আটকাতে কসুর করে না বনি।

এতক্ষণে নিজেকে বেশ ফুরফুরে মনে হয় তাপসের। সাধনার কথা, মামনের কথা ভুলে নিজের ভেতর এক নতুন তাপসকে আবিষ্কার করে। যে তাপস এখনো নতুন কোনো মেয়ের বন্ধু হতে পারে, সাহচর্য পেতে পারে, হাসি মস্করা আর মৃদু মৃদু ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হতে পারে। এতক্ষণে তাপসের মনে মনে শেফালি পিসিমাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। ভাগ্যিস বুড়ির বর আনতে মনোনীত করেছিল, নইলে

বনির দেখা পেত কি?

কিন্তু হঠাৎই থেমে যায় বাসটা। সবে টেলিফোন নম্বর বিনিময় হয়েছে অমনি হৈ হৈ কোলাহল। সানাইয়ের সুর, উলু, শঙ্খধ্বনি, নাম নাম, আয় আয় রব। কোথায় দাঁড়াল বাসটা? দুপুরের দেখা শেফালি পিসিমার বাড়ি নহবতের সুরে আলোর ঝরণায় আমূল বদলে গেছে। বদলে গেলেও পৌঁছে গেছে ওরা। বাস সমেত পুরো বরযাত্রীর দলটা।

—হাতটা একটু ধরুন না। এক ঠায় বসে থাকতে থাকতে পায়ে ঝিন্ ধরেছে—উঠতে পারছি না যে।—গলায় আদর মেখে হাত বাড়ায় বনি। হাত মেলে সে হাত লুফে নেয় তাপস। বনির সে হাতে মনের ওম মাখানো গরম।

—বাবা, তোমাল এতো দেলি হল যে! বুলি পিসির বল তো কখন এসে গেছে!—বনির হাতে হাতের মালা করে বাস ছেড়ে মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই মামনের মুখোমুখি হয় তাপস।

—বাবা? বাবাকে খুঁজছ? ওই, ওদিকে কোথাও গেছে দ্যাখো গে যাও। —মেয়েকে বনির কাছে আড়াল করার চেষ্টা করে তাপস।

—মা, মা! বাবা এতে গেছে। আধো স্বরে ঝঙ্কার ছড়ায় মামন।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।—তাপসের চোখে কড়া চোখ রাখে সাধনা।

—আপনি বি-বা-হি-ত? কই একবারও তো বলেননি?—এক ঝট্‌কায় তাপসের হাতে গাঁথা নিজের হাতের মালা সরিয়ে নেয় বনি।

—বলবে কেন? ভীমরতি হয়েছে যে!—উত্তরে জানিয়ে দেয় সাধনা।

—না, মানে....অজুহাত শোনানো হয় না, তাপসকে ছেড়ে বরযাত্রীর কোলাহলে মিশে যায় বনি।

—ছিঃ ছিঃ! তুমি এতদূর নেমে গেছ? মেয়েকেও অস্বীকার করতে মুখে বাধল না? আলো ঝলমল আকাশের নিচে একলা দাঁড়ানো তাপসকে ঘিরে ফোঁস করে ওঠে সাধনা।

—সকালে চ্যালেঞ্জ করেছিলে, মুরোদ আছে কিনা। প্রমাণ করে দিলাম। —সানাইয়ের সুর মাখা হাওয়া বিষমুক্ত করতে হাল্কা জবাব দেয় তাপস।

—ওসব ঠুন্‌কো ফষ্টিনষ্টিতে মুরোদের প্রমাণ হয় না—শ্লেষ ঢালে সাধনা, —ছিঃ ছিঃ! আগে বুঝতে পারলে....চল মামন, এই ব্যাচেই খেয়ে নিবি চল।

—বাবা থাবে না?

কথার উত্তর না দিয়ে হিড় হিড় টানতে টানতে মামনের হাত ধরে বিয়েবাড়ির কোলাহলে মিলিয়ে যায় সাধনা। আর একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাপস শুধু ভাবতে থাকে, বর আনতে যাওয়ার মতো এমন চরম শাস্তি পরম শত্রুকেও যেন কোনওদিন না দেওয়া হয়।

দম্‌-পত্য

—আপনি আমাকে বাঁচান স্যার!

—কোন দুঃখে?

—না, মানে, আপনার দুঃখ হবে কেন? বালাই ষাট। দুঃখ আমার। সীমাহীন দুঃখ। এক সাগর দুঃখ। কিংবা বলতে পারেন পুরো আকাশ-জোড়া দুঃখ। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দুঃখ। সন্ধে থেকে রাত, এমন কি রাতেরবেলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দুঃখ হয়। প্লীজ স্যার, আমাকে দুঃখের হাত থেকে বাঁচান।

—কিন্তু কেন? আমি আপনার শালা না ভগ্নীপতি? আপনাকে বাঁচাতে যাব, ফেবার করতে যাব কেন?

—আজ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই ছুটে এসেছি— যে কোনো জটিল সমস্যা, দুঃখ-কষ্টের সমাধান।

—তাই বলুন মশাই, হাত দেখাবেন? কুষ্ঠী বিচার করাবেন?—পুরু কাচের চশমার আড়াল থেকে নিজের কুঁতকুতে চোখজোড়া তাপসের চোখের ওপর ঠিকরে ধরেন তান্ত্রিকাচার্য, জ্যোতিষ ভাস্করাচার্য, জ্যোতিষরত্ন, সমাধান বিশারদ, পণ্ডিত বেদব্যাস মহাশয়। বেদে কিঞ্চিৎ অভ্যাস না থাকলেও এসব লাইনে নামটাই বড় কথা। পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যে পাখোয়াজের গুরু গুরু বোলের সঙ্গে পাড়ার মোড়ে নন্দদার চায়ের দোকানের টেবিলের টু-টু-কা টু-টি টা-র মতো সহজ সরল সাবলীল তাল মিলিয়ে তৈরি করতে হবে একেবারে জীবনমুখী সঙ্গত। নরহরি দে—নৈব নৈব চ। চলবে না, চলবে না। ডাহা অচল। ভাগ্যবিড়ম্বিতদের চুম্বকে কর্ষণহীন কর্কশ নাম। সুতরাং ঠাকুর্দার উপহার দেওয়া, বাপের আমল থেকে বয়ে বেড়ানো নরহরি নামটা ঘুচিয়ে একেবারে বেদব্যাস হয়ে বসে আছেন—সোনার দোকানে, গিনির দোকানে, চাঁদির দোকানে দোকানে। শুধু কি বসে আছেন? হোর্ডিংয়ে, ম্যাগাজিনে, খবরের কাগজে, মিডিয়ার ছায়াছবিতে, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরেও ক্ষান্তি দেননি একটুও। ঘোর কলি তো বিজ্ঞাপন খায়। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞ-আপন হয়ে বাঁচুন কিংবা মরুন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কি যায় আসে? কলি যুগ মানেই তো ad-era।

—হাত-পা-কপাল যা খুশি দেখুন স্যার। কিন্তু আমায় বাঁচান।—ঝুপ্ করে চেয়ার টেনে বেদব্যাসের সামনের আসনে আসীন হয় তাপস।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? (গাম্ভীর্য বজায় না রাখলে এ লাইনে ব্যবসা লাটে

উঠতে দেরি হয় না)—জানতে চান বেদব্যাস মশাই।

—আজ্ঞে না। অনেক কষ্টে আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে মর্নিং ওয়াক ফাঁকি দিয়ে ছুটে এসেছি।—কবুল করতে দ্বিধা করে না তাপস।

—হুম্! কিন্তু প্রাতঃকাল তো আমার সাধনার জন্যে!

—এখানেও সাধনা?—হতাশ তাপসের বুক ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।

—সাধনাই তো আসল। সাধনা আছে বলেই তো জগতে শান্তি আছে।

—না নেই। একটুও নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি, সাধনার চেয়ে নির্মলা, গীতা, তনু, সবিতারা অনেক অনেক ভালো।—বেদব্যাসের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে কসুর করে না তাপস।

—দেখুন মশাই, আমার কাজ হাত দেখে কিংবা কোষ্ঠী বিচার করে গ্রহশান্তির পরামর্শ প্রদান করা। সাধনার সন্ধান দেওয়া নয়।—ব্যোম ভোলানাথের পোঁজে বসে থাকা বেদব্যাস মশাই এবার বিরক্ত হন।

—হারালে তো সন্ধান দেবেন। তাছাড়া হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের জন্যে লালবাজারের মিসিং স্কোয়াড আছে। আপনার কাছে আসব কেন?

—ওঃ!—সাতসকালে খদ্দেরের রাগ প্রকাশিত হওয়ায় প্রসঙ্গে ফিরতে চান বেদব্যাস, বাড়ি বহে আসা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে লাভ কী?—আগে ভিজিটের দু'শ টাকা ছাড়ুন। এই ফর্মে নামধাম, কর্তব্য-কর্মের বিবরণ লিখুন, তারপর কথা বলুন, তবে সংক্ষেপে।

বেদব্যাসের গাম্ভীর্যে দমে যায় তাপস। পার্সের বুক খুঁড়ে দু'টো একশ টাকার নোট বেদব্যাসের সম্মুখে স্থাপন করে ফর্ম ভর্তি করার কাজে নিয়োজিত করে নিজেকে। ছাত্রজীবনের শেষে এমনি ফর্ম সে অনেক ভর্তি করেছে। সুতরাং নামধাম, পেশা, জন্ম-তারিখের দিনক্ষণ মুখস্থ উগরে লিখে দিতে দেরি হয় না একটুও।

—কী রাশি?—তাপসের হাতের তালুতে চোখ রেখে জানতে চান বেদব্যাস।

—মেষ রাশি। দেবগণ। অশ্বিনী নক্ষত্র। বৃশ্চিক লগ্ন—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওতেই কাজ চলে যাবে।—বাঁ হাত নিজের মাথার ওপর মেলে বেদব্যাসমশাই আশ্বস্ত করেন তাপসকে। ডানহাতের চাতালে গেঁথে রাখেন তাপসের হাতের তালু,—হুম! সময়টা খুব খারাপ। (ভালো হলে কি আর সাতসকালে জ্যোতিষের দুয়ারে ধর্ণা দেয় কেউ—তাপস ভাবে) শুক্র বক্রী, বুধে শনির প্রকোপ (শনি নয়, সাধনা)। মঙ্গল এখন রবির দশায়। তবে বৃহস্পতি সহায় (কার? প্রশ্ন করে জেনে নিতে ইচ্ছে করে তাপসের। কাল রাতেই তো মাইনের টাকাগুলো পকেট হাতিয়ে আলমারিস্থ করেছে। ভাগ্যিস, টি.এ-র পাঁচশ টাকা মানিব্যাগে কালীমাতার ছবির পিছনে সেঁধিয়ে রেখেছিল)। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য ঠিকমতো না থাকলেও অভাব হবে না। কেতু একটু জ্বালাচ্ছে—অফিসে জয়-যশ-

প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে কেউ কেউ। তবে মেঘ কেটে যাবে। পুত্রভাগ্য ভালো। (দুর মশাই, আমার আবার পুত্র এল কোত্থেকে? একটিমাত্র তো কন্যা)।

—আমার কোনো পুত্র নেই, কন্যা। একটিমাত্র কন্যা।—মনের ভাব চেপে না রেখে প্রকাশ করে দেয় তাপস।

গণনার ভুল খদ্দেরের মগজে ধরা পড়তেই হঠাৎ একটু হোঁচট খান বেদব্যাস মশাই,—*সে কি আর আমি বুঝতে পারিনি মনে করেছেন? আমি ভাবছি বৃহত্তর কথা। বিরাট সব ভাবনার সম্ভাবনা। এখানে পুত্র অর্থে সন্তান। অর্থাৎ কন্যা পুত্রের* সমাহার। বিবাহ-উত্তর পর্বে কন্যার দাক্ষিণ্যে একটি পুত্র প্রাপ্তি হবে আপনার। অর্থাৎ জামাতা।

—জামাতা?—জিজ্ঞাসার চিহ্ন মেলে চোখের গোলক বৃহৎ আকার ধারণ করে তাপসের,—কথায় বলে, যম-জামাই-ভাগ্নে, নয় কেউ আপ্‌নে।

—ভুল! একশয় একশ ভাগ ভুল। জামাতার স্বভাবে কিঞ্চিৎ বিমাতার প্রভাব থাকলেও আপনার গ্রহের অবস্থানে সেই বৈমাতৃসুলভ অবস্থা কিছুতেই থাকবে না। তাছাড়া কতই বা বয়স আপনার? উচ্চমার্গের মানুষেরা তো সত্তর-আশি বছরেও পাণিগ্রহণ করেন, এবং আদা-পানির দৌলতে উৎপাদনেও পারদর্শী হন। সুতরাং কন্যা-কন্যা ভাবে বিব্রত হবেন না। হস্তলেখার দাক্ষিণ্যে পুত্র সন্তানের প্রবল সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—যায় মশাই, যায়। আলবৎ যায়। মেয়ে আমার এম.এ. পড়ছে।

—এম. এ পড়ার সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গ পাওয়ার ইচ্ছে কোনোমতেই অমূলক নয়। অবশ্য লাইগেশন ভেসেক্‌টামি কিংবা মেনোপজের ব্যাপারটা হাতের রেখায় লেখা থাকে না।—হাল ছাড়ার আগে শেষবারের মতো জোয়াল ধরে রাখার চেষ্টা করেন বেদব্যাসমশাই। চর্‌কিবাজের চক্করে পাক খেতে খেতে অন্য প্রসঙ্গের ফুলঝুরি ঝরাতে চেষ্টা করেন,—একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনি ভীষণ ভাগ্যবান মশাই!

—কোন ব্যাপারে?

—স্ত্রী-ভাগ্যে। আমাদের শাস্ত্রে বলে,—স্ত্রী-ভাগ্যে ধন-যশ-প্রতিপত্তি, আয়ু বৃদ্ধি হয়। আপনি মশাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

—সেই জ্বলার দগ্‌দগে ঘা সারাতেই তো আপনার কাছে ছুটে আসা।—মুখ ব্যাজার হয় তাপসের। সন্দেহ উঁকি দেয় মনের কানাচে। বেদব্যাস মশাইয়ের সঙ্গে সাধনার কি কোনও গোপন আঁতাত আছে? কারণ, উঠতে-বসতে সাধনাও তো ওই একই কথা বলে। একই ক্যাসেট চালায়। এক সুর, এক তাল, এক লয়ে বলে—সারাটা জীবন ধরে খাচ্ছ পরছ, ফুটুনি করছ—সব আমার কপালে। নিজের বলতে কী ছিল তোমার? একখানা নড়বড়ে তক্তাপোষ আর রঙচটা সোয়েটার ছাড়া?

—ঘা? কোথায় ঘা? চুলকানি না প্যাঁচড়া? হাজা না খুজ্‌লি?—তাপসের

স্বগতোক্তি কানে যেতেই নড়ে বসেন বেদব্যাসমশাই।—ওইসব ঘা-প্যাঁচড়ার চিকিৎসা আমি করি না। করত আমার জ্যাঠতুতো ভাই শিবকালী উপাধ্যায়। নাম শুনে থাকবেন হয়ত। স্বপ্নে পাওয়া ওষুধে অসুখের যাবতীয় দুঃস্বপ্ন সারাতে তার জুড়ি ভূভারতে আর কেউ ছিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, ঘা-প্যাঁচড়াতেই তার দেহান্ত হল।

—ঘা আমার মনে। ক্ষত-বিক্ষত ঘা। দগ্‌দগে ঘা।—মুখ ফস্‌কে শুনিয়ে দেয়, তাপস—স্ত্রী-ভাগ্যের ঘা।

—তাই বলুন মশাই,—নিশ্চিত হয়ে মিলিটারি প্যারেডের 'বিশ্রাম' ভঙ্গীতে হাল্কা হন বেদব্যাসমশাই।—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া? দাম্পত্য কলহ? সে বড় সুখের মশাই। সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে তবলার ঠেকা—চাপান-উতোর। ওস্তাদের কেরামিত। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। সবশেষে তেহাইয়ের সঙ্গত—নি-রে-গা-রে-সা, নি-রে-গা-রে-সা, নি-রে-গা-রে-সা! ধা-ধিন্-ধিন্-ধা! ধা-ধিন্-ধিন্-ধা! ধা-ধিন্-ধিন-ধা! ধা-ধিন্-ধিন্-ধা! তখন শুধু হাততালি আর হাততালি। অভিনন্দনের বন্যা।

—আমার প্রবেলমটা কিন্তু অন্যরকম।

—তা তো বটেই! তা তো হবেই। দম্পতির রকমভেদে দাম্পত্যের কাহিনী তো আলাদা আলাদা হবেই।

বেদব্যাসের বাণী আর উচ্ছ্বাসের ধ্বনি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয় তাপস, —যাহোক কিছু একটা করুন। একটা উপায় বাত্‌লে দিন।—কব্জির ঘড়িতে আড়চোখ সময় পড়ে নিয়ে মরীয়া হয় তাপস।

—দাম্পত্য জীবনে একেবারে দম্-পতি হয়ে থাকতে না পারলেই ঝামেলা। ঝগড়া-বিবাদ, ইগোর লড়াই, থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি।

—দম্পতি হয়েই তো আছি।

—তাহলে তো সমস্যা থাকার কথা নয়!—গম্ভীর হয়ে চিন্তার ভাঁজ কপালে ফেলেন বেদব্যাসমশাই। প্রাণায়ামের দম নেন মিনিটখানেক। তারপর দুপ্ করে ছুঁড়ে দেন নিষিদ্ধ চকলেট-বোমা,—দম দেওয়া খেলনা দেখেছেন? গাড়ি? পুতুল? আজকাল অবশ্য দম্‌টম্ বন্ধ হয়ে গেছে—রিমোট কন্ট্রোলের যুগ কিনা, তাই।

—সব দেখেছি স্যার। দম দেওয়া গাড়িও দেখছি, রিমোট কন্ট্রোলের উড়োজাহাজও। এই তো গতবছর, আমার ভাইপোকে একটা কিনেও দিয়েছিলাম রঞ্জিতের দোকান থেকে।—বার্ষিক পরীক্ষার আগে গৃহশিক্ষকের কাছে ইতিহাসের প্রশ্নের গড়্‌গড়ে মুখস্থ উত্তর শুনিয়ে দেয় তাপস।

—দেখেছেন, কিন্তু শেখেননি।—ত্রৈলোক্য মুখার্জীর 'হয় হয় জানতি পারো না' গোছের মাথা নাড়ে বেদব্যাসমশাই।

—মানে? খেলনা দেখে আবার শেখার কি আছে?—মাথায় ঢোকে না

তাপসের।

—বলেন কি? শেখার নেই? আমাদের সমাজ-সংসার এক বিরাট পাঠশালা। বিশ্বের বিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও বলতে পারেন। এর অংশে অংশে কণায় কণায় শিক্ষার মধু জমে আছে। শুধু সংগ্রহ করার মন, চোখ আর তাকাৎ চাই। বুঝলেন?

—না।

—খেলনায় দম দেয় কে? রিমোট কার হাতে থাকে?—হাত ছেড়ে জ্ঞানের বহর পরীক্ষা করতে বসেন বেদব্যাসমশাই।

—কেন, আমার ভাইপো? ছোট্টু!

—আপনাকেও ছোট্টু হয়ে যেতে হবে। আপনার স্ত্রীর হাতের ছোট্টু। তিনিই দম দেবেন, আবার রিমোটও চালাবেন। যেমন চালাবেন তিনি, তেমনি চলবেন আপনি। আসলে দম্-পতি হয়ে থাকতে হবে, তবেই শান্তি।

—সে তো সারেণ্ডার করা!

—করবেন। রামপ্রসাদের গান শোনেননি?—সংসার ধর্ম বড় ধর্ম? ধর্ম পালন করতে সাধনা চাই।

—আছে তো!

—তবে আর চিন্তা কি মশাই? সাধনার একটাই পথ—সিদ্ধি। সারেণ্ডার এখানে ভক্তির নামান্তর মাত্র। ভক্তিতেই তো মোক্ষম মুক্তি। বুঝলেন?—যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়েন বেদব্যাসমশাই।

—না!—বুঝতে পারে না তাপস। বসে থাকে গুম্ হয়ে,—তাবিজ-কবচ, শিকড়-টিকড়, পাথর-টাথর ধারণ করলে হয় না?

—হবে না কেন? আলবৎ হয়। ধারণ তো করতেই হবে। নইলে ধারণা পোক্ত হবে কি করে? (তাছাড়া আমারও তো ধান্দা আছে। আপনাদের মতো হতভাগাদের ভাগ্য ফেরানোর দোহাই না থাকলে আমাদেরই বা চলবে কি করে?)

—আপনি বরং প্রেসক্রাইব করে দিন।—অনুরোধ করে তাপস।

—হুঁঃ!—(ভারি সেয়ানা লোক তো! আরে বাপু, আমিও হাত চরিয়ে খাই। ফকিরের হাতে আমির হওয়ার পাথর গুঁজে দিই, আর তোমার হাতে গুঁজে দেব প্রেসক্রিপশন? তারপর ছুটে বেড়াব কমিশনের টাকা আদায় করতে?)। আপনি বরং এক কাজ করুন—

—কি?

—আসলে গ্রহ-রত্নের ব্যাপারটা ভীষণ গোলমেলে। সঠিক দোকান থেকে না কিনলে সঠিক দামে সঠিক জিনিসটি আপনি পাবেন না। আপনি বরং 'রত্নভাণ্ডারে' চলে আসুন। বউবাজার মোড় থেকে শশিভূষণ দে স্ট্রীট—

—আমি চিনি স্যার। কিন্তু কী লাগবে—

—আপনার হাত মোটামুটি ভালোই। ওই ফ্যামিলি প্রবলেমটার জন্য রতি-সাতেক গোমেদ, ন'রতি পলা—সে আপনি আসুন। একটু চিন্তাভাবনা করে, যা হয় সমাধান একটা করে দেব। রত্নভাণ্ডারে ক্রেডিটকার্ডও অ্যাকসেপ্ট করা হয়।—(ধার-দেনার পরামর্শ আগেভাগেই দিয়ে রাখা ভালো) জানিয়ে বুঝিয়ে পাখি পড়ান বেদব্যাসমশাই।

—কেমন খরচ হতে পারে?

—যেমন বাঁধাবেন। সোনার হলে হাজার পঞ্চাশ। রুপো দিলে ছয়-সাত হাজার কমে যাবে।—জলের মতো সরল গতির গতিক দেখিয়ে দেন বেদব্যাসমশাই।

পঞ্চাশ হাজার? রাস্তায় নেমে হাঁটু অবশ হয়ে যায় তাপসের। শরীরের গাঁটে গাঁটে ছড়ায় ব্যথার অনুভব। লেবেলের ওপর মিছিমিছি ইংরেজি 'এক' লেখার খেসারৎ একেবারে পঞ্চাশ হাজার গড়াবে, ভাবতেও শিউরে ওঠে। দোষারোপের তীর ছুঁড়ে দেয় সমরের দিকে। সমরের পরামর্শেই তো কলম তুলেছিল হাতে। আট'শ টাকার ঢাকাই জামদানী হয়েছিল আঠারোশ। হাল্কা হলুদ জমির ওপর লাল-নীল-গোলাপি সব ফুল ছড়ানো। আঁচল আর পাড়ে মধুবনী নক্সা—লঙ্কাপুরীর বাগানে বিমর্ষ সীতাকে ঘিরে সরমা আর রক্ষকুলের সখীদের নৃত্য।

—বাবা। এতদিনে চেতনা হল? বউয়ের কথা মনে পড়ল?—খুসিতে উচ্ছ্বসিত সাধনা শাড়ি হাতে প্রায় পারফর্ম করেই ফেলেছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাচ। নেহাৎ বড় হয়ে যাওয়া মামন ঘরে ছিল, তাই তাপসের হাত ধরে 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি' গান গেয়ে উঠতে লজ্জা করেছিল। শুধু আবেগ ঢেলেছিল চল্‌কে চল্‌কে। মেয়ের উদ্দেশে বলেছিল—দেখেছিস, তোর বাবার কিন্তু চয়েস আছে। যেমন রঙ তেমনি ডিজাইন। কিন্তু জমিটা আর একটু ভালো হলে....

মনে মনে সমরকে ধন্যবাদ দিয়েছিল তাপস—সংসারের জমি ভালো করার এমন জামদানী জম্পেশ পরামর্শ দেওয়ার ধন্যবাদ।

—আঠরো-শ টাকা। আঁৎকে উঠেছিল মামন। নতুন কাপড়ের পিঠে আদরের হিংসে মাখানো হাত বুলিয়ে চোখ রেখেছিল তাপসের চোখে,—দামের তুলনায় জমিটা তেমন ভালো নয় বাবা।

—বেশি জ্যাঠামি করিস না তো। জমির তুই কী বুঝিস? সুতির শাড়ির হাজার ভ্যারাইটি। তাছাড়া কাজ দেখেছিস? দাম তো সব পাড় আর আঁচলের কাজে শুষে নিয়েছে।—মায়ের খুশিতে বাগড়া ঢালার চেষ্টা করার জন্যে ধমকে দিয়েছিল মেয়েকে।

—যাই বলো বাবা, অলোকবাবু কিন্তু জামা-কাপড়ের দাম বেশি নেয়। এই শাড়িটাই তন্তুজ থেকে কিনলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রিবেট পেতে।—নিজের মতামত একটুও সংশোধন না করে পড়ার ঘরে চলে গেছিল মামন।

—কেমন? পছন্দ হয়েছে তো?—মামন পড়ার ঘরে ঢুকতেই ভালোবাসা ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাপস।

—হুঁঃ! আদিখ্যেতা! জন্মের মধ্যে তো এই প্রথম কর্ম। গয়না নয়, গাঁটি নেয়, একটা মোটে শাড়ি।—খুশির তড়পানি ঝিলিক দিয়েছিল সাধনার চোখে, —চা খাবে?

—দয়াময়ীর যদি দয়া হয়,—বলতে বলতে তোয়ালে কাঁধে বাথরুমে ঢুকে গেছিল তাপস। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে হেসে উঠেছিল হো হো শব্দে। আরো একবার মনে মনে ধন্যবাদ জানিয় ছিলো সমরকে। মেয়েদের কাছে দামটাই মুখ্য।

লেবেল পাল্টানোর ব্যাপারটা তাপসের জীবনে অবশ্য প্রথম নয়। সমরের উস্কানি থাকলেও নাটের আসল গুরু তো অন্য। চল্যুতে চলতে হঠাৎ মনে পড়ে তাপসের। এর কাপড়ের দামের তক্মা তুলে ওর কাপড়ে কতবার যে স্টেপল করেছে সাধনা নিজেই, তার তো ইয়ত্তা নেই। সে ব্যাপারে তাপস অন্য ব্যাপারী—লেবেল বদলের বদনাম তো কেউ দিতে পারবে না। শুধু ছোট্ট একটা আঁচড় দিয়েছিল দামের অঙ্ক লেখা ঘরের একদম বাঁপাশে। মহান উদ্দেশে মিথ্যে কি কখনো মিথ্যে হয়? মহাভারতে অশ্বত্থামা বধের সময়ও তো মিথ্যেটাই সত্যি হয়েছিল। জয় হয়েছিল ধর্মযুদ্ধের। বেদব্যাসমশাই ঠিকই বলেছেন, সংসার ধর্ম। ধর্মে মিথ্যে থাকবে না—তাও কি কখনো হয়?

—আরে মশাই, মঙ্গল গ্রহের পিঠে হাঁটছেন না শহরের রাস্তায়?—চলন্ত সাইকেলের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়তেই আরোহী রুখে দাঁড়ায় তাপসের নাকের ডগায়, —সকালবেলাতেই চুল্লু টেনে বসে আছেন? না স্বপ্ন দেখছেন?

—স্যরি ভাই! একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।—নিস্তার পেতে কথার বিস্তার থেকে বিরত হতে চায় তাপস।

—আপনি তো স্যরি বলেই খালাস। আর একটু হলে লরীর নিচে পড়ে আমি খালাস হয়ে গেলে আমার বিধবা পরিবার আর অনাথ বাচ্চাদের দেখতো কে শুনি?—সাইকেলের সামনের চাকা দু'পায়ের ফাঁকে লট্‌কে হ্যাণ্ডেল সোজা করার চেষ্টা করে আরোহী।

—বললাম তো স্যরি!—একটু কঠিন চোয়ালে উত্তর দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যায় তাপস। বিপদ যখন আসে, একসঙ্গেই আসে—মনে মনে ভাবে। ভাগ্যিস হ্যাণ্ডেলের ধাক্কাটা ডানহাতের কব্জির ওপর আছড়ে পড়েনি। (ধ্যুস! জীবনটাই কেমন বেসুরো, নইলে সাতসকালে পঞ্চাশ হাজারী ফর্দ?)

কাল হল গতকাল সন্ধেয় অফিস থেকে ফিরে। কাল নয়, একেবারে মহাকাল। প্রলয়ের ডঙ্কা। জুতোর ফিতে খুলে সবে পা রেখেছে সিঁড়িতে, অমনি হুঙ্কার, —আমাকে অপমান না করলে বুঝি পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না? আমি কি

তোমার কাছে শাড়ির বায়না করেছিলাম?

—মানে? কি বলছ তুমি? আমি তো বিন্দু-বিসর্গ কিছুই বুঝতে পারছি না।—অন্নপ্রাশনের ভাত উগ্‌রানো গন্ধে ভুরভুর মোজা খোলার কাজ স্থগিত রেখে স্তম্ভিত স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাপস। ছোটবেলায় দীপু 'স্ট্যাচু' বললে যেমন দাঁড়িয়ে থাকত, ঠিক তেমনি।

—বুঝতে পারবে কেন? আমিও নেড়ে দিয়ে এসেছি।·খলনায়কের খল ছলাকলা খলনুড়িতে বেটে একেবারে নুড়ি নুড়ি করে এসেছি। অলোকদার কাছে গেলেই টের পাবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—থুতু না ছিটিয়েও থুতু ছেটানোর অভিনয় করেছিল সাধনা।

—কি হয়েছে রে মামন।—স্ট্যাচু দশা ছেড়ে মোজা খুলতে খুলতে মামনের কাছে জানতে চেয়েছিল তাপস।

—তোমার আঠারোশ'র জামদানী কাটা বেরিয়েছিল—

—কাল অফিস ফেরৎ বদলে আনলেই হবে।—সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বমুখী হতে হতে সমাধানের সহজ পথ বাৎলে দিয়েছিল তাপস।

—কি নিচ প্রবৃত্তি তোমার!—দপ্ করে পুরোনো হারিকেনের মতো জ্বলে উঠেছিল সাধনা,—আটশ টাকার শাড়ি কোন আক্কেলে আঠারো-শ করলে শুনি? অমন সোনার পাথরবাটি কি না দিলেই চলত না?—সাধনার তার সপ্তকের স্বর ভিজতে শুরু করেছিল আস্তে আস্তে।

—না, মানে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আটশ, আঠারোশ....সব বিদ্যের সেরা বিদ্যে চুরি ধরা পড়ায় কথায় পিঠে কথা জড়িয়ে জড়ভরতের অবস্থা হয়েছিল তাপসের।

—একগাদা লোকজনের সামনে কি অপমানটাই না হতে হলো। ছিঃ! ছিঃ! অলোকদা ভাবল আমি জোচ্চুরি করছি। কম দামের শাড়ি বদলে বেশি দামের শাড়ি....ছিঃ। গলায় দড়ি ঝুলিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।

—আহ্ মা, ছাড়ো না। বাবা কাল ঠিক ম্যানেজ করে আসবে। রণং দেহী সাধনার সামনে শান্তির অমোঘবাণী নিয়ে হাজির হয়েছিল মামন।

—ম্যানেজ করে আসবে মানে? জুতো মেরে গরু দান? অতগুলো খদ্দেরের সামনে আমার মাথা যে ধুলোয় লুটোপুটি খেল—সেটা ম্যানেজ করবে কী করে? —শান্তির কবুতর দূরের কথা, খুন্তির খড়্গ হাতে মেয়ের দিকে দু'চোখ ভরে গ্যাস-স্টোভের আগুন নিক্ষেপ করেছিল সাধনা।

—না, দ্যাখো! তোমার কাছে দাম লুকোনোর জন্যে ঠিক নয়। আসলে একটু জোক করতে চেয়েছিলাম, (খুনের আসামী মৃত্যুদণ্ড শোনার অগে আত্মপক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে।)

—জোক নয়, জ্যাক!

—মা, জ্যাক মানে কি?—আগুনের হল্কায় খাঁটি ঘি ঢেলেছিল মামন।

—জ্যাক মানে জানো না? পড়াশুনো ছেড়ে দাও। বইপত্তর সব ভোলার পাল্লায় ওজন করে বেচে দাও।

—আহা, ওকে বকছ কেন? ওর কি দোষ?

—না, ওর দোষ নেই। টিটকারি করা! স্বামী করল অপমান আর পেটের মেয়ে করছে টিটকারি?

কান্নার ঢল নেমে সাধনার স্বর বাক্‌রুদ্ধ হলেও নিম্নচাপের আকাশে মেঘের বাতাবরণ ছিল সারারাত। সকাল উঠে তাই মেঘ কাটাতে রোদের খোঁজে বেদব্যাস মশাইয়ের কাছে ছুটে এসেছিল তাপস।

চিং চট্ চট্। চিং চট্ চট্। মোবাইল ফোনের পর্দায় বাড়ির নম্বর ভেসে উঠতেই শিউরে ওঠে তাপস। রিপ্লাই নব্-এ হাত চেপে উত্তর শোনায়,—হ্যাঁ, বলো।

—সাতসকালে কোথায় পাড়া বেড়াতে গেছ?—কথা তো নয়, সাধনার তেজ ইথারে ভেসে দমাদম্ আছড়ে পড়ে তাপসের কানে,—একটাও আলু নেই। অফিসের পিণ্ডিটা আমি রাঁধব কী দিয়ে শুনি?

তাপস বলতে চাইল, আলু কিনতেই তো বেরিয়েছি। সঙ্গে কাঁচকলা আর আতপ চাল। কিন্তু না, বলা হল না, তার আগেই বিপ্ শব্দ শুনিয়ে বন্ধ হয়ে গেল মোবাইলে ছুঁড়ে দেওয়া সাধনার পিণ্ডি রান্নার অঙ্গীকার। ভালোই হল। কথায় যে কথা বাড়ে। আলু বাড়ন্ত হলে আলুর খোঁজে যাওয়াই উচিত। বেদব্যাসমশাই ঠিকই বলেছেন—সংসারে দম্-পতি হয়ে দাম্পত্য জীবন কাটাতে হবে। ঝগড়ার দম্-দম্ দাওয়াই খাওয়ার চেয়ে পাকে পাকে দমের পাকে জড়িয়ে থাকা অনেক সুখের। অন্তত রত্নধারণের নিমিত্ত ধারের পঞ্চাশ হাজার তো খসাতে হবে না!

কর্মফল

—ভাঙলো তো?

দেড় ফুট বাই এক ফুট ফ্রেম ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া কাচের ঝন্‌ঝনাৎ শব্দ উপড়ে রে রে করে তেড়ে আসে সাধনা। হাতে পায়ে হনুমানের হাড় বসানো। কাজ না করে করে....।

—বাঁচা গেল। এতদিনে একটা উটকো যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। টুলের ওপর থেকে মেঝেতে প্রায় লাফিয়ে পড়ে হাঁফ ছাড়ে তাপস।

—মানে? পায়ের বুড়ো আঙুল আর কনুইয়ে ভর দিয়ে হাওড়া ব্রীজের ভঙ্গীতে ডিঙিয়ে দাঁড়ায় সাধনা,—অমন সুন্দর হাতের কাজটাকে তোমার যন্ত্রণা বলে মনে হত?

—যন্ত্রণা নয়ত কি?—মেঝে জুড়ে ছিটিয়ে পড়া ভাঙা কাচের টুকরো পরিষ্কার করতে ফুলঝাড়ু হাতে সাধনার মুখোমুখি হয় তাপস।

—একটা আর্ট ওয়ার্ক....তাপসের হাতের ফুলঝাড়ুর সামনে তর্জনী উঁচিয়ে তেড়ে যায় সাধনা।

—আর্ট ওয়ার্ক? তাও যদি ভুলে ভরা না হত—যতটা সম্ভব খাদে গলার স্বর নামানোর চেষ্টা করে তাপস। কোনওমতে সাধনার সুরের সঙ্গে যুগলবন্দী হলেই বিপদ। রবিবারের সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে একেবারে মাটি হয়ে যাবে। মাটি তবু ভালো, কাদা প্যাঁচপেঁচে পাঁকে পরিণত হবে।

—ভুল? ভুলটা কোথায়?—অর্জুনের গাণ্ডীব ছাড়ে সাধনার ভ্রূযুগলে।

—নীড় যখন নীরে ভেসে যায় তখন কি আর সংসার সুন্দর হয়, না হতে পারে?—মেঝেতে পাঁই করে ফুলঝাড়ু বুলিয়ে নেয় তাপস,—খিদের পেটে ঝলসানো রুটি দরকার, পূর্ণিমার চাঁদ নয়। তেমনি আর্ট ওয়ার্কের নামে ভুলভাল বাণী বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে সংসার সুন্দর হয় না।

—ওসব লেকচার তোমার ছাত্রদের শুনিও, কাজ হবে। স্কুলবেলার স্মৃতি, এতদিন বুকে করে আগলে রাখলাম, কাজ দেখাতে গিয়ে সেটাকে ভেঙে খান্ খান্ করেও ক্ষান্তি নেই। বলে কিনা ভুলভাল!—হেরে যাওয়ার আগে মেয়েদের শেষ অস্ত্র চোখের জল চার্জ করার প্রস্তুতি নেয় সাধনা।

—মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে।—রসিকতার ঝড়ে কালবৈশাখীর কালো মেঘ সরাতে

চেষ্টা করে তাপস। কারণ সাধনার চোখে এখন এই মুহূর্তে বর্ষণ শুরু হলে বরাদ্দ দ্বিতীয় কাপ চা ঠোঁট ছাড়া হবে। বর্ষণমুখর চোখ লাল হয়ে শুরু হবে সাইনাসের ব্যথা। সে ব্যথায় মাথা চেপে বিছানায় সওয়ার হলে এই সাতসকালে হেঁসেলে ঢুকতে হবে তাপসকে। মানদামাসির অনুপস্থিতিতে ইদানীং রান্নার চাপে চ্যাপ্টা সাধনার শরীর-গতিকে মন্দা চলছে, তার ওপর স্মৃতির প্রতি কটাক্ষ বুঝতে পারলে কি আর নিস্তার থাকবে?

—মিথ্যে?—তাপস যতই ছাইচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, সাধনার তুষের আগুন ধিকিধিকি করার বদলে দাউ দাউ জ্বলতে চায়।

—বুকে করে আগলে রাখার ব্যাপারটা মিথ্যে নয়?

—মিথ্যে হলে অনেক, অনেকদিন আগেই ছেঁড়া ন্যাতা হয়ে মানদামাসির হাতে উঠত, ঘর মোছা হত। বুঝলে?

—যাক!—হাঁফ ছেড়ে বাঁচার ভঙ্গি করে তাপস,—শুনেও শান্তি। আমার ঘরের দেওয়াল তোমার বুকের....

—হেঁয়ালি ছেড়ে কাচগুলো পরিষ্কার করো।—নির্দ্দেশ জাহির করে অ্যাবাউট টার্ণ হয় সাধনা,—ওফ্! কাজ না করে করে গতরে একদম মরচে পড়ে গেছে।

—ফ্লাস্কে কি চা....?

—না নেই। এমব্রডারিটা যত্ন করে ঝেড়েঝুড়ে সাহা ব্রাদার্সে দিয়ে এসো।

—কেন?

—ফ্রেশ বাঁধিয়ে দেবে।

—ভুলটা না শুধরেই?

—মানে?

—ওই যে 'রমনীড়'।

—মহাপুরুষের বাণী শোধরাবার তুমি কে হে? অত সুন্দর কথা—'সংসার সুন্দর হয় রমণীর গুণে'....।

—সে 'রমণীর' আর এ 'রমনীড়'-এ আকাশ-পাতাল ফারাক। তাছাড়া এর গুণের চেয়ে ভাগের অঙ্কটাই অনেক সহজ সাবলীল। যোগ তো কবেই চুকেবুকে গেছে, এখন বিয়োগও বিযুক্তির সন্ধানে মত্ত।

—লেকচার ছেড়ে হাত চালাও। বলতে বলতে 'বাঁয়ে মুড়' হয় সাধনা। এক ঝট্‌কায় ভাঙা কাঠের ফ্রেম আর কাচের শরশয্যা থেকে এমব্রডারি করা কাপড়ের টুকরোটা তুলে নেয় হাতে। দু'টো সিলভারকাপ পোকা সুড়ুৎ করে পালানোর পথ খোঁজে।

—আমি বলছিলাম কি 'রমনীড়' বানানটা কাউকে দিয়ে যদি একটু....

—না, যা আছে তাই থাকে।

—কী মা? সাধনার কথার রেশ ধরে টিউশন ফেরৎ মামন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে থমকে দাঁড়ায়,—এ মা! মায়ের ছোটবেলার লেখাটা ভাঙল কি করে?

—তোমার বাবার কল্যাণে।

—থ্যাঙ্কয়্যু বাবা! এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ করেছ।

—মানে?—তাপসকে ছেড়ে মামনের দিকে ধেয়ে যায় সাধনা।

—ওইসব সেকেলে বস্তাপচা বাণী ঝুলিয়ে এখন কেউ দেওয়াল নোংরা করে না।—সাফ জবাব দেয় মামন।

— যেমন বাপ তেমনি মেয়ে।—দপ্ দপ্ জ্বলে ওঠে সাধনা,—সবার মুরোদ জানা আছে। আমার মায়ের কাছে শেখা সেলাইয়ের বানান ভুল ধরা? নিজে কী বানান লিখতে শুনি? ভেবেছ আমি কিছুই জানি না?

—বানান ভুল হতেই পারে—তাপসের হাতের ফুলঝাড়ুর কল্যাণে জড়ো করা কাচের টুকরো ডিঙিয়ে ঘরের ভেতের ঢোকার চেষ্টা করে মামন।

—খাতার পাতায় ভুল হওয়া আর দেওয়ালে উজ্জ্বল জ্বল জ্বল করার মধ্যে পার্থক্য আছে।—নিজের পক্ষে সওয়াল করে তাপস।

—না, নেই। ভুল ভুলই। শ্বশুরবাড়ির কোনও চিহ্নই তো রাখতে চাও না। অপুকে দেখে শিখো, শাশুড়িকে, শ্বশুরবাড়িকে কেমন সম্মান করতে হয়।

—না করে উপায় কি? পেনশনের টাকাটা হাতাতে ওসব ভান-ভড়ং করতেই হয়।—অবলীলায় ফাঁস করে দেয় তাপস। অপু, অর্থাৎ সাধনার ছোটভাই। তাপসের শালা। কাজকম্মো তেমন কিছুই করে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, ব্যবসা করি। কিসের ব্যবসা? ওই সাপ্লাই। ইধার কা মাল উধার। এ দোকান থেকে কিনে ও দোকানে বেচে কমিশন পাওয়া। ইদানীং নেমেছে মোবাইল ফোন আর ক্যাশ কার্ড 'সেল' করার কারবারে। পুরোনো কোনো মোবাইল ফোন আটশ টাকায় কিনে মুরগি বুঝে গছানোর কারবার। ন'শ, হাজার—যা পাওয়া যায়। পই পই নিষেধ করেছিল তাপস—গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করে একটু নিজের পায়ে দাঁড়াক। চাকরি না হয়, তখন বিজনেস করবে। ধুস! এক চুটকিতে সে পরামর্শ উড়িয়ে পাড়ার কালীমন্দিরে সিঁদুর পরিয়ে ঘরে তুলল পাড়ারই ঝুনুকে। একমাত্র ভাইয়ের বিয়েতে আনন্দ হৈ-হুল্লোড় করতে না পারার শোকে মাস তিনেক 'গুম্' হয়ে বাপের বাড়ির ইট পর্যন্ত দেখেনি সাধনা। শেষপর্যন্ত ঝুনুর গলায় পাঁচহাজারি হার ঝুলিয়ে, সুশান্তর জুয়েলারিতে বাকির খাতায় নাম লিখিয়ে, ভাই আর বউকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, সব মান-অভিমান শোক-দুঃখ ভুলে গুলে মেরে দিল। ছ'মাস যেতে না যেতেই স্ট্রোক। সাধনার মা কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে সাতদিন নার্সিংহোমে সাতাশ হাজার খরচ করিয়ে চলে গেলেন সংসার ছেড়ে। অশৌচে নিয়ম-কানুন দেখাবে কে? নিজের সংসার ফেলে সাধনার সময় কোথায়। অতএব জামাইবাড়ি বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে

উঠে এলেন ঝুনুর মা। নিজের ছেলে, ছেলের বউয়ের 'দূর-ছাই' এড়াতে মেয়ের বাড়ির চেয়ে সুরক্ষিত জায়গা আর কী আছে? শাশুড়িদের যে এক রা। আহা! জামাই আমার হীরের টুকরো। আর নিজের ছেলে? পেটের শত্তুর। তবে হ্যাঁ! সান্ত্বনা একটাই—ঝুনুর মা বেকার নন। পেনশন পান। মাসকাবারে সাড়ে তিন হাজার!

—শাশুড়ির কাছ থেকে চার আনা পয়সাও নেয় না অপু।—চিলের স্বরে প্রতিবাদ ঝরে পড়ে সাধনার গলায়।

—নিলেই বা ক্ষতি কি?

—কেন? আমার মা তোমাকে কিছু দেয়নি? পরের শাশুড়িকে হিংসে করছ? মরার আগেও জামাইষষ্ঠীতে ঘড়ি দিয়েছে। তোমার মা কী দেয়? কী দিয়েছে? মাথা কুটতে কুটতে ওই একছটাক জমি। ওটুকু না নিলেও বাড়ি করার মুরোদ ছিল আমার। বাড়ি না হোক ফ্ল্যাট কিনতাম।

বাব্বা! কথা তো নয়, পোদ্দারির চূড়ান্ত। পরের ধনে পোদ্দারি। জমি আমার, ট্যাক্স আমার, ইলেকট্রিক বিল আমার, আয় আমার, ব্যয় আমার, আর বাড়ি তোমার হয়ে গেল? বহাল তবিয়তে সংসারের বোঝা ঠেলে চলেছি, এরই মধ্যে দখলদারির চিন্তা? মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে প্রকাশের সাহস পায় না। তর্কের খ্যাঁকখ্যাঁকানিতে নাকানি-চোবানি খাওয়াবে যে। স্বামী মানে স্ত্রীর আসামী। কাঠগড়ায় আসামীরও তো কিছু বলার অধিকার থাকে, অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের তাগিদে। অতএব তাপসও ফস্ করে মুখ ফসকে বলে দেয়,—লিগ্যালি বাড়ির মালিক কিন্তু এই শর্মা। শ্রীতাপসকুমার—

—হুঁঃ! লিগ্যাল মালিকানা ফলাতে লজ্জা করে না? আমি পেছনে লেগে ঘ্যানর ঘ্যানর না করলে পারতে বাড়ি করতে? আমি হারাধনদাকে দিয়ে ম্যানেজারের কাছে না পাঠালে পেতে ব্যাঙ্কের লোন? আর ওই গিফট ডিড? আমি অশান্তি না করলে দিত তোমার মা? এই দিত। অষ্টরম্ভা।—দু'হাতের বুড়ো আঙুল হাওয়ায় ঝাঁকিয়ে কলা দেখায় সাধনা।

—যাক, স্বীকার করলে তাহলে?

—কী?

—তুমি যে ভালো অশান্তি করতে পারো সেকথা।

—সেই উনিশ বছর বয়সে তোমাদের সংসারে ঢুকে তো ওই একটা জিনিসই শিখেছি। অশান্তি আমি একা করি? তোমরা করো না?

—সে তো নিরুপায় হয়ে।

—বেশ, এখন থেকে আমি আর কিচ্ছু বলব না। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো।

—আপাতত এক কাপ চা খাওয়ার ইচ্ছে।

—আমার দ্বারা হবে না। হয় মেয়েকে বলো না হয় নিজে ফুটিয়ে খাও। দপদপ করে রান্নাঘর মুখো হয় সাধনা, গজগামিনী নয়, অশ্বারোহিণী হয়ে। মুখের আগল আলগাই থাকে,—কেন যে ছাতার রবিবারটা আসে। মেয়ের ফরমাস, বাপের হুকুম....

—আমি আবার কি ফরমাস করলাম? নেপথ্য থেকে এতক্ষণে প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হয় মামন।

—এখনও করোনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ?

—ভবিষ্যৎকাল!—ফোড়ন দেয় তাপস।

—এ সংসারের ভূত-ভবিষ্যৎ সব আমার নখদর্পণে, বুঝলে?

—খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে হয় না? অধীরকাকুকে বললে কিছু কনসেশন পাওয়া যেতে পারে। রবিবাসরীয় হাতে আসরের একেবারে মধ্যিখানে এসে দাঁড়ায় মামন।

—বিজ্ঞাপন? মেয়ের কথার খেই ধরতে পারে না তাপস।

—আসুন! আসুন! ভবিষ্যৎ জানুন। ভূত-সিদ্ধ মাতা শ্রীশ্রীসাধনা দেবী। —কেতকী দত্তের থিয়েটারি ঢঙ ঝরে মামনের কথায়।

—মাকে ভূত বলবে না? যেমন বাপ তেমনি শিক্ষাই তো পাবে!

—যাব্‌বাবা! আমি আবার কখন তোমাকে ভূত বললাম? কী বাবা, তুমি কিছু বলছ না যে?

—কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীতহারা।

—যত হম্বিতম্বি আমার ওপর। মেয়েকে শাসন করতে হলেই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে যেও মেয়ের শ্বশুরবাড়ি।

—সে তো যাবই। ঘর-শ্বশুর হয়ে থাকব।

—একদিন-দু'দিন। তিনদিনের দিন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেবে। নাও, চা গিলে এমব্রডারিটা বাঁধাতে দিয়ে এসো। ফ্রেমটা একটু চওড়া দিতে বোলো।—ঠক্ করে চায়ের কাপ-প্লেট ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখে সাধনা। রাখার ধাক্কায় প্রমাণিত হয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র—ঘাত প্রতিঘাতের সূত্র। কাপের চা চলকে প্লেটে, প্লেট চল্‌কে ডাইনিং টেবিলের ওপর উপচে পড়ে।

—দরকার নেই। অমন হেলাফেলায় চায়ের দরকার নেই আমার!—এবার সত্যি সত্যিই একটু রাগ হয় তাপসের।

—হেলাফেলা সা-রা—বেলা....সুর ভাঁজা হঠাৎ বন্ধ করে মামন—বাবা, একেই বলে আক্কেল সেলামি।

—মানে? মেয়ের কথা আর বলার ভঙ্গিতে রাগের আগুনে দু'ফোঁটা জল পড়ে।

—মায়ের আদেশে তুমি ঘর পরিষ্কার করা শুরু করলে—রাইট!

—রাইট।—মিছিলের ইনক্লাবের শেষে জিন্দাবাদের মতো বলে তাপস।

—অসাবধানে হাত ফস্‌কে পড়ে মায়ের ছেলেবেলায় শেখা এবং সেলাই করা এমব্রডারি ভাঙলে—রাইট?

—নো! রঙ! হাত থেকে পড়ে যায়নি। পচা দড়ি ছিঁড়ে—

—দড়ি পচল কেন?—শত্রুপক্ষের উকিলের জেরা করে সাধনা।

—ভুলে ভরা বস্তাপচা ওল্ড মেসেজের বোঝা ওইটুকু সরু ফিন্‌ফিনে শাড়ির পাড় আর কতদিন সহ্য করবে?

—ঠিক! ঠিক! সেইজন্যেই জিনিসপত্তর যত্ন করতে হয়। পুরোনো হলে বদলাতে হয়।—মুখের বাক্যে মনের গতিক বোঝা যায় না সাধনার।

—বেশ, তাই হোক! আমি কালই একটা মডার্ন পেন্টিং কিনে দেওয়ালে সেঁটে দেব।

—আর আমার হাতের কাজ?

—মানদামাসির হাতে উঠবে। ফ্লোর ক্লিনারের ভুরভুরে জলে ডুববে, ভাসবে। ফ্লোরও ক্লিন হবে, সেই সঙ্গে....বলতে বলতে চায়ের কাপে চুমুক দেয় তাপস।

—না, উঠবে না। ওটা সুন্দর ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালেই উঠবে।—রায় ঘোষণা করে সাধনা।

—বাবা!

—হুঁ!

—তুমি যে বললে চা খাবে না?

—খাবে না আবার? না খেয়ে যাবে কোথা?

—স্যরি, ভুল হয়ে গেছে। শেষ চুমুকটাও গলার ভেতর চালান করে দেয় তাপস।

আজকাল তাপসের কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গতি থাকছে না মন আর মুখের। রাগ হলেও জমাট পাহাড় হচ্ছে না—উবে যাচ্ছে কর্পূরের মতো। সাধনার প্রভুত্বে নিজেকে সঁপে ব্যোম ভোলা হতে চাইছে। কিন্তু কেন? মাঝে মাঝে উত্তর খোঁজে—একা অন্ধকার ছাদে পায়চারি করতে করতে। কেন এই সহাবস্থান? সহে যাওয়ার ভান? দাম্পত্য কলহের ভয়ে না কলহ কলকলানি পাড়াময় কানাকানি হওয়ার লজ্জায়? কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু প্রণবের কথা মনে হয় মাঝেমধ্যে। স্কুল কলেজের টপার প্রেমে হোঁচট খেয়ে আকণ্ঠ পান করত, ধেনো বাংলা, মাকালী, তাড়ি, ক্যান্ট্রি স্পিরিট—যা পেত ঠোঁটের কাছে। মাতাল হয়ে স্বেচ্ছা-পাগল হত। হেলেদুলে চিৎকার করে পার হত রাস্তা—এই তো জীবন কালীদা, খেলুম, ঢেঁকুর তুললুম, আবার ভুলে গেলুম। আবার খেলুম। বুক জ্বলে

গেল। যাক শালা, তোর বাপের কি?

—একটু টক দই নিয়ে এসো। যা গরম পড়েছে—'সংসার সুন্দর হয় রমনীর গুণে' লেখা কাপড়ের টুকরোটা পলিপ্যাকে চালান করতেই প্রগলভ হয়ে ওঠে সাধনা। কাকের স্বরে বসিয়ে নেয় কোকিলের সুর। বোধহয় মনে মনে আবৃত্তি করে—চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির....। এসো বাপু হে, এসো। পথে এসো। রমণীর তাঁবে সবকিছুই রমণীয়, গোলাপের ফুল রমণীয়, গন্ধ রমণীয় (হাইব্রীডের দৌলতে গোলাপে কি এখন গন্ধ থাকে?) তেমনি কাঁটাও কম রমণীয় নয়। শুধু ক্ষমতা চাই—চুম্বনের ক্ষমতা। বিষ পান করেও কণ্ঠে ধারণ করার ক্ষমতা। সে মুরোদ না থাকলে সব কীসের স্বামী?

—না বাবা! টক না, মিষ্টি দই নিয়ে এসো।—আব্দার ঝরায় মামন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে! মিষ্টি দই-ই আনা যাবে।

—না! আমি যা বলছি তাই আনবে। মিষ্টি দই অপকারী—আবার নিজের চেহারায় ফিরে আসার চেষ্টা করে সাধনা।

—ওফ্!—দুই হাতে শেকল বানিয়ে ডান হাঁটু চেপে বাঁ পায়ে হনুমান-নাচ নাচতে থাকে তাপস। ভাঙা কাচের লুকোনো বর্শাফলক পায়ের চামড়া ভেদ করে ফিন্‌কি রক্ত ঝরায় মেঝেময়।

—ওমা, শিগ্‌গির এসো! বাবার পায়ে কাচ ফুটেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাপসকে ধরে চেয়ারের ওপর টেনে বসায় মামন।

—বেশ হয়েছে। খুউব ভালো হয়েছে। পাপের শাস্তি হাতে হাতে পেয়েছে। গুরুজনদের ব্যঙ্গ করা?—রান্নাঘরে কড়াইয়ের বুকে ফুটন্ত তেলের সমুদ্রে রুইমাছের পেটি ছোঁড়ার ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ ছাপিয়ে ধম্মো দেখে সাধনা।

বশে অবশে

গয়না কিংবা শাড়ি দেখলে আর উপায় নেই। হুমড়ি খেয়ে পড়া ঠিকরানো চোখের নারী-শরীর অবশ হতে সময় লাগে না বিন্দুমাত্র। ইহজগতের যাবতীয় লীলার গঙ্গা প্রাপ্তি ঘটিয়ে মহাজাগতিক চিন্তার স্রোতে তখন ভাসতে থাকেন তিনি। এই ভাসা খড়কুটোর মতো ভাসা-ভাসা ভাসা নয়, একেবারে গভীরে বিচরণ করা। সেই বিচরণের সুযোগ নিয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনো কখনো দুষ্টু হয়ে ওঠে। মহিলার হোঁৎকা শরীরে কোঁৎকা মারার জন্যই তো দুষ্টুমির আয়োজন। অবাধ লীলায় অবাধ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে উপরি কিছু স্বাদ লুঠে নেওয়ার ইচ্ছে। চোখের সামনে এমন অনাচার কোন স্বামীর সহ্য হয়? প্রতিশোধের ক্ষমতা না থাক, প্রতিরোধের শক্তি না থাক, প্রতিবাদ করতে আপত্তিটা কোথায়? তাছাড়া—

—চলুন দাদা, বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। মেয়েদের শাড়ির আমরা কি বুঝব? ওদের দপ্তর ওদের হাতেই থাক। পছন্দ টছন্দ হলে মানিব্যাগ ঝেড়ে-ঝুড়ে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে বরং বাড়ি ফিরে যাব।—পার্থর ফিস্ ফিস্ পরামর্শ মন্ত্রের কাজ করে।

—কিন্তু!

আবার কিন্তু-র কমা কেন?

নীতার পাশ থেকে আলাদা করা গেলেও শেষ চান্সটুকু ছাড়তে নারাজ পার্থ, —চলুন মশাই, চলুন। আমরা বরং শো-কেস দেখে পছন্দ করি। অগত্যা স্পর্শ সুখ ত্যাগ করে পার্থর পিছন পিছন দোকানের বাইরে এসে দাঁড়ায় যুবকটি। মনে বিরক্তি আর রাগের জমাট মেঘ থাকলেও মুখে প্রকাশ করে না।

আমি পার্থ, পার্থ ব্যানার্জী, করমর্দনের ডান হাত প্রসারিত করে পার্থ, আপনি?

—বিভাস, বিভাস বসু।

—বাহ! চমৎকার নাম। সঙ্গে বুঝি আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ, —ছোট জবাব দিয়ে কপালের ঘাম মোছে বিভাস, এ সি না হাতি। ভেতরে গরম দেখেছেন?

—হবে না? কাপড়ের গরম ছাপিয়ে শাড়ি পছন্দ কারিণীদের গুমোরের গরম কি কম? একেবারে গুমোট-গুমসুম ভাব। নিন, সিগারেট খান। —বিভাসের বুকের সামনে প্যাকেট মেলে ধরে পার্থ।

—ধন্যবাদ! আমি ধূমপান করি না।

—বাহ! বেশ বেশ। —প্যাকেট গুটিয়ে পকেটে চালান করে পার্থ, —আমারও তেমন নেশা নেই। মাঝে মধ্যে দু'একটা—

—আপনার মিসেস নেই সঙ্গে?

শালা! এক্কেবারে নিজের মনের ভেতর কোণ চেপে দাঁত খিঁচিয়ে মনে মনে উত্তর দেয় পার্থ, এতক্ষণ কনুইবাজি করে এখন বলে কিনা আপনার মিসেস নেই সঙ্গে? তোমার কনুয়ের খপ্পর থেকে মিসেসকে বাঁচাতেই তো—

—রিণির বড় খুঁতখুঁতে স্বভাব। জানেন পার্থবাবু, কিছুতেই পছন্দ হতে চায় না। —পার্থর জবাবের অপেক্ষা না করে নিজের স্ত্রীর স্বভাব গড়গড়িয়ে ঢেলে দেয় বিভাস,—শাড়ি বলুন, গয়না বলুন, চুড়ি ফিতে লিপস্টিক, এমনকি ইমিটেশনেও—

—অবশ হয়?

—মানে? —পার্থর প্রশ্ন শুনে আঁতকে ওঠে বিভাস।

—মানে শাড়ি-গয়না দেখলে মেয়েদের শরীর একেবারে অবশ হয়ে যায় কিনা! অন্তত নীতার তো হয়ই। —খোলসা করে খোলস ছাড়ায় পার্থ।

—না মশাই, ঠিক বলতে পারব না। চিমটি কেটে যাচাই করে দেখিনি। —মাথা নাড়ে বিভাস।

—দেখুন না আজ একবার যাচাই করে! —পরামর্শ দেয় পার্থ।

—আমার অত সাহস নেই।

(সাহস নেই? ন্যাকা? এতক্ষণ তো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছিলে নীতার শরীরের সঙ্গে। ভদ্রতা বজায় রেখে দাঁতে দাঁত ঘষে পার্থ। দশ বছর আগে হলে এক ঘুষিতে বদন বিগড়ে তবেই ছাড়তাম। বজ্জাত বেহায়া বেল্লিক! নিজের বউ সঙ্গে থাকতে পরস্ত্রীকে তঙ্ করার মজা বুঝিয়ে দিতাম।)

—সে তো দেখলাম। —অন্যমনস্ক জবাব ছুঁড়ে দেয় পার্থ।

—কী?

—ওই সাহস।

—তা যা বলেছেন। —একগাল বেহায়ার হাসি মুখে ছড়ায় বিভাস। অন্তত হাসির রকম দেখে সেটাই মনে হয় পার্থর। সাহস থাকলে কি আর কেউ বউকে সঙ্গে নিয়ে মার্কেটিংয়ে আসে? বউয়ের বদলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসতাম। ওই যে দেখুন, নেভি ব্লু চুড়িদার পরা রিণিকে,—দোকানের কাউন্টারে তর্জনী নিক্ষেপ করে বিভাস,—পঞ্চাশটা শাড়ির পাহাড় সামনে, অথচ পছন্দ হচ্ছে না একটাও।

—আমি ভাবলাম—(শালা! বউকে চুড়িদারের খোলসে আদ্যপ্রান্ত মোড়ক করে এনেছো। অন্যের শাড়ি পরা বউয়ের এদিকে ওদিকে উঁকি মারছো—কনুই ঠুকছো?)

—কী?

—ওই গরদ-রঙা কাঁথাস্টীচ শাড়িমোড়া ভদ্রমহিলা বুঝি আপনার স্ত্রী? —নীতাকে দেখিয়ে চোখের কোণে দুষ্টুমির ঝিলিক ছড়ায় পার্থ, —ওঁর পাশে-পাশেই তো ছিলেন এতক্ষণ, তাই।

—না, না, ওঁকে আমি চিনি না। তবে হ্যাঁ, ভদ্রমহিলার চয়েস আর নলেজ সত্যিই প্রশংসা করার মতো, —গর্বিত ভঙ্গির ঔদ্ধত্য ধরা পড়ে বিভাসের গলার স্বরে।

—বাবা! আপনি তো মশাই সাধু-মহারাজ। দূরদৃষ্টি আছে আপনার।

—কেন বলুন তো?

—ভদ্রমহিলার পাশে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন (ঘেঁষেছিলেন, ঘষটেছিলেন কিংবা লেপ্টেছিলেন—ধুস, লেপ্টেছিলেন বললে নিজেরই কষ্ট হবে। আমার বউয়ের সঙ্গে অন্য পুরুষ প্রকাশ্যে লেপ্টে থাকবে—কষ্ট হবে না! বরং ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন ভাবাই ভালো) তাতে না হয় চয়েসটা বুঝতে পারলেন, কিন্তু নলেজ বুঝলেন কি করে? (শালা ঢপ্‌বাজ! নীতা যে কোনোমতে কেৎরে কলেজের পাঁচিলটুকু ডিঙোতে পেরেছে এই যথেষ্ট—তার ঠ্যালাতেই অন্ধকার। নলেজ আর একটু ঘন হলে কী যে দশা হত, তা তো জানো না চাঁদু!)

—ওঃ। —আশ্বস্ত হয় বিভাস,—সেটা বোঝা খুবই সহজ। যা টপা টপ শাড়ির নাম, ডিজাইন আর সুতোর হিসেব বলে সেলস্‌ম্যানকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছেন!

—তা যা বলেছেন, সারাদিন অ্যাড দেখে দেখে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।

—যাই, দেখি হল কিনা, —পার্থর জবাবের অপেক্ষা না করেই কাচের পাল্লা ঠেলে আবার দোকানের ভেতর ঢুকে যায় বিভাস। নেভি ব্লু চুড়িদার পরিহিতা রিণির পাশে একদণ্ড দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার সরে সরে নীতার পাশে হাজির হওয়ার চেষ্টা করে। মাঝখানে লালপাড় পরিহিতা মাসিমা-মাসিমা চেহারার ভদ্রমহিলা সীমান্তের কাঁটাতার না হয়ে দাঁড়ালে এতক্ষণ....

বিভাস বসু মনে মনে যা গালটাই না দিচ্ছে—মনে মনে ভাবে পার্থ। আর ঠিক তখনই মাসিমা-মাসিমা ভদ্রমহিলা নীতা ও বিভাসের মাঝখানের কাঁটাতার সরিয়ে এগিয়ে যান ক্যাশ কাউন্টারে। দরজার কাঁচ ভেদ করে একরাশ শাড়ির হাট হওয়া কাউন্টারে পৌঁছে যায় পার্থ। শাড়ির ভেতর হাবুডুবু খেতে খেতে কখন যে ভিড়ের অছিলায় বিভাসের মৃদুমন্দ পরশ হিমেল হাওয়া হয়ে বহে যাচ্ছে শরীরের এ কোণ থেকে ও কোণে, টেরও পাচ্ছে না নীতা। এখনই কিছু একটা না করলে পৌরুষে ধাক্কা লাগবে যে। স্বামীত্বের অপমান হবে। তাছাড়া চোখের সামনে উটকো একটা লোক ফালতু কিছু আমেজ লুটে নেবে? আড়ালে আবডালে বাসে ট্রেনে যা হয় হোক। প্রকাশ্য দিবালোকে কাপড়ের দোকানে এ সব হতে দেবে কেন?

না, নীতার পাশে নয়, ভাবতে ভাবতে সোজা নেভি ব্লু চুড়িদার পরা বিভাসের স্ত্রী রিণির পাশে এসে দাঁড়ায় পার্থ। রিণির কাঁধের ওপর দিয়ে হাত ছড়িয়ে কাউন্টার থেকে তুলে নেয় গোলাপি জমির বুকে লাল গোলাপ ফুটে থাকা বালুচরীটা। একটু সরে দাঁড়ায় রিণি আর সেই সুযোগের অপব্যবহার না করে বিভাসের আচরণ টপকে রিণিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মনের ভেতর গুনগুন গেয়ে ওঠে—একটুকু ছোঁয়া লাগে....

—অন্য কোনো কালার আছে? রিণির প্রায় কোলের কাছে শাড়িসুদ্ধ হাত জড়ো করে বিভাসের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় মরীয়া হয় পার্থ। সেল্‌সম্যানের কানে সে কথার রেশ প্রবেশ না করলেও বিভাসের কর্ণকুহরে সে ধ্বনি ডেসিবেলের মাত্রা ছাড়িয়ে বিস্ফোরিত হয়। কানের সঙ্গে চোখ, মণির সঙ্গে কাঞ্চন—পার্থ-রিণির ঘনত্ব সে চোখে মেপে নিতে একটুও দেরি হয় না বিভাসের। নীতাকে ফেলে এবং সঙ্গে আরও দু-চারজন পিসিমা বৌদিদের পেছনে ঠেলে সটান পার্থ-রিণির মাঝখানে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে বস্ত্রবিতারক কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় বিভাস।

দ্যাখ শালা কেমন লাগে! মনে মনে ভাবে পার্থ।

—দাদা, একটু সরে দাঁড়ান। —রাগ চনমনে মনে একটু আগেই জানা 'পার্থ' নামটাও ভুলে যায় বিভাস।

—পরখ করে দেখলাম। অবশে উনি একশয় একশ। —রিণির ডানপাশে বিভাসের স্থান সঙ্কুলান করে দেয় পার্থ।

—তাই বলে আমার স্ত্রীকে....ভূমিকা ছাড়াই চোখ লাল হয় বিভাসের। হুঁশ ফিরে পায় রিণি। এতক্ষণ পরে মনে পড়ে স্বামীর কথা। বিভাসের লাল চোখে প্রশ্নবোধক মাছের চোখ রাখে হাতের শাড়ি জাহান্নামে পাঠিয়ে।

—উনি বুঝি বেওয়ারিশ! —নীতাকে দেখিয়ে শান্ত স্বরে ঝাঁঝ ঢেলে দেয় পার্থ।

—মানে? কী বলতে চান আপনি?

—আহ্! বিভাসবাবু, চটছেন কেন? ইটের বদলে আমি একটা পাটকেল ছোঁড়ার চেষ্টা করছিলাম। —একটুও উত্তেজিত হয় না পার্থ।

—কী হল? ওখানে কি করছ? এদিকে এসো, এতক্ষণে রাশ আলগা করা গৃহপালিত জন্তুটির কথা স্মরণ হয় নীতার।

—উ-উনি? উ-উনি আপনার স্ত্রী? অপরাধীর ধরা-মন বলার ভঙ্গিতে প্রকাশ করে দেয় বিভাস।

—কী শুরু করেছ তোমরা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। —রহস্যগল্পের উপসংহারে সরাসরি পৌঁছনোর চেষ্টা করে রিণি।

—চলো, আমরা বরং অন্য দোকানে দেখি। —রিণির হাত চেপে ধরে বিভাস। —যত্তোসব অসভ্য লোকের—

—মুখ সামলে কথা বলুন মশাই। এবার সত্যি সত্যি গর্জে ওঠে পার্থ।

দোকানের মাসিমা পিসিমা দাদা-বৌদিদের চমকে হাতের মুঠোয় শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় মরীয়া হয়, —সেই তখন থেকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে অসভ্যতামি করছেন।

—আহ্! কী যা তা বলছ? ভদ্রলোকের সমাজে—ছিঃ ছিঃ। —মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা হয় নীতার—ওইজন্যেই তোমার সঙ্গে মার্কেটিংয়ে আসতে ইচ্ছে করে না আমার।

—তোমার স্বভাবটাও যাবে না দেখছি। —বিভাসের পাশে পাশে দোকানের দরজামুখো রিণিও ফুসফুস ফুঁসে ওঠে। ছুঁক ছুঁকে স্বামীকে তো তার চিনতে বাকি নেই।

—দিলেন তো দাদা খদ্দেরটাকে চট্‌কে। —কাউন্টার থেকে পার্থর মুখের ওপর অসন্তোষ ছুঁড়ে দেয় সেলস্‌ম্যান।

—অমন খদ্দের মশাই চটকানোই ভালো। ওতে দোকানের পিণ্ডি চটকে সোজা গয়ায় পৌঁছে যাবে, বদনাম হবে। —রগচটা রাগের রেশ ঠোঁটে ধরে জবাব দেয় পার্থ। নীতার দিকে ফিরে জানতে চায়,—শাড়ি পছন্দ হল?

—পছন্দ করতে দিলে, যে হবে? কে না কে পাশে এসে একটু দাঁড়িয়েছে—

—তাহলে দিদি, এটাই প্যাক করে দিলাম। —সুযোগ সন্ধান করে সেল্‌সম্যান। একটা কবুতর উড়ে গেলেও এ মুরগীটা হাতছাড়া করতে চায় না।

—দিন, কী আর করা যাবে। আর দু-একটা দেখতে পারলে ভালো হত। মন খারাপ করে নীতা।

—দ্যাখো না, যতক্ষণ খুশি দ্যাখো। —বিভাস পালিয়ে যাওয়ায় নিশ্চিন্ত নিরাপদ পার্থ বুক চিতিয়ে পরামর্শ দেয় নীতাকে।

কোনো উত্তর দেয় না নীতা। গম্ভীর চোখ ঠেলে আদেশ দেয় সেল্‌সম্যানকে, —কাউন্টারে পাঠিয়ে দিন। অগত্যা মানিব্যাগ ঝেড়ে টাকা দিয়ে রসিদের সঙ্গে কাপড়ের প্যাকেট হাতে তুলে নিতে হয় পার্থকে। পলিথিনের প্যাকেট দু-একবার ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাকের সামনে দুলিয়ে জানতে চায়, ক্যারি ব্যাগ, মানে বিগ শপার, মানে চটের ব্যাগ-ট্যাগ নেই?

—সাড়ে পাঁচশ-র পারচেজে আমরা ক্যারি, চট, শপার কিছুই দিই না। গিফ্‌টের কলম (টাকায় তিনটে। কাগজের পেট ফুটো করে দেবে কিন্তু লেখা পড়বে না) প্যাকেটে দেওয়া আছে।

—এক্সকিউজ মি স্যার, আমি শেখর—'সংবাদ রোজ রোজ'-এর স্পেশাল করস্‌পনডেন্ট। ঘটনাটা কী ঘটেছিল, একটু বলবেন? মানে ওই ভদ্রলোক কি আপনার মিসেসকে টিজ্‌....সাদা কালো ফরাসি দাড়ির মুখ ঝুলিয়ে জানতে চায় শেখর। এতক্ষণ নজরে না পড়লেও হঠাৎ এমন ধূমকেতুর উদয় রীতিমতো বিরক্তিকর মনে হয় পার্থর।

—না, যা ট্যাকেল করার আমি করে নিয়েছি। ধন্যবাদ! —নিস্তার পেতে আকুল হয় পার্থ।

—ম্যাডাম, আপনি কিছু বলবেন?

—না। —ছোট্ট বলিষ্ঠ উত্তর ঢেলে দেয় নীতা। (কি ঘটেছিল জানলে বুঝলে তবে তো বলবে)।

—আপনারা মুখ না খুললে এই ধরণের শপ-টিজিংয়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা যাবে না। —ভাষণের ভঙ্গিতে চোখ ছোট ছোট করে শেখর।

—কে আপনাকে জনমত গড়ে তুলতে মাথার দিব্যি দিয়েছে? যত্তোসব!—গজগজ করতে করতে হনহন পায়ে দোকানের দরজা ঠেলে রাস্তায় ঢলে পড়ে পার্থ। পিছনে তুঙ্গে ওঠা মেজাজে নীতা। নাছোড় শেখর তখনো নীতাকে ঘিরে।

দেখুন ম্যাডাম, আমরা 'সংবাদ রোজ রোজ'-এ রোজ একটা করে ফিচার করছি। শপ-ক্রাইম, শপ-টিজিং নিয়ে আর্টিকেল করছি। পুজোর সময় এই ধরনের ক্রাইম, টিজিং অনেক অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া একজাতের মানুষ আছে যারা এইসব পরকীয়া ক্রাইম করতে ভালোবাসে। এ আসলে এক মনোরোগ। আমরা রোগ-কে ক্ষমা করতে পারি—রুগীকে নয়, একঢাল বক্তৃতা দিয়ে নিজেকে জাহির করার চেষ্টায় মরিয়া হয় শেখর, সুতরাং কিছু বলুন ম্যাডাম! আপনারা না বললে....

না, কিছুই বলবে না, —ধমক নয়, গম্ভীর হয় পার্থ। সাংবাদিকেরা যে চিনে জোঁক। একবার ধরলে না কেটে ছাড়বে না। তাছাড়া এসব বলায় ঝুঁকিও কিছু কম নেই। পাঁচজনে পাঁচকথার প্যাঁচাল পাড়বে।

আপনি স্যার একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আজ আপনার স্ত্রী টিজড্ হয়েছেন—কাল আপনার কন্যা হবেন, পরশু....।

পরশু আপনার পালা, তখন না হয় প্রাণ খুলে ইন্টারভিয়্যু দেবেন—এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত পার্থ শেখরের কথা থামিয়ে মুখের উপর চটাস চটাস বলে দেয়।

একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন স্যার, নাছোড় সাংবাদিক হাচোড় পাচোড়ে বোঝানোর চেষ্টা করে। হতাশ হয় পার্থ আর নীতার অসহযোগীতায়। এমন একটা টাটকা প্লট হাতছাড়া হওয়ার হতাশা।

কেন মিছিমিছি পিছু নিচ্ছেন বলুন তো? চলার ছন্দ থামিয়ে ছন্দহীন ধমক দেয় নীতা, বললাম তো কিছু হয়নি। অন্যদিকে দেখুন, প্লটের অভাব হবে না।

কিন্তু ম্যাডাম....

কোনও কিন্তুর ধার ধারে না নীতা। পার্থ আগেই হন্‌হন্ হাঁটা শুরু করেছে—এবার নীতাও পায়ের গতি বাড়িয়ে টপকাতে চেষ্টা করে পার্থকে। আর সাংবাদিক শেখর? ব্যাজার মুখে ড্যাব ডেবে চোখ ঠিকরে মাপতে থাকে ওদের চলার গতি।

বিশেষ করে নীতাকে—

বিধান সরণি ধরে পাঁচমাথার দিকে নির্বাক চলার গতি কমিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পার্থ, —রোল খাবে?

—না।

—সেকি! রোলে অরুচি? —অবাক হয় পার্থ। মনে মনে শিউরে ওঠে ভয়ে। রাগে টং হয়ে থাকা বউকে কে না ভয় পায়?

—বিষ খাবো। —ফিস ফিস করে ফুঁসে উঠলেও পথ-চলতি দু'চারজন মানুষের কানের চোরাগলিতে পৌঁছে যায় নীতার ফোঁস শব্দ। কেউ সরে যায় মুচকি হেসে, কেউ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টি মেলে দেয়। দু'একজন আবার নিজের জীবনের উপন্যাস খুঁজে পায়। বিহ্বল হয় আনন্দে, পরমানন্দ তৃপ্তিতে। চেষ্টা করে চুপিচুপি পিছু নিয়ে পরবর্তী অধ্যায় জেনে নেওয়ার।

—দ্যাখো, ফালতু কথা বলো না। শাড়ি দেখলে শরীর অবশ হয়—তাই না? ব্যাটাচ্ছেলে সেই তখন থেকে তঙ্ করে যাচ্ছে, আর তুমি? শাড়ির রঙে ডুবে থাকছ! —নীতার রাগের জবাবে অভিমান ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে পার্থ।

—চোখের ন্যাবা আর মনের বাতিক—আমি কি কচি খুকু না ফুলে ওঠা ফুল যে ভোমরের পাখনায় মুচ্ছা যাবো?

—আমি কি কিছু বুঝি না ভাবছ? —মাঝপথে নীতাকে থামিয়ে দেয় পার্থ।

—কী বোঝো? কী বোঝো তুমি? জবর প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে নীতা।

—দ্যাখো, এটা রাস্তা। ঝগড়া করতে হয় বাড়ি গিয়ে কোরো। রাস্তার মাঝে কেলেঙ্কারি করে লোক জড়ো করো না।

—কী! আমি কেলেঙ্কারি করছি? আমি লোক জড়ো করছি? —থম্‌থমে মেঘের ছবি ঘনীভূত হয় নীতার চোখে।

সব্বোনাশ। পথের মাঝে বর্ষণ শুরু হলে ডুবে মরতে হবে যে! মনে মনে ভাবে পার্থ। অতএব শান্তির অমোঘ বাণী ছড়িয়ে আপাতত বজ্র-বিদ্যুৎ সহ কান্নাপাত বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য, —আহা, রাগ করছ কেন? একটা রোল খেয়ে বরং...

—তুমি আমাকে সন্দেহ করো!

—বিয়ের একযুগ বাদেও কি সে স্কোপ থাকে?

—আর কারো না থাক, তোমার মতো কুচুটে লোকের থাকে।

স্লিপারের ফটাস্ আওয়াজে পিচ-চটা রাস্তা কাঁপিয়ে এগিয়ে যায় নীতা। আর উদাস একলা পার্থ নিজের পায়ে গতির অঙ্ক কষে সমান বেগবান হওয়ার চেষ্টা করে। স্ত্রী-প্রভুকে সামলাতে হবে যে!

স্বাধীনতা দিবস

আজ কত তারিখ?

পনরই আগষ্ট!

মনে আছে তাহলে? আমি তো ভাবলাম ভুলে গুলে হজম করে ফেলেছ।

স্বাধীনতা দিবসের কথা কার না মনে থাকে? দু'শ বছর ইংরেজের অধীনে দাসত্ব পরার পর এটুকু মনে না থাকলে লোকে ছ্যা ছ্যা করবে। ভারতবর্ষের কলঙ্কিত নাগরিক মনে হবে নিজেকে, খবরের কাগজের উপর চোখ রেখেই নিজের বক্তব্য গড় গড়ে ভাষায় গড়িয়ে দেয় তাপস, তবে এ বছর একটা লোকসান হয়ে গেল—

কী? প্রশ্নটার মধ্যে ঝাঁঝ থাকলেও গলায় একটা আদুরে আমেজ থেকে যায়।

ছুটি! স্বাধীনতা দিবসের ছুটিটা রোববার হওয়াতে—

তোমার আজকাল কি হয়েছে বলো তো? চায়ের কাপ হাতে তাপসের পাশে নিবিড় হওয়ার চেষ্টা করে সাধনা।

কি আবার হবে! কিছুই হয়নি—

তাহলে পনেরই আগষ্টের কথা বেমালুম ভুলে গেলে? না, ভুলে যাওয়ার ভান করছো?

কোথায় আর ভুললাম! বললাম তো ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটনের হাত থেকে—

রাখো তোমার ইংরেজ রাজত্ব। বছরে তো মোটে একটা দিন। টুটুলদার কাছে শিখে এসো, গলার স্বরে এতক্ষণে নিজের চেহারায় ফিরে আসে সাধনা।

টুটুলদা? অবাক হয় তাপস, সকালবেলায় ফ্রাঙ্কোর গলায় দড়ি বেঁধে একবস্তা লজেন্স নিয়ে ক্লাবের মাঠে পতাকা তুলতে ছুটেছে—

ধুস! ধুস! সাতচল্লিশ নয়, আমি বলছি ঊনিশ শ বিরাশির পনরই আগষ্টের কথা। বুঝতে পারলে হাঁদুরাম? রহস্য ঘেরা চিনেবাদামের শক্ত বাদামী খোসাটা ছাড়ালেও লাল নরম খোলসটা কিন্তু আঙুলের ভাঁজে থেকেই যায় সাধনার।

বিরাশির পনরই আগষ্ট? মনের ভিতর ডুব সাঁতার কাটা শুরু করে তাপস। কই, ইতিহাসের পাতায় লেখা তেমন কোনও ঘটনার কথা তো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না—

তা পড়বে কেন? আমি কি আর বুঝি না ভাবছো? সব বুঝি? এতদিন ঘর করলাম আর এটুকু ভ্যানতাড়া বুঝতে পারবো না? বাসি বিছানার উপর বেডসীট চাপা দিতে দিতে গজর গজর করে সাধনা। তবে আমিও ছাড়ার পাত্রী নই। সুশান্তদাকে খবর পাঠিয়েছি—একটু পরেই চলে আসবে।

বিশ্বাস করো! অসহায় তাপস খবরের কাগজ দু'হাতের আঙুলে মুড়ে সহায়হীন দৃষ্টি মেলে দেয় সাধনার চোখে।

কেউ বিশ্বাস করবে না। বন্ধু বান্ধব, অফিস কলিগ, পাড়ার লোক, তোমার মা ভাই বোন সবাইকে ডেকে বলো যে পনরই আগস্টের কথা ভুলে গেছ—কেউই বিশ্বাস করবে না।

সাতসকালেই কথার সাতকাহন শুরু করলে? আসল কথাটা না বলে কথার প্যাঁচালে প্যাঁচে প্যাঁচ খেলে আমার স্মৃতির ঘুড়ি ভোকাট্টা করে তোমার লাভ?

আমি প্যাঁচাল পাড়লাম? আমি সাতকাহন শুরু করলাম? সাধনার ভারি গলায় ধরা দেয় নিম্নচাপের পূর্বাভাস।

'ধুস শালা! রোববারটা যে কেন আসে?' বলার ইচ্ছায় মনটা চনমন করে উঠলেও বলার সাহস পায় না তাপস। কথায় বলে morning shows the day, সকাল দেখে দিন চেনা যায়। দাঁত দেখে চেনা যায় ছাগল গরু মোষের বয়েস। মুখ দেখে বোঝা যায় মনের অবস্থা। আর বউয়ের স্বর কানে শুনে অনুভব করা যায় ভালোবাসার গভীরতা। আদরের বহর। অনাদরের অনাবিল উপেক্ষা। শান্তিজলের ছিটে কিংবা অশান্তির ছ্যাঁকা।

ওঃ! ভাল কথা! রতন বলছিলো—

কোন রতন?

রতনকে চিনলে না? বরানগরের রতন। আমাদের অফিসে চাকরি করে, প্রসঙ্গ পাল্টে নতুন কথার জাল বিছিয়ে সকালের থমথমে আবহাওয়ায় চনমনে রোদ ঢালার চেষ্টা করে তাপস।

কি বলছিলো কুচুটে ঘটকটা? আলপনার জন্যে একটা ভাল সম্বন্ধ আছে তাই তো? ছেলের মোবাইল কানেকশনের ব্যবসা। বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে। ছ'টা বোনের মধ্যে চারটে মোটে এখনও অবিবাহিত? জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষকের কাছে পড়া বলার মতো গড়গড় মুখস্থ বলে যায় সাধনা।

বাব্বা! এ যে রাম জন্মের আগেই রামায়ণ শুনিয়ে দিলে। এত খবর তো আমাকেও বলেনি—অবাক হওয়ার সীমানা লঙ্ঘন করে কাঁটাতারের বেড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার দশা হয় তাপসের।

থাক অনেক হয়েছে। আলপনার জন্যে আর তোমার চিন্তা করে চুল পাকাতে হবে না। মাকে সাফ বলে দিয়েছি তোমায় বড় জামাইয়ের দ্বারা কিছুই হবে না—

অফিসের কাজ, সারাদিন কচর কচর পানের জাবনা কাটা আর বই খাতা মুখে গুঁজে পণ্ডিত পণ্ডিত ভাব ছাড়া। শালা শালীদের জন্যে ভগ্নীপতিরা কি না করে? চাকরী যোগাড় থেকে পাত্র পছন্দ পর্যন্ত। আর তুমি? কোনওদিন দিলে ভালো কোনও পরামর্শ না কোনও চেষ্টা চরিত্র। ইয়ারকি ফাজলামি ছাড়া কোনদিন শালীদের সঙ্গে ভদ্রভাবে দু'টো ভালো কথা বললে? বৈষ্ণব হওয়ার সাধ হলেই হয় না—মচ্ছবও করতে হয়।

কি সব আবোল তাবোল আনাড়ি বকবক করছো? এতক্ষণে সত্যি সত্যিই মটকা চটকে বিরক্ত হওয়ার চেষ্টা করে তাপস।

আবোল তাবোল বকবক করছি? ছাদ ভর্তি একগাদা টবে গাছ লাগিয়েছ—ক'টা গাছে জল দাও শুনি? পিন্টুকাকুকে দেখে একবার শিখে এসো। কোন সাতসকালে উঠে বালতি বালতি জল ঢেলে, টব নিঙড়ে বাজারেও চলে গেল। আর তুমি? দয়া করে ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ মেলে বসে আছো। স্বাধীনতা দিবসের ফুরফুরে স্বাধীন হাওয়ায় ভাসছো।

তুমিই তো চা দিতে দেরি করলে। তাছাড়া সত্যিই তো আজ রবিবার, পনরই আগষ্ট—

পনরই আগষ্ট! বলতে লজ্জা করছে না?

লজ্জা করবে কেন? বরং বুক ফুলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? দেবদুলালের স্টাইলে আবৃত্তি করার চেষ্টায় চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় তাপস। হাত রাখে সাধনার দু' কাঁধের উপর।

এক ঝটকায় তাপসের দু'হাত কাঁধ মুক্ত করে সূর্যমুখী লঙ্কার তেজ ঝরায় সাধনা, আদিখ্যেতা না করে বাজারে যাও। চিকেন নয় আজ একটু রেওয়াজী মাংস আনবে। গোপালের দোকানের। মামনের দুই বন্ধু, আর সোনাকেও খেতে বলেছি—

তবে যে বলছিলে স্বাধীনতা দিবস একটা আদিখ্যেতা। এখন তো নিজেই দেখছি পালন করার সব ব্যবস্থা করে রেখেছ, ধমক খেয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ে। পান সাজার সরঞ্জাম আগলে নেয় বুকের সামনে। কট্ শব্দে যাঁতির ফাঁদে সুপারির ফালি টুকরো করে। সকালের প্রথম পানটা একটু জম্পেশ করে চিবুতে হবে বই কি!

কি কিনলে বউমা? সাধনার মুখে কোনও উত্তর ফুটে খই হওয়ার আগেই ঘরে ঢোকেন পারুল—সাধনার শাশুড়ি। তাপসের মা।

কি আবার কিনবো? আপনার ছেলে তো আমার হাতে এক ব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে রেখেছে—যা খুশি কিনবো. খরচখরচা করবো, শাশুড়ির প্রতি শব্দগুলো উচ্চারিত হলেও কটাক্ষ যে তাপসের দিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না কারও।

মন্টুর সবজির ভ্যান তোমার দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম কিনা তাই-

উপর থেকে খবরের কাগজ তুলে নিতে নিতে জানিয়ে দেন পারুল।

কাঁচকলা মানকচু আর পুড়িয়ে খাওয়ার বেগুন কিনলাম, বিছানা গোছানোর একদম শেষপর্বে উত্তরের ব্যঙ্গ ছড়ায় সাধনা।

কাঁচকলা মানকচু তো সংসারে লাগে, কিনতেও হয়। আমি কিন্তু এখন বউমা কাঁচকলা কেনার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, খবরের হেডলাইনে চোখ রেখে শুনিয়ে দেন পারুল।

জানি। আমি সব বুঝি। আপনার ছেলেকে তো আপনি চেনেন না। হাড় কঞ্জুষ। পিছন দিয়ে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাবে তবু বউয়ের জন্যে এক পয়সাও খরচ করবে না। ওসব শখ আহ্লাদ থাকতে হয়। মন থাকা চাই, কথায় কথায় কথার বাঁধ দিয়ে নিজের যুক্তিতে বেনোজল আটকানোর চেষ্টা করে সাধনা।

এটা তোর ভারি অন্যায়—সাধনার পক্ষে সওয়াল করেন পারুল, বছরে একটা দিন সবাই কিছু না কিছু করে।

কেন আপনার অন্য ছেলেমেয়েরা করে না? পয়লা আগষ্ট টুটুলদা গিনি ম্যানসন থেকে হার কিনে আনলো। আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন তো আজকের দিনের কথাটা মনে আছে কিনা?

মনে থাকবে না কেন? এ দিনটার মতো এমন সহজে মনে রাখার দিন বছরে আর কটা হয়? ছেলে আর ছেলে-বউয়ের কথা কাটাকাটির ফাঁদে পড়ে খবরের কাগজ পড়া শিকেয় ওঠে পারুলের, অবশ্য পয়লা বৈশাখ, পয়লা জানুয়ারি কিংবা ছাব্বিশে জানুয়ারিও সহজে মনে থাকে—

ধুস! কার সঙ্গে কার তুলনা? স্বাধীনতার সঙ্গে নববর্ষ, নববর্ষের সঙ্গে প্রজাতন্ত্র। পনরই আগষ্টের ক্রেজের কাছে কেউই না—সব হেজে মেজে যাওয়া দিন, মা না বউ কার উদ্দেশে বাণীর বান ছড়ায় তাপস বোঝা যায় না।

অসারের খালি তর্জন গর্জনই সার। স্বাধীনতা দিবস! স্বাধীনতা দিবস! যার স্বাধীনতা, যাঁদের জন্যে স্বাধীনতা তাঁদের নেই হুঁস—উনি সমানে লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ওঠে সাধনার—আমি কি কিছু বুঝি না ভাবছো? সব বুঝি। এসব হলো বাহানা। এড়িয়ে যাওয়ার বাহানা।

সাতসকালে রামায়ণের সপ্তকাণ্ড না খুলে বরং সংসারের কাজে মন দাও—ইহকালের মঙ্গল আর পরকালের সুখ শান্তি মাকাল ফলের মতো টুসটুসে পাকা হবে, মুখের গহ্বরে পান ঠোসার আগে বাক্যির আলপিন ঠুসতে ছাড়ে না তাপস।

কি আমি মাকাল ফল? কাঁসার বাসন হাত থেকে মেঝেতে পড়ার মতো ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে সাধনা, আমি মাকাল ফল হলে তুমি শিমুল, পলাশ, ধুতেরা ফুল।

আহ্! পলাশ! বেড়ে বলেছ কিন্তু! বাংলা নিয়ে পড়লে বিলম্বে হলেও লম্বা

একটা ডকটরেট হতে পারতে, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার ভঙ্গীতে দুই দাঁতের মাঝখানে জিভের আন্দোলনে পান জর্দা সুপারি চর্বনে ব্যস্ত হয় তাপস।

হ্যাঁ! হ্যাঁ! পলাশই তো—রূপ আছে ঠিকই কিন্তু গন্ধ নেই।

আছে আছে, সব আছে। পলাশে হাতছানি আছে, হুহুম না না মাথা নাড়ায় তাপস—বসন্তের হাতছানি। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—

আহ! তোরা একটু থাম তো, খবরের কাগজে মুখ চুবিয়ে বিরক্ত পারুল ধমকে দেন ছেলে আর ছেলের বউকে, সকাল সন্ধে খালি গজর গজর ক্যাচাল আর প্যাচাল।

ক্যাচাল প্যাচাল আমি করি? করে আপনার জিলিপি পেঁচানো ছেলে, চোখের কোণে মেঘ জমিয়ে গলার স্বরে বাদলের গুড় গুড় গুড় ধ্বনি আহ্বান করার চেষ্টা করে সাধনা। সাধ্যি সাধনা ছাড়াই পুরুষদের দুর্বল করার স্বভাবজাত কৌশল মেয়েদের। চোখের কোণে ঢল নামিয়ে পাট পাট চিৎপটাং করে দেওয়ার মন্ত্র। কান্নার বিকল্প তো এখনও আবিষ্কার হয়নি। ফুটিকাটা মাঠে আষাঢ়ের ঢল তবু সহ্য করা যায়। দাম্পত্যের হাটে জলের ভূমিকা মোটেই জোলো নয়। বরং উজ্জ্বল, জ্বলে ওঠে জ্বল জ্বল।

আমি দু'জনেই বলছি, বিচারকের রায় দেন পারুল।

কই আমাকে যখন মাকাল বললো তখন তো কিছু বললেন না? নাছোড় সাধনার হাঁচড় পাঁচড় থামে না।

আর তুমি যে আমাকে পলাশ শিমুল ধুতরো বললে? পানের জাবর কাটতে কাটতে জবর জবাব দেয় তাপস।

বেশ করেছি, বলেছি! হাজার লক্ষ নিযুত বার বলবো। তুমি আমাকে মাকাল বলবে আর আমি তোমাকে গোলাপ রজনীগন্ধা যুঁই চামেলী বলবো?

কি বাচ্চাদের মতো তুই থুলি, মুই থুলি শুরু করলি? ধমকে ওঠেন পারুল, সকালবেলা কাগজ পড়তে আসাই দেখছি ঘাট হয়েছে। যাই দেখি মন্টুর গাড়ি আছে কিনা দেখি। একটু উচ্ছে কাঁচকলা কিনতে হবে—সুড়ুৎ করে সটকে পড়ে নিস্তার পান পারুল। পাঠকহীন খবরের কাগজ দাঁত মেলে পড়ে থাকে টেবিলের উপর।

হ্যাঁ, তাই বলবে, পান জর্দার রসে মুখের ভিতর সুনামীর তুফান উঠলেও গলার স্বরে পুকুরের ঢেউ তুলতেও ভয় পায় তাপস।

না, বলবো না। কেন বলবো শুনি? বছরে তো একটা দিন। সেদিনটার কথাও যে ভুলে যাওয়ার ভান করে...। গজগজে গজগামিনী হয়ে রান্নাঘর মুখো হয় সাধনা।

যাক্! পনরই অগস্ট সকালের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যবনিকাপাত হলো—মনে মনে সন্তুষ্ট হয় তাপস। ছুটির দিনগুলোর আলাদা একটা ক্রেজ আছে।

ঘ্যান ঘ্যানে একঘেয়েমিহীন আমেজ। সকাল সকাল ছোটাছুটি নেই—গরুর মতো গবাগব গরমাগরম ডাল ভাত মাছের ঝোল পাকস্থলীতে চালান করার হুল্লোড় নেই—গাড়ি ফেল করে পরের গাড়ির আশায় বারবার ঘড়ি দেখা নেই—ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে লছমনঝোলা হওয়া নেই—বাসের গায়ে জোঁক হয়ে লেপ্টে থেকে চ্যাপটা হওয়া নেই—হাজিরা খাতায় বড়বাবুর লাল গুণ চিহ্নের ভয় নেই—ফাইলের চোরাবালি গর্ত নেই—টিফিনে লুকিয়ে চুরিয়ে শুকনো রুটি চিবিয়ে নেওয়া নেই—ছ'টা চল্লিশের ট্রেন ফেল করার ভয় নেই—বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মেয়ে বউয়ের কাছে কৈফিয়তের নামতা মুখস্থ বলা নেই—ছুটির দিন মানেই শুধু নেই আর নেই। তবে হ্যাঁ—আছে, থাকার মধ্যে আছে আদেশ পালন করা—ফাইফরমাস শোনা এবং খাটা—এটা আনা, সেটা আনা—জানলার সার্সি, পেলমেট, টিভি, টেপ পরিষ্কার করা—গাছের টবে জল ঢালা—কচাকচ পান চিবুনো—বেসিনে পিক ফেলে কল না খোলার জন্য দাঁত খিচুনি শোনা—মেয়েকে মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা—দুপুরে একটু কচি কচি ঘুমের কোলে ভেসে থাকা—বিকেলে (থুড়ি সন্ধেয়) নিজের চা নিজের হাতে বানানোর রেওয়াজ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। নেই-র চেয়ে আছে-র পাল্লা ভারি হলেও আনন্দের সীমা নেই। থাকবে কেন? সংসার যে!—অসাড়ের পটে সঙ হয়ে জীবনের সার খোঁজার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে? না থাকতে পারে? কিচির মিচির, খিচির খিচির? অভিযোগ আর নালিশ? দোষারোপ কিংবা খোঁটা? ওগুলোই তো আসল--মানুষ চাঁদ দেখে। চাঁদের কলঙ্ক দেখতে কি ভালো লাগে? তাছাড়া সংসারে নারীরা একটা কমপ্লেক্সে ভোগে—'হামবাগ' বোধের রোগে ওরা কাতর (আহা বেচারি!)। পিতৃগৃহ উজার করে পতিগৃহে ওরা আসে গার্জেন হয়ে। সুতরাং গর্জন একটু তো থাকবেই। সারাদিন উৎপাতের ধকল তো কম সইতে হয় না ওদের। পুত্র কন্যা ছাড়াও শাশুড়ি ননদ পড়শীরা তো আর কম বড়শীর ফাঁদ পেতে রাখে না। অতএব দোষ কারও নয় গো মা—সখাদ সলিলে সাধনারা যে ডুবেই থাকে। হাত বাড়িয়ে ভেসে ওঠার ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে তাপসদের মতো স্বামীদের একটু দুষলে ক্ষতি কি? ওতে দোষ হয় না। ভালোবাসার দুধে চোনা পড়ে না একটুও। বরং চাপান উতোর জমে জমে ক্ষীর হয়—প্রেমের ক্ষীর। সংসারের নীড়ে সে ক্ষীর না থাকলে কি সংসার সারবান হয়? পৃথিবীর পেটে আগুন জমা হলে আগ্নেয়গিরি হতে পারে আর বউয়ের বুকে রাগ জমা হলে মুখে খই হয়ে ফুটতে পারবে না কেন? পৃথিবী জুড়ে এখন উদার নীতির যুগ। সেই যুগের তালে তাল মিলিয়ে উদার হওয়ার উদাহরণ হতে চেষ্টা করতে হবে। মনে মনে ভাবে তাপস।

তাহলে রেড মিট-ই নিয়ে আসি—কি বলো? দই? দই আনবো? বাজারের ফর্দ ঝালিয়ে নিতে চায় তাপস। ঠিক ঝালিয়ে নয়—বরং বলা ভালো তেলিয়ে

নেওয়ার বাসনায় সাধনার পাশে ঘুরঘুর করে আদর্শ স্বামীর আদর্শে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়।

যা খুশি হয় আনো। সাতবার বলেছি, বারবার বলতে পারবো না।

তারপর তো তুমিই বলবে—এটা আনলে কেন? ওটা কি আনতে বলেছিলাম? হেন তেন কতো কি! জিজ্ঞাসা করলেও দোষ, না করলেও বলবে আমার কাছে কি শুনে গেছিলে? উদারতার উদাহরণ হওয়া শিকেয় তুলে জটিল কুটিল অমায়িক শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছে হয় তাপসের। পানের পিক আগেই বেসিনে উগরে এসেছে এখন সেখানে জল ঢালতে ব্যস্ত হয়। বিয়ে করে সংসার করতে না এলে শাঁখের করাত দেখার সৌভাগ্য হতো না।

আপাত সংলাপহীন সাধনাকে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত রেখে তাপসের পকেটে ট্যাক্ চ্যাক, ট্যাক চ্যাক শব্দের আবহসংগীত ছড়ায় মোবাইল ফোন—পরিভাষায় অবশ্য একে 'মেসেজ অ্যালার্ট টোন' বলে অর্থাৎ হে মহামান্য গ্রাহক, আপনি এখনি একটা সংবাদ (সন্দেশও বলা হয়) পাইবেন—এস এম এস মারফৎ। সুতরাং অ্যালার্ট মানে প্রস্তুত মানে সাবধান হউন!

সাবধান হয় তাপস। পয়লা জানুয়ারি, পয়লা বৈশাখ তবুও দু'একটা শুভেচ্ছা বার্তা আসে—পনরই আগষ্ট কে আর বার্তা পাঠাবে—মোবাইল কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ছাড়া? এস এম এস বার্তা সুতরাং আপাতত পকেটেই ঝোলানো থাক—ঝোলা হাতে বাজারের পথে রওয়ানা হয় তাপস।

কড়কড় করে ওঠে সাধনার চোখ জোড়া। এতক্ষণ বুক ফাটানো খই মুখে ফুটলেও তাপসের অবর্তমানে স্থবির স্থানু হয়ে যায়। কি লোকের সঙ্গেই না সঙ্গত। সংসারের সার বহনের চেষ্টা। মোটে তো বারো পেরিয়ে তেরয় পা। এরই মধ্যে উদাসীনতা? অবজ্ঞা কিংবা অবহেলার বাহানা? অথচ টুটুলদা—কুড়ি পার করেও কেমন সুন্দর চনমনে, খেয়ালি (খামখেয়ালি নয়—'খাম' হীন অর্থাৎ খেয়াল রাখেন যিনি)। সকালবেলা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও হেঁয়ালি। আরে বাবা, পনরই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস—সবাই জানে। এমনকি ছোট্ট শিশুটাও—স্কুলে লজেন্স দেয় যে! স্বাধীনতার মর্ম না বুঝলেও লজেন্স চুষতে চুষতে লালা ঝরিয়ে জামা ভেজানোর আনন্দ কি কম?

শাড়ির আঁচলে ঝাপসা হওয়া চোখ মুছে নেয় সাধনা। পনরই আগষ্ট তার জীবনে যে অন্য বার্তা বহে আনে। প্রথম দিকের দু'এক বছর ছাড়া প্রতি বছরই ইনিয়ে বিনিয়ে সে কথা মনে করাতে হয়েছে তাপসকে। মাঝে দু'বছর দুঃখে অভিমানে চুপ করে থেকেছে। মা বোন কিংবা বন্ধু বান্ধবরা জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে গল্প বুনেছে। দিন কেটে যাওয়ার অনেকদিন পর সেসব কথা শুনে ঠ্যা ঠ্যা হেসেছে তাপস। পিত্তি জ্বালানো হাসি। হাসি থামলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু পালন করতে ভুলে

গেছে। তবুও খুশি থেকেছে সাধনা। আহা বেচারা তাপস—বড্ড উদাসীন। আগামী বছর নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি পালন করবে।

তাপসদা, একটা মেসেজ দিয়েছিলাম—পেয়েছেন নিশ্চয়ই, বাজারে ঢোকার একটু আগেই প্রশস্ত পথের উপর প্রথম দোকানটাই সুশান্তর। 'অলংকার মহল'। তিন বাই সাড়ে তিন-র ঘুপচির নাম মহল। পিত্তি জ্বলতে আর বাকি থাকে না—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। সেই মহলে অলংকার কারবারী সুশান্ত। দোকানে তো ভুল করেও খদ্দের আসে না। না আসুক, সাইকেল চেপে সারা দুপুর টৈ টৈ করে এ বাড়ি ও বাড়ি। কর্তারা তখন ঘরে থাকে না। —এই ডিজাইনটা লেটেস্ট! আপনাকে যা মানাবে না বৌদি! কাগজে পড়েননি? আগামী বাজেটে সোনার দাম একেবারে তিনগুণ বাড়বে? না বেড়ে উপায় কি? আরব দেশগুলো তেল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যে! ইত্যাদি ইত্যাদি হাসিমুখো সব ডায়ালগ ঝেড়ে ঝেড়ে গিন্নিদের জপায়। ইন্সটলমেন্টে গয়না চাপায়।

মেসেজ? তুমি দিয়েছিলে? কেন হঠাৎ (কোন আহ্লাদে)? অবাক হয় তাপস।

শুভেচ্ছাও বলতে পারেন। আপনাদের জন্যে এই ছোট ভাইটার অভিনন্দন, দোকানের সামনে রাস্তার ধুলো মারতে জলের ছিঁটে দেয় সুশান্ত। হাতে কাজ, মুখে হাসি, কথায় মধু, বুকের ভিতর ছুরি—তবেই না ব্যবসায়ী।

শুভেচ্ছা? অভিনন্দন? সুশান্তের কথার মাথামুণ্ডুও বোধগম্য হয় না তাপসের। তো তো তোতলাতে থাকে। স্বাধীনতা দিবসে সুশান্তর শুভেচ্ছা? তাও মানাতো তাপস যদি হোমরা চোমরা কেউকেটা নেতা-টেতা কেউ হতো।

শুভেচ্ছা না জানালে যে ভারি অন্যায় হবে। আপনার আর সাধনা-বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই যে আলাদা। আসুন না তাপসদা। এক ভাঁড় চা খেয়ে যান, হাতের কাজ সেরে একফালি বেঞ্চটা দোকানের সামনে মেলে আহ্বান করে তাপসকে, আজকের দিনে বাজার করবেন? বৌদিকে দিয়ে রান্না করাবেন?

বলে কি ছেলেটা? সাপের লেজে পা পড়ার মতো মনের অবস্থা হয় তাপসের। ভদ্রতার খাতিরে কড়াপাকের কোনও বাক্য ব্যয় না করে মুচকি হাসে, স্বাধীনতা দিবসে উপোস করে থাকতে হয়, জানা ছিলো না তো।

উপোস করে থাকবেন কেন? পেঙ্গুইন ইন্‌ন-য়ে যাবেন। মামন তো বিলাসপুরে। আপনি আর বৌদি। সারাদিন খাবেন দাবেন বেড়াবেন। এনজয় করবেন। তা নয়, সকাল হতে না হতেই ব্যাগ হাতে বাজারে হাজির হলেন! বসুন বসুন। এসেই যখন পড়েছেন একটু চা খান, বেঞ্চ পরিষ্কার করে তাপসকে আহ্বান করে সুশান্ত।

না না, এখন চা খাবো না, এড়িয়ে যায় তাপস।

ফেরার সময় একটু আমার এখানে হয়ে যাবেন তাপসদা। বৌদির জিনিষটা

নিয়ে যাবেন। একটু পালিশ বাকি আছে, করে রাখবো—শুনিয়ে দেয় সুশান্ত।

আবার গয়না গড়াতে দিয়েছে সাধনা? মানে আবার ইন্সটলমেন্টের বোঝা? মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে তাপসের। ফ্যাকাসে মুখমণ্ডলে কুতকুত জ্বলতে থাকে পলকহীন মাছের চোখ।

গোপালের দোকানে মাংস কেনার লাইনে দাঁড়িয়ে সুশান্তর কথামনে পড়ে তাপসের। পাঞ্জাবীর ঝুল পকেট ঝেড়ে মোবাইল সেটটা খইনীর দলার মত মেলে ধরে বাঁ হাতের তালুর উপর। বুড়ো আঙুলে পর পর পুশ করে নব—মেনু—ম্যাসেজেস্—ইনবক্স। তারপরই ভেসে ওঠে মোদ্দাবার্তা—কনগ্রাচুলেশন! হ্যাপি উইডিং অ্যানিভার্সারী—সুশান্ত।

তাইতো! এতক্ষণে চিত্রনাট্যটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাপসের মগজে। পনরই আগষ্ট যে তাদের বিয়ের দিন। তাপস আর সাধনার সাতপাকের পাঁকে পড়ার দিন। স্বাধীনতা দিবসের দিনে পরাধীন হওয়ার দিন। এতক্ষণে বুঝতে পারে তাপস—সাধনার মন কেন সকাল থেকেই বাদলের মেঘে ঢাকা। এতক্ষণে বুঝতে পারে তাপস—সাধনা কেন সকাল থেকেই মেজাজের তিরিক্ষে উঠে বসে আছে। এতক্ষণে বুঝতে পারে তাপস—ঢাক ঢাক গুড় গুড়, পেট ফাঁপা অম্বলের রোগীদের মতো চুক চুক প্যাঁচালো ট্যারা বেঁকা কথার ঢেঁকুর না তুলে কেন সে রজনীগন্ধা জুঁই চামেলী নয়—পলাশ শিমূল ধুতরো মাত্র। কিন্তু সুশান্ত? ব্যাটাচ্ছেলের সাহস তো মন্দ নয়। যার ব্যথা তার হুস নেই—পাড়া পড়শীর ঘুম নেই? কনগ্রাচুলেশন! শুভেচ্ছা? অভিনন্দন? না ধান্দা? গয়না বেচার ধান্দা? সাধনারও বলিহারী! সব কথা বাইরের লোককে না বললেই নয়? স্বাধীনতা দিবস যে পরাধীন জীবনের বর্ষপূর্তি সে কথা খোলামেলা এবং সরাসরি মনে করিয়ে দিলেই তো হতো—একরাশ ভড়ং ভাঙটামি না করে। রাগে সারা শরীর জ্বলে ওঠে। টোসা টোসা ফোস্‌কা পড়ে মনে। ইচ্ছে করে বাজারের ব্যাগ ট্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধুত্তোর বলে উধাও হতে। কিন্তু পারে না—একে বঙ্গসন্তান তাব উপর ধুনোর গন্ধ অর্থাৎ নিরীহ স্বামী।

বলুন তাপসদা—রাং দেবো না সামনের দাপনা? গোপালের প্রশ্নে সম্বিত ফেরে তাপসের।

যা ভালো হয় দাও! আমার কাছে রাং দাপনা সবই সমান—একাকার, জগত আনন্দময়। সেখানে রাং-য়েও আনন্দ, দাপনাতেও আনন্দ, কথামৃতের মতো কথকথা ছড়ায় তাপস। আর গোপালের হাতে রেওয়াজী খাসির রাং দাপনা একাকার হয়ে পাল্লায় ঝুলতে থাকে ওজন হয়ে।

নাও ধরো, বাড়ি পৌছে বাজারের থলি ধরানোর আগেই লাল ভেলভেট মোড়া পিসবোর্ডের বাক্স সাধনার হাতে ধরিয়ে দেয় তাপস।

ওমা! সুশান্তদার দোকানে গেছিলে বুঝি, নতুন গয়না শাড়ি পেলে মেয়েরা

ঝরনা হয়ে যায়। পাথরের শুকনো বুক থেকে উছলে পড়ে নিরেট পাহাড়ের বুক চিরে সজীব স্বচ্ছলতা আনে। সাধনাও তেমনি কলকল ঝাঁপিয়ে পড়ে খুশিতে, তবে যে এতক্ষণ ন্যাকামী করছিলে? স্বাধীনতা দিবসে বৃটিশের শৃঙ্খল দেখাচ্ছিলে—

বৃটিশের নয়, বরং নিজের হাতের শিকল নিজেই দেখছিলাম, রান্নাঘরে সিঙ্কের পাশে বাজারের থলি নামিয়ে রাখে তাপস।

এই হারটা আর লকারে রাখবো না—সব সময় পরবো। এসটা একটু আটকে দাও না, তাপসের মুখের সামনে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় সাধনা, সুশান্তদাকে বলে রেখেছিলাম। তোমার যা ভুলো মন।

কতো পড়বে? মানে মাসে মাসে কত টাকা গুনতে হবে? অনেকদিন বাদে নিজের স্ত্রীর ঘাড়ে নিচের চামড়া ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাপস। আহা! যদি একটা কুবেরের ভাণ্ডার থাকতো—যতো খুশি টাকা থাকতো—মাসকারবারের হিসেবহীন মাইনের উৎস থাকতো—কী মজাটাই না হতো। এসব ভাবনা ঠেলে মনের আড়ালে তবুও হিসেবের ডাইনিবুড়ি হাতছানি দিতে ভোলে না।

বেশি না। সাতশ টাকা করে বারো মাস। প্রগলভা সাধনা একযুগ আগের সাধনা হতে চেষ্টা করে। হিসেব বুঝিয়ে দেয় একেবারে ক্লাশ ওয়ানের ছাত্রকে।

ওঃ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়তেও কষ্ট হয় তাপসের।

আজকাল কতো সুবিধে হয়েছে বলো—বিবাহবার্ষিকীর উপহারও ইন্সটলমেন্টে পাওয়া যায়—তাই না? ছোট্ট খুকির মতো চঞ্চল ঝলমলে হয়ে ওঠে সাধনা। পনরই আগষ্ট সকালে নতুন হার গলায় হার-না-মানা সাধনায় পরিণত হয়ে স্ত্রী-মনিবের ভূমিকায় গর্বিত হয়ে ওঠে।

হুম!

এ্যাই! অমন মুখ গোমড়া করে বসে থেকো না তো। সব ঠিক হয়ে যাবে। সামনের মাসে ডি এ বাড়বে। তারপরের মাসে পুজোর বোনাস পাবে। এতো চিন্তা ভাবনার কি আছে। বছরে একটা মোটে স্বাধীনতার দিন, বিবাহ বার্ষিকীর দিন—তাছাড়া মামনের জন্যেও তো ভাবতে হবে।

না না, ভাবতে যাবো কোন দুঃখে। যার ভাবনা সেই ভাববে—আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না—আজ আমার ভাবনা রবে না, ভাবনার পিঠে সওয়ার হয়ে ভাবলেশ ভাবনাহীন হওয়ার চেষ্টায় পানের পাত্র মুখো হয় তাপস।

এক কাপ চা খাবে? না একটু কফি করে দেবো, রান্নাঘর ছেড়ে তাপসের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে সাধনা।

হেনস্থা

এ মাসের ফর্দে ওভারনাইট ক্রীম আর হেয়ার রিমুভার লেখার কথা ভুলো না কিন্তু। ওভারনাইট ক্রীমের একটা দলা হাতের তালুতে পিষতে পিষতে কথাগুলো ছুঁড়ে দেয় চন্দ্রা। প্রথম শীতের কচি ঠাণ্ডা ঘেরা শব্দগুলো ভাসতে ভাসতে এসে আছড়ে পড়ে মিহিরের কানে। বলা তো নয় আদেশ। রস কসহীন নিরেট নির্দেশ।

রাতের এই সময়টা বড়ো একান্ত সময়। চাকরির ঝনঝনানি নেই। কৌতূহল কোলাহলের হুল্লোড় নেই। বাস মোটরের হর্ন নেই। ফাইল নেই। উপরওয়ালার হম্বিতম্বি নেই। ইউনিয়নের চলছে চলবে নেই। যা আছে তা হলো দু'চারটে ঝিঁঝিঁ পোকার কিচ কিচ শব্দ। আর দু'জনকে দু'জনের নীরব চোখে দেখে নেওয়া। কিন্তু...

রাতের এই সময়টা বিছানায় আধশোয়া বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ফুসফুস ভরাতে ভরাতে মিহির আজকাল বাসি খবরের কাগজের বুকে চোখ বুলায়। কয়েক বছর আগেও আধ বোজা চোখে তারিয়ে তারিয়ে চন্দ্রার শরীর জোড়া খাঁজুরাহের শ্রাবন্তী খুঁজতো। এই সময়টা চন্দ্রারও একান্ত নিজস্ব ছিলো। একরাশ পোষাকের জঞ্জাল মুক্ত দেহটাকে কোনোমতে একটা সুতির পাতলা নাইটিতে জড়িয়ে একের পর এক প্রসাধনের প্রলেপ ঢেলে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সাড়ে তিন ফুট আয়নার সামনে বসে থাকতো অনেকক্ষণ।

সংসারের টুকিটাকি কথাবার্তা বিনিময় করা ছাড়া এখন আর আগের মতো কোনও কথা বা গল্প খুঁজে পায় না ওরা। সংসার বলতে সাড়ে ছ'শো স্কোয়ার ফুট ফ্লাটে মাত্র দু'জনের বসবাস। চন্দ্রা আর মিহির। মৌমিতা এখন আর ওদের কাছে থাকে না। কালিম্পঙের একটা স্কুলে এবছরই কেজি ওয়ানে ভর্তি হতে পেরেছে। গতমাসেই ওরা দেখে এসেছে বাবা মাকে ছেড়ে এতটুকু মেয়ের হোস্টেলে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

মৌমিতাব জন্য মাঝে মধ্যে মিহিরেব মন খুব খারাপ হতো। এখন অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। চন্দ্রা বরং তুলনায় অনেক কঠিন। মেয়েকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রথম সারিতে দাঁড় করাতে হবে তাই অত মায়া দয়ার ধার ধারে না। আদর দিয়ে বাঁদর গড়ার চাইতে শাসন করে মানুষ গড়ে তোলাই তার একান্ত ইচ্ছে।

ভালো কথা! কাল আমাদের একসিকিউটিভ কমিটির মিটিং, চুলের গোড়ায়

ব্রাশ বোলাতে বোলাতে বলে চন্দ্রা, সুজাতাকে কিন্তু অযথা আটকে রেখো না।

ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে কোনও স্পেশাল লীভের অর্ডার আসেনি, সিগারেটে শেষ টান দিতে দিতে বলে মিহির।

তোমরা খালি শিখেছ ম্যানেজমেন্ট আর অর্ডার। চুলের ব্রাশটাকে তর্জনীর মতো উঁচিয়ে ধরে চন্দ্রা।

চন্দ্রা আর মিহির। ফ্লাটের এই ঘরটায় এখন এক ছাদের নীচে ওরা স্বামী স্ত্রী। গত এপ্রিল মাসে ওদের বিবাহিত জীবন নয় গড়িয়ে দশে পড়েছে। বছর দু'য়েক আগেও দাম্পত্য জীবনের এই দিনটির কাহিনী নিয়ে হো হো করে রসিকতা করতো মিহির। বলতো, সাত বছর যে প্রেম করলাম সেটা বেমালুম উবে যাবে? চন্দ্রা যুক্তি দিয়ে বোঝাতো, প্রেমের তো আর কোনো লেখাজোখা তারিখ থাকে না। না থাক লেখা জোখা তারিখ, চন্দ্রা যেদিন কানুনগো সাহেবের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল, সেটাই নাকি প্রেমের শুরু—মনে করে মিহির। একপাল আত্মীয় স্বজনের জঙ্গলে হঠাৎ লাজুক হয়ে ওঠা চন্দ্রার গলায় সাদা রজনীগন্ধার মালাটা টুক করে যেদিন পরিয়ে দিয়েছিলো, সেদিনের তারিখ মনে করতে এখনও সময় লাগে মিহিরের। কিন্তু কানুনগো সাহেবের কাছে বকুনি খাওয়ার তারিখটা তার জিভের আগায় সব সময় ভিড় করে থাকে—একুশে মে, মঙ্গলবার।

উফ! কি সাংঘাতিক! লাজুক মেয়েটার বুকের ভেতর যে এমন তেজের আগ্নেয়গিরি ছিলো স্বপ্নেও সেদিন ভাবেনি মিহির। বাবা মারা যাওয়ার পর টাইপিস্টের কাজে নতুন যোগ দেওয়া মেয়েটার বসার টেবিল ছিল ঠিক ওর সামনে। আর পাঁচ জোড়া কৌতূহলী চোখের মতো মিহিরও চোখ মেলে দিয়েছিলো নবাগতা চন্দ্রা চৌধুরীর চালচলনের উপর। ব্যস! তারপরই তুলকালাম। একুশে মে, মঙ্গলবার। মাত্র তিনদিনের কর্মচারী সারা অফিস দাপিয়ে মাথায় করে তুলেছিলো—বারুদ ফাটিয়ে ছিলো দুম করে কানুনগো সাহেবের ঘরে। মিহিরের চোখে মনে বিন্দু মাত্র প্ররোচনা ছিল না—ছিল না কোনো আবেদন কিংবা নিবেদন। আর ভাগ্যি ভালো সুপ্রিম কোর্টের নির্দ্দেশ তখনও দানা বাঁধেনি। তাছাড়া ভালো গোবেচারা ছেলে হিসাবে অপিসে একটা সুনামও ছিলো মিহিরের। তবুও হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল পুচকে ওই মেয়েটার কাছে।

আজ রীতাদি বলছিল তুমি নাকি ওকে জেনারেল সেকসানে ট্রান্সফার করার হুমকি দিয়েছ? ড্রেসিং টেবিল ছেড়ে চন্দ্রা উঠে এসেছে বিছানার কাছে। উবু হয়ে বসে বক্স খাটের ড্রয়ার খুলে একে একে বের করে আনছে বালিশ মশারি।

না ব্যাপারটা ঠিক সে রকম নয়—বিছানা ছেড়ে নেমে অ্যাসট্রেতে সিগারেটের টুকরোটা চেপে ধরে মিহির, আসলে জেনারেল সেকসানে একজন সিনিয়ার ক্লার্কের দরকার। তাছাড়া রীতা নন্দী একজন এফিসিয়েন্ট ওয়ার্কার।

এফিসিয়েন্সির নামে তোমাদের জারিজুরি সব আমার জানা আছে, ঝনঝন করে বিছানার উপর পাতা বেডশীটটা তুলতে তুলতে বলে চন্দ্রা।

আচ্ছা চন্দ্রা, তুমি, মানে তোমরা কি চাও না অফিসের উন্নতি হোক...।

থামো! তোমার গালভরা সব বুকনি। দু'দিন আগে তুমিও তো ওদের মতো হলঘরের কোণে বসে ফাইল আগলাতে, বদলে ফেলা বেডশীটটা ভাঁজ করতে করতে ধমকে ওঠে চন্দ্রা।

কথাটা অবশ্য মন্দ বলেনি। এই অফিসে মিহিরের প্রবেশ ইউ ডি ক্লার্কের ভূমিকায়। বছর পাঁচেক আগে মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করে আজ অফিসের মালিক হয়ে বসতে পেরেছে। অফিসার হিসাবে কানুনগো সাহেবের চেয়েও নাকি মিহিরের দাপট অনেক অনেক বেশি। তাছাড়া ওর আমলে সারা অফিসের হাল হকিকত বদলে গেছে। কলকাতায় যে অফিসের সবচেয়ে বেশি বদনাম ছিল সেই অফিস গতবছর জাতীয় স্তরে প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু সবটাই তো সম্ভব হয়েছে অলক্ষে চন্দ্রার ভালোবাসার প্রশ্রয় আর নীরব উৎসাহে।

তাই চন্দ্রার কাছে এমন চাঁচাছোলা বুলি আশা করেনি মিহির। যতই ইউনিয়নের পাণ্ডা হোক না কেন, সেকশন ম্যানেজারের স্ত্রী তো বটে! চন্দ্রার এই চাঁচাছোলা চরিত্র সেদিনের সেই একুশে মে, মঙ্গলবারই উপলব্ধি করতে পেরেছিল মিহির। কানুনগো সাহেবের ধমক খেয়ে পরদিন থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলো অফিসে আসা। লজ্জায় অপমানে কয়েকদিন পরে রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছিল ইস্তফার অগ্রিম নোটিশ। অন্য সহকর্মীদের পই পই বারণেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেয়নি মনকে। অন্য একটা চাকরীও পেয়ে গেছিল কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে, ধানবাদ খনি এলাকায়। কিন্তু বাদ সেধেছিল চন্দ্রা নিজেই। অফিস ফেরৎ সন্ধের সময় দুমদাম এসে সোজা ঢুকে গেছিল ঠাকুরঘরে। মিহিরের বিধবা মায়ের কোলের কাছে, ছেলেকে একটু শাসন করতে পারেন না? অফিসের বস কি না বলেছে তাই চাকরি ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে ঘরের কোণে?

তুলসির মালা আর নামজপ ভুলে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে বাঁশি হাতে বসে থাকা গোপালের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া সেদিন কোনো ভাষা জোটেনি বাল্যবিধবা মিহিরের মায়ের মুখে। পাশের ঘর থেকে সব শুনেছিল, সব দেখেছিল মিহির। অনর্গল খই ফোঁটানো চন্দ্রার শাসানী কানের লতি গরম করে দিয়েছিল সেদিন, জমিদারী থাকলে আমার কিছু বলার নেই। ছেলেকে ঘরে বসিয়ে বোতলে করে দুধ খাওয়ান। আর তা না থাকলে শাসন করুন, অফিসে যেতে বলুন। শেষের শব্দগুলো এখনও মিহিরের কানে ইলশে গুঁড়ির মতো ঝিরঝির করে বাজে, কারণ চন্দ্রার গলায় তখন ছিল দলা পাকানো অম্বলের মতো কান্না

মেশানো তেজ। যা একমাত্র চন্দ্রাকেই মানায়।

কিরে খোকা, মেয়েটা কি বলছে? তুলসীর মালা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল মা। ততক্ষণে চন্দ্রা এসে টানটান থমকে পড়েছিল মিহিরের সামনে। লম্বা শরীরটা ঢেকে দিয়ে টানটান করেছিলো তর্জনী, অসভ্যের মতো মেয়েদের দেখলে উপরওয়ালার বকুনি একশো বার খেতে হবে। কিন্তু কাল অফিসে না গেলে সারা পাড়ায় পোস্টার লটকে দেব যে তুমি আমায় বিয়ে করতে চেয়েও কথা রাখনি। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেনি চন্দ্রা। চৌকাঠ পার হয়ে সোজা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা রিকসার বুকে নিজেকে সঁপে বিলীন হয়ে গেছিল অন্ধকারের দেশে। হিন্দী সিনেমাকেও হার মানিয়ে।

ফ্যাসাদ বড়ো জ্বালা। হাজার চেষ্টা করেও মাকে বোঝাতে পারেনি মিহির। আর শেষপর্যন্ত অফিসে ফিরে আসতে হয়েছিল কাজে। সবাই সেলিব্রেট করেছিল ওর ফিরে আসা। এমন কি চন্দ্রাও। সময়ের ঢেউ ঠেলে অনেক ক'টা দিন পার হয়েছে ওঁদের জীবনে। মিহির ছুটেছে ক্যারিয়ারের পেছন পেছন আর চন্দ্রাকে ছুটিয়েছে ইউনিয়ন। অফিসার হবার পর কর্মক্ষেত্রে যাতে দু'জনের সংঘাত ক্রমাগত দানা বেঁধে না ওঠে তার জন্য রানাঘাটে বদলীর চেষ্টা করেছিল মিহির—কিন্তু ম্যানেজমেন্ট মেনে নেয়নি।

ছি চন্দ্রা, তোমার মুখে একথা সাজে না, দৃপ্ত হয়ে ওঠে মিহিরের গলার স্বর!

বিছানায় নতুন চাদর বিছানো ছেড়ে থমকে দাঁড়ায় চন্দ্রা, কোন কথা?

অফিসার হবার খোঁটা, আয়নার সামনে গিয়ে চিরুনি তুলতে তুলতে বলে মিহির, তোমারই তো শখ ছিল কানুনগো সাহেবের চেয়ারে আমাকে দেখার। বিপিনবাবু ঠিকই বলছিল আজ....

কি বলছিল বিপিনবাবু? ধনুকের ছিলার মতো ভ্রু বাঁকায় চন্দ্রা, একটা আস্ত দালাল....

ভুলে যেও না বিপিনবাবু তোমার বাবার সহপাঠী ছিলেন।

ব্যস, অমনি মাথা কিনেছেন আর কি? অসভ্য বেয়াদপ, দপ করে জ্বলে ওঠে চন্দ্রা, মেয়েদের গায়ে মা মা বলে হাত বোলান কি পিতৃস্নেহে....আমরা কী কিছুই বুঝি না?

সুন্দরী মেয়েদের গায়ে হাত বোলাতে কোন পুরুষের না ইচ্ছে করে বলো? পরিস্থিতি এবং পরিবেশে হাল্কা প্রলেপ দিতে চায় মিহির।

এসব ছেলেভুলানো কথা ছেড়ে আসল কথায় এসো, বিছানার উপর পাট পাট চাদর ছড়াতে ছড়াতে বলে চন্দ্রা, কি বলছিলো বুড়ো ভামটা?

খারাপ কিছু বলেনি বিপিনবাবু। চেম্বারে বসে মিহিরও নিজের কানে শুনেছে আজ চন্দ্রার শ্লেষ ছড়ানো কথাগুলো। টিফিনের অবসরে মহিলা সহকর্মীদের উদ্দেশে

চন্দ্রার বাণী ছিল, সুপ্রিমকোর্ট কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি হেনস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েরা কোনো বৈষম্যের শিকার না হয় সেজন্য সুস্থ কাজের পরিবেশ তৈরি করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা কোনও মতেই যেন পুরুষ কর্তৃপক্ষকে হেনস্থা করার সুযোগ করে না দিই। বন্ধুগণ ঠাট্টা ইয়ার্কির মাধ্যমে আমাদের উপরওয়ালারা যেন কোনও মতেই কোন বৈষম্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। আপনারা জানেন মিহির বোস আমার স্বামী, তা সত্ত্বেও কর্মচারী বন্ধু এবং বান্ধবীদের সামগ্রিক কল্যাণে ন্যায় এবং স্বার্থরক্ষার লড়াইয়ে তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করতে আমি বিন্দুমাত্র পিছপা হইনি এবং ভবিষ্যতেও হবো না—

তারপরে আরও কি সব যেন বলতে চেয়েছিল চন্দ্রা কিন্তু শোনা যায়নি—চট পটা পট হাততালির দৌলতে। হাততালি শেষ হবার পর যেটুকু শুনেছিল তা হল—প্রয়োজনে ঘরে এবং সংসারেও আমি প্রতিবাদের বন্যা বইয়ে দেবো যদি আপনাদের সার্বিক সমর্থন আমার সঙ্গে থাকে....

কি হল ভিজে বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে গেলে যে? সত্যিকথা বললে অমনই হয়। পাশাপাশি দু'টো বালিশ রাখতে রাখতে বলে চন্দ্রা।

বিপিনবাবু খারাপ কিছু বলেনি, উলের পাপোষে পা মুছে বিছানায় উঠে পড়ে মিহির।

ভালটাই বা কি বলল শুনি, মশারীটা খাটের বাইরে ঝেড়ে নেয় চন্দ্রা।

বলছিল, আজ দুপুরে তোমার বক্তৃতার কথা।

খুব আঁতে লেগেছে বুঝি?

দেখ চন্দ্রা, আমাদের ভেতর একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত। বিছানায় চিৎ হয়ে নিজেকে এলিয়ে দেয় মিহির।

কিসের বোঝাপড়া? খাটের কোণে মশারির দড়ি ঝুলিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করে চন্দ্রা!

যেমন ধরো আমরা প্রফেসনালি দু'জনে দুই মেরুর উপর দাঁড়িয়ে—আমি ম্যানেজমেন্ট সাইডে, তুমি কর্মচারীর পক্ষে। আবার অ্যাকসিডেন্টালী ব্যক্তি জীবনে আমরা স্বামী-স্ত্রী। সুতরাং আমাদের মধ্যে একটি ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা একান্ত প্রয়োজন—নিজের বক্তব্য বেশ জোরালো ভাবে বলতে পারায় তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে মিহির।

কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং চাইছ? মশারি গোঁজা ফেলে বেঁকে বসে চন্দ্রা।

দেখ নারী পুরুষ আকৃতিগত পার্থক্যে গড়া দু'টো জীব হলেও মূলত তারা মানুষ। সমাজে, সংসারে কিংবা অফিসে উভয়েরই সমান সমান অবদান আছে।

আছে আলাদা এবং স্বাতন্ত্র ভূমিকা, বলতে বলতে উঠে বসে মিহির, স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই যে যার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে পারবে।

তাই বলে তোমরা পুরুষেরা দিনের পর দিন মেয়েদের হেনস্থা করবে, মুখ বুজে সহ্য করে যাবে মেয়েরা?

সেকথা আমি বলিনি। বোঝাতে চেষ্টা করে মিহির, বিপিনবাবু আমাদের পিতৃস্থানীয়। অপত্য স্নেহে যে যদি কারও মাথায় হাত রাখে—

আগাছা প্রথম দিনেই বিনাশ করতে হয় বুঝলে, ফোঁস করে ওঠে চন্দা, নইলে জঙ্গল হয়ে যায়। আজ মাথায় হাত রাখছেন, কাল বুকে হাত দেবেন, পরশু....

আহ চন্দ্রা, অহংকার তোমাকে সীমানার অনেক বাইরে নিয়ে চলেছে। নিজের ওজন বুঝে চলার চেষ্টা করো—শান্তি পাবে, বোঝায় মিহির।

উচিত কথা তো অহংকারের মতোই শোনাবে। বেডসুইচ অফ করে দেয় চন্দ্রা। গাঢ় অন্ধকারে হঠাৎ ডুবে যায় সারা ঘরটা। মিহির বুঝতে পারে চন্দ্রা বালিশে মাথা রেখে বিছানায় গড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। কথা না বাড়িয়ে নিজেও টুক করে শুয়ে পড়ে চন্দ্রার পাশে রাখা বালিশে। এতক্ষণে ঘরের অন্ধকার একটু ফিকে করতে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে এসেছে রাস্তার একচিলতে আলো।

তুমি কি চাও আমি ইউনিয়ন করা ছেড়ে দিই? ভীষণ গম্ভীর শোনায় চন্দ্রার গলা।

মোটেও না। সংক্ষিপ্ত জবাব মিহিরের।

তুমি চাইলেও আমি ছাড়তে পারব না, কারণ প্রতিবাদ আমার রক্তে মিশে গেছে। আপাতত যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে—আন্দোলন চলবে বিপিনবাবুদের মতো বুড়ো শয়তানদের বিরুদ্ধে। শক্ত টানটান গলায় ঘোষণা করে চন্দ্রা। কোনও জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে শোয় মিহির—অন্ধকারে নিজেকে ঢেকে।

কি হল? সাড়া শব্দ দিচ্ছো না যে? মিহিরের পিঠে ঠেলা দেয় চন্দ্রা।

প্রকৃত কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমার কোনও আপত্তি নেই—কিন্তু কোন ইলুইশনের পেছনে দৌড়ে কেউ যদি অফিসের ওয়ার্ক কালচার আর ডিসিপ্লিন নষ্ট করে—

ইউনিয়ন এ্যাকটিভিটি তোমার মতে ডিসিপ্লিন নষ্ট করা? আবার ফোঁস করে ওঠে চন্দ্রা।

আমি সেকথা বলিনি, বরফ গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় মিহির। অফিসের ইস্যু অফিসেই সেটেল করা ভালো, সংসারে এক বিছানায় শুয়ে নয়।

বেশ তাই হবে।

আমি বরং এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে নিই, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে মিহির, তাতে অন্তত তোমার আমার মধ্যে সাংসারিক শান্তি বজায় থাকবে।

এ্যাই! বাজে কথা বলবে না, আমি কোনও অশান্তি করিনি।

বিপিনবাবুও সেই কথাই বলেছিলো—অগ্নিকন্যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় —সংসার করা যায় না।

বিপিনবাবু আমাকে অগ্নিকন্যা বলেছে? মুখে ফুঁসে উঠলেও মনে মনে খুশি হয় চন্দ্রা। আর কোনও কথা না বাড়িয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। ঘুম আসতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়ে মৌমিতার কথা। মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। মানসিক দুর্বলতাই যে মন খারাপের কারণ। হঠাৎ চন্দ্রা বুঝতে পারে তার ভেতরে একটা মা আছে—যে মা সন্তানের জন্য কাঁদে। বুঝতে পারে তার ভেতরে একটা মেয়ে আছে, যে মেয়ে স্বামীর কোলে ভালোবাসার তাপ পেয়ে পেয়ে পুড়ে যেতে চায়। ঘুম না আসা চোখ কড় কড় করে ওঠে চন্দ্রার—আর মিহির পরম শান্তিতে পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে চলে খোঁতর ঘোঁতর—

এ্যাই! ঘুমিয়ে পড়লে? মিহিরের গায়ে টোকা দিয়ে নিবিড় হতে চায় চন্দ্রা, কি গো? ঘুমুলে?

ইউনিয়ন আর ম্যানেজমেন্টের কচকচানি আমার একটুও ভালো লাগছে না—আমার ঘুম পাচ্ছে—জড়ানো গলায় জবাব দেয় মিহির।

বাড়িতে এসব আলোচনা না করাই ভালো। কি বলো? চন্দ্রা তার ডান হাতটা তুলে দেয় মিহিরের শরীরে। রাগ হয়েছে? আমার দিকে ফিরবে না?

এই মুহূর্তে কি করা উচিত বুঝতে পারে না মিহির। চন্দ্রা যে দিন দিন অনেক, অনেক দূরে সরে গেছে। এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রার দিকে ফিরে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলে যদি কোনও অন্যায় হয়? হেনস্থা করা হয় অধস্তন কোন কর্মীকে? কারণ চন্দ্রা তো কেবলমাত্র তার স্ত্রী নয়, অফিসের একজন মহিলা টাইপিস্টও বটে। পাশ ফিরে কাত হয়ে শুয়ে থাকা চন্দ্রাকে এক ঝলক দেখতে চেষ্টা করে মিহির—কিন্তু পারে না। ঘুলঘুলি দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আলোয় সে জোর নেই। যে জোরে অন্ধকার ঠেলে আপাত বিবাদমান দু'টো মনকে একাকার করে দিতে পারে।

বিশ্বাস অবিশ্বাস

না, মোবাইল ফোনটাও বন্ধ!

রিমোট কন্ট্রোলের লাল নবে বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে টিভির সবাক পর্দা সরিয়ে বেবাক কালো করে দেয় সঞ্জয়। মুখ ভর্তি লাল কালো চেঙিস দাড়ি বাঁ হাতের তালুর চাপে চুমড়ে নিয়ে আবার রি-ডায়াল করে। কিন্তু কানের প্রান্তে চেপে ধরতেই ভেসে আসে কুক্ কুক্ শব্দের ব্যঙ্গ—তারপরেই ছড়িয়ে পড়ে রেকর্ড করা বাণী—

কিন্তু কেন? মোবাইল বন্ধ থাকবে কেন? বসের ঘরে ডিকটেশন নেওয়ার সময় তো ফোন বন্ধ থাকে। আর এখন এই রাত সাড়ে ন'টার সময় কোন অফিসের কোন বস মোবাইল ফোন বন্ধ করিয়ে ডিকটেশন দেয়, না দেওয়া উচিৎ?—ভেবে পায় না সঞ্জয়।

তবে কি—?

না, নিজের বউয়ের সম্পর্কে কিছু ভাবার আগে যাচাই করা উচিৎ। সঙ্গে প্রমাণ যোগাড় যত্নর না করে কেবলমাত্র ভাবনা সম্বল করে কোনও ফয়সালা করা উচিত নয়। ট্রাফিক জ্যাম, ট্রেনের গোলমাল, শারিরিক অসুস্থতা, পথঘাটের ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে হয়তো ফিরতে দেরী হচ্ছে—তাই খামোখা সন্দেহ না করে বরং এখন এই মুহূর্তে স্ত্রীর সন্ধান নেওয়াই প্রকৃত স্বামীর যথার্থ কাজ।

সিকোয়েন্সগুলো পরপর ভেবে একটা ক্লু বের করার চেষ্টা করলে কেমন হয়? মনে মনে ছক কষে সঞ্জয়।

প্রথমে ভাবা যাক অফিসের কথা। মাল্টিনেশন্যালের মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের পনর তলায় সুমনার অফিস। দশটা থেকে পাঁচটা। ব্যাগ গুছিয়ে শেষবারের মতো টয়লেট ঘুরে (বাইরে বেরুনোর আগে মেয়েদের স্বাভাবিক অভ্যাস—সঞ্জয় জানে। কারণ তার অফিসেও মহিলা কর্মীরা আছেন) লিফটের লাইনে দাঁড়তে দাঁড়াতে পাঁচটা দশ। বসের পিএ, তাই বেলাইনে লিফটের পেটে ঢুকে হড়াৎ করে হড়কে নিচে নামতে আরও পাঁচ মিনিট অর্থাৎ পাঁচটা পনর। অর্চিতার সঙ্গে গুল মেশানো অফিসের গপ্পো গুজব ঢালতে ঢালতে ট্রাম লাইনে পৌঁছাতে আরও দশ বারো মিনিট অর্থাৎ পাঁচটা সাতাশ। ট্রামের অপেক্ষায় পনের মিনিট—পাঁচটা বিয়াল্লিশ।

ভাবনার দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রবেশের আগে একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। প্রথম দু'টান ধোঁয়া বাতাসে বিরক্তির নিক্তিতে ছড়িয়ে তৃতীয় টানের ধোঁয়ায় গোল গোল

রিং ছুড়তে শুরু করে। রিং ছুঁড়তে ছুঁড়তে আবার রি ডায়াল-এ শুনে নেয় নিশ্চিত বাণী—সুইচ্‌ড অফ। সুতরাং বেশ আয়েস করেই অবতারণা শুরু করে দ্বিতীয় দৃশ্যের ভাবনা।

বউবাজারের কাছ ট্রাম ডি-রেল। সুতরাং পায়ে হেঁটে পথ চলার উদ্বোধন শুরু হয় ঠিক ছ'টায়। বউবাজার থেকে শিয়ালদা—কুড়ি মিনিটের পথ। অর্চিতার সঙ্গে গল্পের দৌলতে আরও দশ মিনিটের গ্রেস দিয়ে সময় মিলিয়ে নেয় সঞ্জয়—সাড়ে ছ'টা। কম্পার্টমেন্ট-এ ঠেলে ঠুলে ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ ছ'টা চল্লিশের ট্রেন। বেলঘরিয়া স্টেশনে সাতটা পাঁচ। দমদমে ঢোকার মুখে সিগন্যালে হোঁচট খেলেও সাড়ে সাতটার বেশি হওয়া কখনও উচিৎ নয়। অর্চিতাহীন নিঃসঙ্গ পায়ে প্লাটফর্ম থেকে বাড়ি দশ মিনিট—অর্থাৎ সাতটা চল্লিশ....

সাতটা চল্লিশ থেকে সাড়ে নটা। না কোনও ক্লু মাথার ভিতর পাক খায় না সঞ্জয়ের। পাক খায় কয়েকটা চিন্তার চাকতি।

সুমনার বস লোকটা কেমন?

খুব খারাপ না হলেও তুলসীর ধোয়া পাতা নয়। সুমনা অবশ্য কোনওদিন বসের নিন্দে করেনি সঞ্জয়ের সঙ্গে। বরং বসের প্রসঙ্গ উঠলেই উচ্ছ্বসিত হয়েছে। প্রশংসার মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছে সেই প্রসঙ্গের অদৃশ্য পটে। তবে হ্যাঁ, কাজ পাগল লোকটা খাটতে এবং খাটাতে ভালোবাসে। সুমনা নিজেই সে কথা স্বীকার করেছে বহুবার—কুঁড়ে, কর্মবিমুখ কর্মচারীদের ভারি অপছন্দ করে বস। তা করুক গে! প্রাইভেট ফার্মে অমন লোক দেখানো আদিখ্যেতা থাকেই—। অফিসে এমন ডাহা ফাঁকিবাজ ফন্দি ফিকিকের সুলুক সন্ধান জানা যে দু'চারজন কর্মচারী আছে তারা ধরে রেখেছে সুমনাকে। কেউ দিদি ডেকে ভাইফোঁটায় গিফ্‌ট পাঠায়, কেউ বোন বলে 'রাখি'-র দিন চুড়িদারের পিস দেয় কেউবা আবার দেওর হয়ে বৌদির ফাই ফরমাস খেটে টিফিনটা, এটা ওটা এনে দিয়ে কৃতার্থ হয়। দাদা, ভাই কিংবা দেওরদের সে খবর সঞ্জয় জানে। এমনকি চেহারাতেও চেনে। সুতরাং সন্দেহকারি ব্যক্তিদের তালিকা থেকে তাদের বাদ দেওয়া যেতে পারে—কারণ তারা কোনওমতেই ক্লু হওয়ার মতো ক্ষমতাবান নয়।

শেষটান দিয়ে সিগারেটের ফিল্টার অ্যাশ ট্রের গর্ভে চেপে দেয় সঞ্জয়। সুমনাদের অফিসে তো ওভারটাইমের বালাই নেই। যা কিছু কাজকর্ম টাইমেই শেষ হয় অথবা করতে হয়। বস অবশ্য অফিসে থাকে সাড়ে আটটা ন'টা অবধি। কিন্তু কাউকে বিরক্ত করে না—নিজস্ব পিয়নকে ছাড়া।

বসের সঙ্গে সুমনার সম্পর্ক কেমন?

ভালো! ভীষণ ভালো। সুমনা তো 'বস' বলতে অজ্ঞান। দিনে অন্তত একবার 'বস'-কে উদাহরণ করতে ভোলে না। বসের ব্যবহার, বসের স্মার্টনেস, বসের

কাজের ঢং, বসের ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা, বসের ব্যক্তিত্ব, বসের চালচলন, বসের লিডারশিপ্, বসের পোষাক, বসের ছিমছাম ছিপছিপে শরীর, বসের উদ্যম, বসের উৎসাহ, বসের পাইপ টানার সৌন্দর্য, বসের কাঁচাপাকা চুলের সঙ্গে গোঁফের মানান এমনি সব হাজার ফিরিস্তি সঞ্জয়ের দাম্পত্য জীবনের খাঁজে গুঁজে দিতে কসুর করে না সুমনা।

বসের সঙ্গে তবে কি সুমনার কোনও রস টই-টম্বুর রসালো সম্পর্ক আছে? ভাবতেও মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম করে সঞ্জয়ের। নিস্‌পিস্ করে রাগ। সঞ্জয়ও তো কমতি নেই। অফিসের পুরোপুরি মালিক না হলেও তার অধীনে আঠারো জন স্কীলড্ লেবার কাজ করে। চল্লিশ না ছোঁয়া বয়সেও একটা চুল সাদা হয়নি। বিজ্ঞাপনের পুরুষের মতো স্বাস্থ্য। নিজের ফ্ল্যাট। দায় দায়িত্বহীন সংসারের একমাত্র মাথা। বাদশাহী নবাবদের মতো চেঙ্গিস দাড়িতে লাল মেহেন্দির ঔজ্জ্বল্য—রাস্তায় হাটলে দশটা মেয়ে তারিয়ে তারিয়ে দেখে, হয়তো তারিফও করে মনে মনে। তবুও—

আর একটা সিগারেট ধরায় সঞ্জয়। ধোঁয়া উড়িয়ে রি-ডায়াল করে আর একবার। না, একই ফিরিস্তি—মোবাইল ফোন বন্ধ হ্যায়—আচ্ছা অর্চিতাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? অফিস এবং অফিসের বাইরের জগতে অর্চিতাই তো সুমনার একমাত্র বন্ধু। সে নিশ্চয়ই কোনও ক্লু দিতে পারবে। অর্চিতা তো ও এ। মানে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (বেসরকারি ঝা চকচকে অফিসগুলোয় এই এক কেতা। গালভরা পদনাম—মাঠা বাংলায় কেরাণী নয়, আমেরিকান সাহেবিয়ানার ইংরাজী দস্তুর—অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)। বসের সঙ্গে সরাসরি কাজ খুবই কম। সুতরাং সুমনা যদি অফিসে থাকেও, অর্চিতা এখন বাড়িতে। ছেলেমেয়ে স্বামীর কাছে—এখন যা রাতের সময়, হয়তো বা খাবার টেবিলে।

কিন্তু অর্চিতার কাছে যদি সুমনার খবর না থাকে? তাহলে ফোন করাটা ভারি কেলেংকারীর হবে। অয়ন মানে অর্চিতার স্বামী জেনে যাবে সুমনা রাত করে বাড়ি ফেরে। শুধু কি জেনে যাওয়া—ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো জমিয়ে স্ক্যান্ডাল করবে। সে স্ক্যান্ডালে ইন্ধন জোগাবে অর্চিতা নিজেই। কারণ বসের কাছের কর্মীকে কেই বা ভাল চোখে দেখে। তাছাড়া মেয়েরা কখনও মেয়েদের প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না—হিংসেয় মন জ্বলে যে!

ফিল্টার কিং-য়ের অর্ধেক পুড়ে যায় আঙুলের ফাঁকে। সুমনাকে ঘিরে ভাবনার টানের পাল্লা ভারি হওয়াতে সিগারেটে টানটান সব সুখটান দিতে ভুলে যায় সঞ্জয়। ধুস, এতোক্ষণে একবারও তো আসল জায়গায় ফোন করলে হতো। সুমনার অফিসে—বসের চেম্বারে। অ্যাশ ট্রের উপর আঙুলের সিগারেট নামিয়ে মুখস্থ নম্বর ডায়াল করে সঞ্জয়—কান পেতে শোনে ও প্রান্তের কলার টিউন এবং সবশেষে রেকর্ড করা ম্যাসেজ—সরি, দ্যা পারসেন ইজ নট অ্যাভেলএবল। হবে কি করে?

আবার আঙুলের চিমটায় সিগারেট তুলে ঠোঁটে ছুঁইয়ে নেয় সঞ্জয়। ফার্স্ট পারসেন মানে বস, সেকেন্ড পারসেন সুমনা আর থার্ড পারসেন অফিসের বেয়ারা সব এতো রাতে 'ধা' পারসেন হয়ে উধাও হয়েছে।

আচ্ছা! বসের মোবাইল নম্বরটা তো একবার বলেছিলো সুমনা। হঠাৎ মনে পড়ে সঞ্জয়ের। সিগারেটের ধোঁয়ার এই একটা মহৎ গুণ—মনে করিয়ে দেওয়ার গুণ। কোথায় যেন লিখেও রেখেছিলো নম্বরটা—টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে না মোবাইলের ফোন বুকে। প্রথমে ফোন বুক সার্চ করে সঞ্জয়—কি যেন নাম সুমনার বসের? তন্ময়, তমাল, তরফদার বাবু, টিকাদার, ত্রিদিব, ত্রিনাথ, তৃণাঞ্জন, তিরিকে, তিমির—না কোনওটাইতো মিলছে না। তবে নিশ্চয়ই ডাইরীতে লেখা আছে। কিন্তু সঠিক নামটা মনে না পড়লে খুঁজবে কোন আন্দাজে?

উতলা হয় সঞ্জয়।

এতোদিনের বিবাহিত জীবনে আজকের মতো দেরি কোনওদিন করে না সুমনা। করলেও খবর দেয় সঞ্জয়কে—মোবাইল কিংবা ল্যান্ড ফোনে। স্ত্রীর দেরিতে ফেরা নিয়ে স্বামী সঞ্জয় দু'একবার অশান্তিও করেছে। চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। কার্শিয়াং থেকে বাবাইকে এনে লোকাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু না, সুমনা বিচলিত হয়নি কিছুতেই। রাগ করেনি একটুও বরং বোঝানোর চেষ্টা করেছে সঞ্জয়কে—এতোগুলো মাইনের টাকা খামোখা কেন হাতছাড়া করবে। আমি তো আর কচি খুকু নই যে তোমার কাছছাড়া হবো। সন্দেহ বাতিক ছেড়ে মনকে স্বচ্ছ করো। স্বচ্ছন্দে থাকতে শেখো। তাছাড়া বসের মতো অমন ভালো স্বভাব আর বড়ো মনের মানুষ থাকতে....।

ডিং-ডং!

ভাবনার কাঁচ ঝন্ ঝন্ ভেঙে যায় ডোরবেলের শব্দে।

একলাফে সোফা ছাড়ে সঞ্জয়। বেডরুম ছেড়ে কমন প্যাসেজ টপকে হাত দেয় দরজার হ্যান্ডেলে।

সরি সঞ্জয়দা! এতো রাতে একটু বিরক্ত করতে এলাম, দরজার কপাট খুলে সপাট অবাক হয় সঞ্জয়। সুমনার আগমন প্রত্যাশা লোপাট করে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে অবেলা। সেভেন ই বাই সিক্স-র অবেলা। রামরতনবাবুর বড় মেয়ে অবেলা। মাঝে মধ্যে সুমনার কাছে আসে বই সিডি এটা ওটা চাইতে।

না, না আসুন! ভিতরে আসুন, ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রতার সৌজন্যে আহ্বান করতে হয় অবেলাকে।

আপনাদের বুঝি ডিনার হয়ে গেছে, দরজার কপাট টপকে ভিতরে পা রাখে অবেলা।

না, মানে আপনার বৌদি এখনও এসে পৌঁছাননি।

ওমা! সে কি! রাত যে দশটা বাজতে চললো—ওভারটাইম আছে বুঝি? অযাচিত অবেলা কমন স্পেসের সোফায় বসতে বসতে অবাক হয়।

না ওভারটাইম ঠিক নয়। আসলে অফিসে একটা পার্টি আছে। মাল্টিনেশন্যাল কোম্পানি—ইয়ার এনডিং-এ, ইনিয়ে বিনিয়ে সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে সঞ্জয়।

নভেম্বর মাসে ইয়ার এনডিং? কি যে বলেন সঞ্জয়দা? তাছাড়া এইসব রাতের পার্টি খুব খারাপ। ওই পার্টির জন্যেই তো আমি বাপের বাড়ি পড়ে থাকি। বেহেড, বুঝলেন একেবারে বেহেড হয়ে ফিরতো আমার হাজব্যান্ড। রাতদুপুরে তাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিতো আর এক বেহেড বেহায়া নিলর্জ ক্যারেকটারলেস ডিবচ ছুঁচো ডাইনি মেয়েটা আমার স্বামীর পি.এ.—এক নিঃশ্বাসে অলংকার বিশেষণ এবং শিরোনামসহ সংবাদের পুরো স্টোরিটা উগরে দেয় অবেলা।

কে? সুমনার কাছে অবেলার এসব কাহিনী বহুবার শুনেছে সঞ্জয়। তবুও এই মুহূর্তে সব তালগোল পাকিয়ে ভুলে গুলে একাকার করে ফেলে।

কে আবার! আমার হাজব্যাণ্ডের পি.এ.—মেয়ে তো নয়, ডাইনি—

এতদিন বাপের বাড়িতে থেকে সে ভদ্রলোককে তো এক্স-হাজবেন্ডে পরিণত করে দিয়েছেন—সুমনায় মন আচ্ছন্ন থাকলেও অবেলার সঙ্গে রসিকতা করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না সঞ্জয়।

তা বলতে পারেন। প্রেজেন্ট বা ফ্রেস যখন কেউ নেই, একটু প্রগলভ হওয়ার চেষ্টা করে অবেলা, তখন এক্স ওয়াই জেড যাই ভাবুন না কেন—হাজব্যান্ড।

আপনার কিন্তু গ্লামার থাকতে থাকতেই কিছু একটা করা উচিত। যদিও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ তবুও শীত পড়েনি একদানা। ওড়নাহীন চুড়িদার পরিহিতা অবেলার গলার নিচের সমতল ভূমি ছাড়িয়ে বুকের চড়াইতে নজর নিক্ষেপ করে সঞ্জয়। এতোক্ষণের সুমনাহীন চিন্তার ধোঁয়াসায় বসন্ত বাতাসের ঝটকা লাগে। চুরি করে টলটলে যৌবনা বধূর শরীর দেখতে কার না ভালো লাগে? বিশেষ করে নিঃসঙ্গ রাতে।

মানে? বুঝেও না বোঝার ভান করে অবেলা (আসলে রাতের নরম আমেজে হ্যান্ডসাম এক যুবকের মুখে, তার স্ত্রী অবর্তমানে খোলামেলা জেনে নিতে চায়)।

খুব সোজা। যা কাঁচা বয়েস, আপনার আবার বিয়ে করা উচিৎ, আকার ইঙ্গিত শিকেয় তুলে সরাসরি জানিয়ে দেয় সঞ্জয়।

সিওর! উচ্ছসিত হয় অবেলা—কিন্তু আপনার মতো পত্নীনিষ্ঠ পুরুষের সন্ধান পাচ্ছি কোথায়?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন (কিংবা মাঠে ঘাটে রাস্তায় ক্লাবে ফ্লাটে ফ্লাটে নেমে পড়ুন)। আপনার মতো মেয়ের কি আর ছেলের অভাব হবে? বিবাহিতা অথচ ঝাড়া ঝাপটা—ডালপালাহীন, বলতে বলতে আরও একটু বেশি খোলামেলা

হওয়ার চেষ্টা করে সঞ্জয়।

তা যা বলেছেন। ছ'বছর লোকটার সঙ্গে ঘর করেছি অথচ ছেলেপুলে হতে দিইনি। ছেলেপুলে থাকলে কী যে মুসকিল হতো—

ডিং ডং—

নিন মশাই! আর শবরীর প্রতীক্ষা করতে হবে না। বৌদি এসে গেছেন, ডোরবেলের শব্দ শুনেই উঠে দাঁড়ায় অবেলা।

দরজা খোলাই আছে, গম্ভীর উত্তর ছুঁড়ে নিজের সোফায় অনড় থাকে সঞ্জয়। এবং সত্যি সত্যিই অবেলার প্রেডিকশন মিলিয়ে ঘরের ভিতর পা রাখে সুমনা। আড়চোখে দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িতে সময় পড়ে নেয় সঞ্জয়—দশটা পঁচিশ।

আরে অবেলাদি! আপনি? এই অসময়ে? পায়ের স্লিপার খুলতে খুলতে প্রশ্ন ছোড়ে সুমনা। মনের ভিতর জট পাকায় হাজার জিজ্ঞাসার চিহ্ন—সঞ্জয়ের সঙ্গে তার অবর্তমানে ইয়ে টিয়ে কিছু করছে না তো?

আমার আবার বেলা অবেলা? বৃক্ষের তো ফলেই পরিচয়। আমার নামে। তাছাড়া তোমার কাছে আসতে বেলা অবেলা ভাবতে হবে কেন? সুমনার পাশাপাশি এগিয়ে দাঁড়ায় অবেলা।

ফ্রিজ থেকে মাছ তরকারি বের করেছিলে? অবেলাকে এড়িয়ে সঞ্জয়ের কানে প্রশ্ন ঢালে সুমনা।

না!

কেন পার্টিতে খাওয়া দাওয়া হয়নি? কি মেনু ছিলো? ইন্ডিয়ান, চাইনীজ না কন্টিনেন্টাল? ড্রিঙ্কস? যাই বলো বৌদি, আমার কিন্তু জিন উইথ লাইম কর্ডিয়াল ভীষণ ভাল লাগে, গায়ে পড়ে নিজের পছন্দ শুনিয়ে দেয় অবেলা। (ব্রেভো! মনে মনে ভাবে সঞ্জয়—একটু আগেই মদের নিন্দেয় মশগুলে ছিলেন। এখন বলছেন জিন ভাল লাগে। একটু পরে না শুনতে হয় চুল্লুর কাছে কোনও মাল-ই জমে না!)

হ্যাঁ, আপনি কি যেন বলছিলেন? বৌদির কাছে কি যেন দরকার—প্রসঙ্গের গিয়ার বদলানোর চেষ্টা করে সঞ্জয়। নইলে পার্টির রূপকথা ভূতের গল্প হয়ে দুপুর রাত পর্যন্ত ঘাড়ে চেপে বসবে।

তোমার কাছে ঋতু গুহ-র 'আপন ভিতর হতে' সিডিটা আছে? একটা রাতের জন্যে ধার দেবে বৌদি? অবেলার দরকারি কথা সুমনার কানের পাতে পড়তেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সঞ্জয়।

না, ওটা এসকে দিয়েছি। ও আবার ঋতু গুহ-র ভীষণ ভক্ত তো! সারাদিন পরে এখন এই মুহূর্তে অবেলাকে সহ্য করতে কষ্ট হয় সুমনার। কোনওমতে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে ফিরতে চায় নিজের সংসারে। সঞ্জয় যেরকম থ মেরে বসে আছে তাতে কালবৈশাখীর ঝড় উঠলো বলে। কিন্তু কি করবে সুমনা। উপায় ছিলো

না যে—মোবাইলে চার্জ ছিলো না। পি সি ও-তে যাওয়ার সময়ও না।

ঠিক আছে। ফেরৎ দিলে একবার দিও, নিজেকে গুছিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় অবেলা, তবে বৌদি! একটা কথা কিন্তু না বলে পারছি না—

কি?

তুমি না একেবারে গেঁয়ো গেরস্থই রয়ে গেলে।

কেন?

পার্টি থেকে এলে অথচ একটুও টলছো না। সত্যি সঞ্জয়দা! আপনি ভাগ্যবান। চলি কেমন—গুড নাইট! পাল্লা ঠেলে ফ্লাটের বাইরে চলে যায় অবেলা। চাবি ঘুরিয়ে দরজা লক করে ঘুরে দাঁড়ায় সুমনা।

ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছো অথচ ফ্রিজ থেকে ভাত তরকারিগুলো বের করতে পারোনি, সঞ্জয়কে সামান্য আড়াল করে নিজেকে শাড়িমুক্ত করতে ব্যস্ত হয় সুমনা।

না, পারিনি! কারণ ওটা আমার কাজ নয়, আর একটা সিগারেট ঠোঁটের উপর তুলে নেয় সঞ্জয়।

তোমার কাজ তো ঘরে বসে ফুক্ ফুক্ সিগারেট পোড়ানো—ব্লাউস আর সায়ার মাঝখানে রাতের নাইটি চাপা দিয়ে বাথরুম মুখো হয় সুমনা, এতো রাত হলো, বউটা কোথায় গেছে একবার খবরও তো নিতে পারতে? হাটতে হাটতে স্টেশনে যেতে পারতে। এতো রাতে একা একটা মেয়ে গলি ঘুপচি আঁধার ঠেলে—

মোবাইল ফোন বন্ধ ছিলো কেন? সুমনার বক্তব্যের ধারেও কথা মাড়ায় না সঞ্জয়।

ছাতার মোবাইল। হাজার দিন বলছি ব্যাটারী চেঞ্জ করা দরকার—কানে নিয়েছ একবারও? নিজে সময় পেলে তোমাকে তেল মারতাম না—

তাই বলে ঘরের বউ মোবাইল অফ করে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরবে? এখানে ওখানে ঘুর ঘুর করবে?

দ্যাখো! এমন সুন্দর একটা মুড অফ করে দিও না বলছি। নিজে তো জীবনে কোনও শখ আহ্লাদ পূরণ করালে না। ভাগ্যিস বস ছিলো—তাই কবেকার সাধ মিটলো। বাড়ি ঢুকে একটু খোসমেজাজে...

তা রাতটুকু বসের সঙ্গে কাটিয়ে এলেই তো পারতে। কষ্ট করে বাড়ি আসার হ্যাপা পোহাতে গেলে কেন? সুমনাকে মাঝপথে থামিয়ে সোফা ছাড়ে সঞ্জয়। যা সন্দেহ করেছিলো ঠিক তাই। বসের সঙ্গে কোনও রেস্টুরেন্ট কিংবা বার-এ (অবেলার ইঙ্গিত মনে পড়ে যায়। একটু দেখবে নাকি মুখ শুকে। গন্ধ-টন্ধ যদি পাওয়া যায়। অবশ্য এই মুহূর্তে সুমনার মুখের কাছে নাক নিয়ে যাওয়ার বিপদও কম হবে না)। সন্ধেবেলা ফুর্তির খোলস ছাড়িয়ে এখন বাড়িতে এসে মেজাজ নেওয়া হচ্ছে?

দরকার হলে কাটাবো বই কি! মাস কাটাবো, দিন কাটাবো, বছরের পর বছর

কাটাবো। আমি কি কারো খাই না পরি, যে তাবে তাবে থেকে ঘড়ির কাঁটা মেপে চলতে হবে? নিজেও তো এতোক্ষণ স্বামী খেঁদানো একটা মেয়েছেলের সঙ্গে বসে গুলতানি করছিলে, তার সপ্তকের একেবারে শীর্ষে পৌঁছে যায় সুমনা।

মেয়েছেলে শব্দটা ভারি কানে বাজে সঞ্জয়ের। মেয়েমানুষ তবুও চলে কিন্তু মেয়েছেলে চলে না। সেখানে কেমন যেন একটা বাজার বাজার গন্ধ থাকে।

দ্যাখো, মুখ সামলে কথা বলবে। আজে বাজে কথা একদম বলবে না—রুখে দাঁড়ায় সঞ্জয়। চেঙ্গিস দাড়িতে আধা ঢাকা মুখ ছাপিয়ে শক হুন দল পাঠান মোঘল একাকার হয়ে যায় চোখের কোণে।

কেন, মারবে নাকি? বাথরুম মুখো হওয়া ভুলে সঞ্জয়ের সামনে এসে রুখে দাঁড়ায় সুমনা।

বাজে কথা না বলে নিজের কাজ করগে যাও, সুমনার রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে হয়তো ঘাবড়ে যায় সঞ্জয়। না, বউ পেটানোয় সে বিশ্বাসী নয়। বউ পেটায় বস্তির লোকেরা। ওরা তো থাকে ফ্লাটে—বড়লোকদের সাজানো দামী সব বস্তিতে।

বাথরুম মুখো সঞ্জয়ের তর্জনী হেলনে কাজ হয়—সুমনা সুড়ুৎ করে ঢুকে যায় বাথরুমে। সাওয়ারের ঝরণা জলে শরীর মনের ক্লেদ ধুতে ধুতে মনে হয়—দোষ তারই। অফিস থেকে বেরুনোর আগে একটা খবর দেওয়া উচিৎ ছিলো সঞ্জয়কে। চার্জহীন মোবাইল তো বন্ধ হয়ে গেল সেই দুপুরবেলাতেই। অবশ্য এতো রাত হবে বুঝতে পারেনি সে। পারলে হয়তো হলের পি সি ও থেকেই—। কিন্তু কেন? কেন খবর দিতে যাবে। সঞ্জয়ও তো মাঝে মধ্যে রাত করে বাড়ি ফেরে। টিভির পর্দায় চোখ রেখে হাপিত্যেস বসে থাকে সুমনা। সঞ্জয়ও তো কতোদিন খবর না দিয়ে বন্ধুবান্ধবদের ঠেকে হুইস্কি চড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়ি ফেরে। জড়ানো গলায় শুধু বলে—সরি সুমনা। সে বেলায় দোষ নেই? যতো দোষ তার? বছরে একদিন নিরুপায় হয়ে দেরী করে বাড়ি ফেরার জন্যে কুরুক্ষেত্র? বউ বলে, মেয়ে বলে তার কি কোনও স্বাধীনতা নেই। বেশ করেছে—খবর দেয়নি! বেশ করেছে রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরে! সে তো কোনও বেলেল্লাপনা করেনি। ড্রিঙ্ক করেনি। চরিত্র খারাপ করেনি। তবে কিসের ভয়? অমন স্বামীগিরির প্রভুত্ব দেখানোর দিন অনেকদিন আগেই ঘুচে গেছে। এখন নারী স্বাধীনতার যুগ। মেয়েদের যুগ। মেয়েরা যা ভাববে, যা ভাল লাগবে তাই করবে। কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে যাবে না। কিন্তু অবেলা? বেহায়া অবেলাটা কেন এসেছিলো এতো রাতে? কখন এসেছিলো? অমন সোনার চাঁদ স্বামীকে ত্যাগ করে এসে এখন সঞ্জয়কে তাক করেনি তো? এসব মেয়েদের বিশ্বাস নেই—যেমন গায়ে গতরে, তেমনি পোষাক আসাকে! শুধু কি পোষাক আর গতর? কথাবার্তায়ও লাগাম নেই। অবেলাকে ঠিক পছন্দ হয় না সুমনার।

সুমনা বাথরুমে ঢুকতেই ফ্রিজ থেকে রাতের খাবার বের করে ডাইনিং টেবিলের

উপর রাখে সঞ্জয়। গ্যাস ওভেন জ্বালিয়ে ব্যস্ত হয় দুধ গরম করতে। মাথার ভিতর তখনও ঘুরপাক খায় সুমনার বস—রাত করে সুমনার বাড়ি ফেরা—অবেলার কথাকুশুলী—সুমনার ডোন্ট কেয়ার ভাব—নিজের উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। চাকরী করা বউয়েরা একটু বেশি স্বাধীনচেতা হয় ঠিকই—কিন্তু এতোটা? লাগামহীন স্বাধীনতা তো স্বাধীনতা নয়—স্বেচ্ছাচার। ঘরের বউ, ছেলের মায়ের স্বেচ্ছাচার মানায় না। তাছাড়া সঞ্জয় তো কখনও মাথার দিব্যি দেয়নি যে সুমনাকে চাকরী করতে হবে। ওর মাস মাইনের একটা নয়া পয়সাও সঞ্জয় ছুঁয়ে দেখে না। মাঝে মধ্যে সঞ্জয়ের কিংবা সংসারের দরকারে থোক টাকা সুমনা যে দেয়নি তা নয়—তবু এতো গর্ব, এতো অহংকার ভাল নয়—সাফ জানিয়ে দেবে আজ।

থাক! আর আদিখ্যেতা করে ক্যুক হতে হবে না, স্নিগ্ধ সুমনা সতেজ শরীরে সঞ্জয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়, একদিন একটু দেরী হয়েছে অমনি মহাভারত অশুদ্ধ করে তুলেছ।

কোনও উত্তর না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে চলে আসে সঞ্জয়। কোথায়? সুমনা এতোক্ষণ কোথায় ছিলো? না, কোনও ক্লু খুঁজে পায়নি এখনও। সরাসরি জেনে নেওয়ার মতো পরিবেশও নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো নিজেই নষ্ট করেছে। মাথা গরম করলেই সব গোলমাল হয়ে যায়—গোয়ান্দাদের ফেলিওর তো সেখানেই। সুমনা কি তবে বসের সঙ্গে সিনেমায় গেছিলো—আইনক্সে? কিংবা গঙ্গার পাড়ে হাতে হাত ধরে হাঁটছিলো—মিলেনিয়াম পার্কে? আবার একটা সিগারেট প্যাকেটমুক্ত করে সঞ্জয়। না, ধরতে পারে না। সুমনার ডাক ভেসে আসে ডাইনিং স্পেসের ওপার থেকে— খাবে এসো।

প্যাকেটের সিগারেট প্যাকেটেই ভরে রাখে সঞ্জয়। রাত এগারোটা দশ। এতো রাতে কে আবার ফোন করলো? মনিপিসির শরীরটা ভাল যাচ্ছে না শুনেছে—টেসে গেল না তো? বাবাইয়ের একটু জ্বর হয়েছিলো—হোস্টেল সুপার ফোন করেনি তো? না, দূরের ফোন নয়। কার্সিয়াংয়ের ফোনের রিং টোন তার চেনা। সকালে দীপ্তেন বলেছিলো ফোন করবে। কিন্তু দীপ্তেন তো ল্যান্ড ফোনে রিং করে না। কথাবার্তা যা কিছু মোবাইলেই সারে—বলে মোবাইলে নাকি খরচ কম। মোবাইল ট্যু মোবাইল।

আমার হাত আটকা! ফোনটা ধরো, ডাইনিং স্পেসে খাবার সাজাতে সাজাতেই নির্দ্দেশ দেয় সুমনা। আর পাঁচটা নির্দ্দেশের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক সে স্বরের সুর। একটু আগে ওঠা ঝড়ের রেশমাত্রও সেখানে নেই। সত্যিই মেয়েরা সব পারে—

হ্যালো! ওঃ! হ্যাঁ! বলুন। না না এখনই খেতে বসবো—ওঃ! তাই বুঝি? ভাল খুব ভাল! আপনাদের ডিনার হয়ে গেছে—এতো তাড়াতাড়ি? গুড! ভেরি গুড! যাবো, ঠিক যাবো! আসলে সময় পাই না! সুমনার সঙ্গে কথা বলবেন? ঠিক আছে বলে দেবো! আচ্ছা গুড নাইট—

কে ফোন করেছিলো? বস? ডাইনিং স্পেস আর বেডরুমের মাঝামাঝি প্যাসেজে সঞ্জয়ের মুখোমুখি দাঁড়ায় সুমনা।

না! (আবার বস? বসের রসে একেবারে টইটম্বুর হয়ে আছে দেখছি। শুয়োরের বাচ্চাটারই বা কি আক্কেল? একটা পরস্ত্রীর মনের উপর জাল বিস্তারের চেষ্টা!)

বসকে একটা থ্যাঙ্কস্ জানানো উচিত ছিলো। কিন্তু এতো রাতে...। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই যা তোলপাড় শুরু করলে, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে যায় সুমনা। নিজের কথা নিজের কানে বলার ভঙ্গীতে বিড়বিড় করে, বুধাদিত্য অনেকদিন পরে পাবলিক প্রোগ্রাম করলেন—তুখোড়! দারুণ! কান মন একেবারে সার্থক হয়ে গেছে, সঞ্জয়ের মুখোমুখি নিজের চেয়ারে বসতে বসতে উচ্ছ্বাসে উছলে ওঠে সুমনা।

না, কোনও উত্তর দেয় না সঞ্জয়। বুধাদিত্য, রবিশঙ্কর, বিলায়েত, আলি আকবর কোনও নামই ঢোকে না কানের সুড়ঙ্গে। ষড়অঙ্গে এখন যে রাগ জমে আছে সে রাগের নাম ইমন কল্যাণ, দরবারী কানাড়া নয়—প্রভুত্বের রাগ।

বুধাদিত্য-র বাজনা শুনে এলাম, আবার রিপিট করে সুমনা।

অন্যায়। ভারি অন্যায় করেছ! খাবার প্লেটে চোখ রেখে অভিযোগ অভিমান ঠেলে সরিয়ে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে সঞ্জয়।

কী?

সেতার সরোদের অর্চিতা কি বোঝে? তাকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বুধাদিত্য শুনে এলে? অর্চিতার ফোন পাওয়ার পরই সব ক্লু-র জট খুলে মনটাও খোলসা হওয়া শুরু হয়েছে। বস নয় সুমনার সঙ্গে ছিলো অর্চিতা।

বুঝেছি! এইমাত্র তাহলে অর্চিতাই ফোন করেছিলো?

হ্যাঁ। ওর মুখেই তো খবরটা পেলাম।

আসলে বস দু'টো গেস্ট কার্ড পেয়েছিলো। ক্লাসিক্যাল মিউজিকে আমার একটু ন্যাক আছে বস জানতো। নিজে তো রক ছাড়া কিছুই বোঝে না। রুচিও নেই। কার্ড দু'টো যখন দিলো, বিশ্বাস করো, বললেও তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারতে না। তাছাড়া অর্চিতাও ঝুলে পড়লো, বলতে বলতে প্রগলভ হয়ে ওঠে সুমনা—ঠিক যেন আঠারো বছরের কিশোরী।

তোমার আক্কেলটা কি শুনি? এতো সুন্দর একটা ক্ল্যাসিক্যাল প্রোগ্রাম শুনে এসে অমন অ্যান্টিসোসাল মেজাজে ঘরে ঢুকলে কিভাবে?

অবেলা! ওই অবেলাই আমার সব মেজাজ দিলো বিগড়ে, লজ্জিত সুমনা স্বীকার করতে ভুল করে না।

তুমি কি ভাবলে আমি ওর সঙ্গে রাসলীলা করছিলাম?

করতেও তো পারো! ছেলেদের বিশ্বাস নেই। তাছাড়া তোমার যা ছুঁকছুঁকানি স্বভাব, মাথা নিচু করে ডিনার সারায় ব্যস্ত হয় সুমনা।

চাঁদের উদয়

—কোথায় থাকেন আপনারা?—সেকশনের ভেতরে ঢুকে হেঁড়ে গলায় রে রে শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিশ্বাসসাহেব। হরিণের উপর রয়েল বেঙ্গল টাইগার যেমন ঝাঁপায় ঠিক তেমনি।

—কেন স্যার? আমরা তো এখানেই আছি! যে যার টেবিলে যেমনটি থাকি— মিউ মিউ স্বরে জানিয়ে দেন ভানুপ্রসাদ। পদবী লোধ হলেও ভানুর ভা আর লোধের লো মিলিয়ে ভালোবাবু নামেই তার সেকশান জোড়া খ্যাতি।

—না, নেই। থাকলে এমন সব অনাসৃষ্টি ঘটত না—হুঙ্কারের ডেসিবেল কমিয়ে শ্লেষ ছাড়েন বিশ্বাসসাহেব।

—ব্যোম্ ব্যোম্।—ঈশান কোণ থেকে চোখ বন্ধ করে শ্বাস ছাড়েন ভট্‌চাযবাবু, —যা বলেছেন স্যার। থেকেও নেই। আমরা আছি, অথচ নেই। শুধু খেই হারিয়ে নেই এর সংসারে বসে থাকা। মায়া, সবই মায়া স্যার। না থাকার জন্যে থাকার মায়া। ব্যোম! ব্যোম!

ভট্‌চাযবাবুর কাছে কাবু বিশ্বাসসাহেব। কিল খেয়ে কিল হজম করেন, রা-টি কাড়েন না। কেন কাড়বেন? অফিসে অধস্তন হলেও বাড়িতে ভট্‌চাযবাবুর দৌড় ঠাকুরঘর অবধি। লক্ষ্মী, শনি, সরস্বতী, সত্যনারায়ণ পুজোয় ষোলো আনা দক্ষিণার এমন সস্তা পুরুত আর কোথায় পাবেন? অফিসের নিন্দুকবাবুরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। ট্রেড ইউনিয়নের ভাষায়—শোষণ। বলুক গে! বিশ্বাস সাহেবের বধির কান— নিন্দে মন্দর প্রবেশ নিষেধ। তাছাড়া যে ক'দিন চেয়ার, সেই কয়দিনই কেয়ার। সুতরাং কেয়ারের কেয়ারফুলেই আনন্দে থাকা উচিত। কলসির কানা ছোঁড়ার জগাই-মাধাইরা আগেও ছিল, এখনো আছে। তা বলে ভালবাসা নিতে বাধা কোথায়?—আপনি আর বোম ফাটাবেন না মশাই। একেই মা মনসা, তার ওপর ওই ব্যোম্ ব্যোম্-এর ধুনো ছড়িয়ে কেসটা কেঁচেগণ্ডুষ করে দেবেন না।

সেকি! ভট্‌চাযবাবুর মুখের ওপর তোড়ে জবাব? এমনটি তো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই বেমক্কা কোনও কাণ্ড ঘটেছে। অবাক হওয়া বোকার চোখে পুরো সেকশনের নজর গিয়ে পড়ে ভট্‌চাযবাবুর মুখের ওপর। নজরে বরফের নীরবতা থাকলেও মনের ভেতর শালিধানের খই ফোটে আনন্দে। ঈর্ষার আনন্দে,—কী হে ভট্‌চায! পুরুতগিরির তেল কি তবে ফুরোলো? দেমাকের দাপট শেষ হল?

—না স্যার, আমি বলছিলাম কি.....

—না, কিচ্ছু বলছিলেন না। আমি মরছি আমার জ্বালায় আর আপনারা তামাসা দেখছেন?—কড়া না হলেও চড়া গলায় চার কথা শুনিয়ে ছাড়েন বিশ্বাসসাহেব।

তা শোনাবেন না কেন? বড় সাহেবের পি.এস. মানে প্রাইভেট সেক্রেটারি—ব্যক্তিগত সম্পাদক। সম্পাদনার নানান দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। সেই সাতসকালে ঘরকন্না চুলোয় ঠেলে, নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে কোনওমতে হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হতে হয় হুজুরের দরবারে। হুজুর অর্থাৎ বড় সাহেবের হাজির হওয়ার আগেই। তখন কোথায় থাকে সেকশনের এইসব চাঁদুরা? বিশ্বাসসাহেব ঢোকার একটু পরেই ঝাঁড়ু-বালতি-ফিনাইল হাতে ঢোকে ভীমতাল বাঁশফোঁড়। সব্বার আগে বড় সাহেবের চেম্বার, অ্যান্টিচেম্বার, ল্যাট্রিন ঝাঁড়পোঁচ করে সে তার নিজস্ব কায়দায় হুজুর বিশ্বাস সাহেবের দরবারে হাজিরা দেয়, হাতের ঝাঁড়ু কপালে তুলে উইস করে,—সেলাম সাব। একদফে দেখ লিজিয়ে।

তা না দেখে উপায় কি? পদবীতে বিশ্বাস হলেও সাহেব কিন্তু কাজে বিশ্বাস করেন না কাউকে। বিশেষ করে বড় সাহেবের 'ব্যক্তিগত' সম্বন্ধীয় কাজে। করা উচিতও নয়। কারণ সেটাই বিশ্বাসভঙ্গ। ব্রীচ অব ডেজিগনেশন। পদকে অপদস্থ করা। ব্যক্তিগত তকমা খুলে ব্যক্তিত্বহীনতার গড্ডলিকায় প্রবহমান হওয়া। না, সে কম্মো আর যার দ্বারাই হোক না কেন, বিশ্বাসসাহেবের দ্বারা হবে না।

অতএব পিছু নিতে হয় ভীমতালের। প্রথমেই বাথরুম। তার একটা আলাদা সৌন্দর্য, আলাদা ঐতিহ্য, আলাদা গন্ধ থাকবে না? আহ! নাকজোড়া নিপের গন্ধে মনটা ফুরফুরে না হওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই ভীমতালের—। ইধর কা গন্ধ্ উধার হলেই হুঙ্কার—ফিন্ শুরু কিয়া?

—হুজুর মাই বাপ! নিসপেক্টর সাহাব যিত্‌না দিয়া উত্‌না হি ডাল দিয়া। —দু'কানের লতি আলতো চেপে বেমালুম উঠবোস শুরু করে ভীমতাল।

—লেকিন?

—ও সাব চলিয়ে যাবে।—বিশ্বাসসাহেবের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে কান ছাড়ে ভীমতাল। মাসে তো মোটে দু-বোতলের ধাক্কা। ওপরওলাদের জন্যে এটুকু ঝক্কি পোয়াতে না পারলে বশংবদ শব্দের বদনাম হবে যে! ভীমতাল জানে, বাড়ির নিপ ফুরু ফুরু না হলে বিশ্বাসসাহেব হম্বিতম্বি করেন না একরত্তিও। তবে হ্যাঁ, এলেম আছে পি. এস. সাহেবের। ঘুষ নেন মাসে মোটে দু-বোতল। তাও ভীমতাল নিজের হাতে ডিসপোজেবল জলের বোতলে ভরে পৌঁছে আসে সাহেবের ফ্ল্যাটে। কাকপক্ষী টের পায় না। শুধু হেলথ্ ইন্সপেক্টর জানেন। কিন্তু 'রা' কাড়েন না। কেন কাড়বেন? সাহেব-সুবোদের এমন অনেক কিছুই জানেন ইন্সপেক্টররা, কিন্তু জানান দেওয়া বারণ। এটাও তো সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল। মানে, সেবা নিবৃত্তির অন্যতম বিধি।

—কি হয়েছে স্যার?

—আর হওয়া! কি হয়নি তাই তো ভাবছি।—আড়চোখে দেওয়ালের পর্দায় ঝোলানো ঘড়ি পড়ে নেন বিশ্বাসসাহেব।

জ্যাম। মাত্র এক শব্দের কৈফিয়ৎ। রোজই শোনান রূপা মাইতি। পি.এস. বিশ্বাসসাহেবের পি.এ.। বেশি শব্দের বাহুল্যে থাকা ধাতে নেই। দশটার অফিসে পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বাজে বাজুক। আঁচলের কেরামতিতে একটু খুলু-খুলু ঢুলু-ঢুলু ভাবই যথেষ্ট। বিশ্বাসসাহেবের জোঁক-চোখে নুনের দানা ছিটিয়ে একপাক সেকশনের নিন্দুকদের সামনে ফ্যাশন শোয়ের প্যারেড সারতে পারলেই সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত অফিসের ঘন্টাখানেক আগেই সট্‌কে পড়ার ছাড়পত্র জুটে যাবে।

—ব্যোম! ব্যোম!—হাজিরা খাতায় রূপা মাইতি হাজিরার আঁচড় কাটা শেষ করতেই না করতেই ব্রহ্মশব্দের নিনাদ ছাড়েন ভট্‌চাযমশাই।

—বোম-টা বড্ড সেকেলে। এখন আর ডি এক্স এর যুগ।—ঠান্ডা মাথায় ভট্‌চাযবাবুকে সান্ত্বনা দেন রূপা। হাজিরা খাতায় সই করার পর ভট্‌চাযবাবুর ব্যোম ব্যোম নিনাদ এখন কান-সওয়া হয়ে গেছে। তাঁর এই সাড়ে বারোটার অফিস নিয়ে কানাকানি ফিসোফিসি অঙ্গভঙ্গি তো আর কম হয় না। যা হয় হোক গে, মনে মনে ভাবেন রূপা মাইতি—কান রেখেছি কেটে, চোখ ঢেকেছি ঠুলিতে। তোমাদের বুলি শুনতে বয়েই গেছে। আসল তো সাহেব। বিশ্বাসসাহেব। তাঁর নজরে নজরে থাকাটাই হল আসল ক্রেডিট। নজরে থাকতে হলে মাঝে মাঝে নজরানা দেওয়ার ভঙ্গীগুঁলো জানা আছে। কখন আঁচল সামলাতে হবে, কবে সাহেবের জন্যে একটু ডিম-চপ্‌চপে ম্যাগি বানিয়ে আনতে হবে—সব রপ্ত করা আছে দিদিমণির। সুতরাং ভট্‌চাযবাবু যতই ব্যোম ব্যোম বোম ছুঁড়ুন না কেন, দুম্‌দাম্ ফাটাতে পারবেন না কিছুতেই।

—আবার বোম?—রূপা মাইতি চেয়ার ঠেসে বসতে না বসতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বিশ্বাসসাহেব,—আপনাকে আমি ফাইন্যাল ওয়ার্নিং দিচ্ছি ভট্‌চাযবাবু, আর একবার যদি বোম ফাটান তাহলে চার্জশিট দেব।

—দেখছেন সাহেব টেনশনে আছেন।—কাজলটানা চোখ, পটলভাজার মতো ম্যাড়মেড়ে করে নেন রূপা মাইতি। খুশি হন মনে মনে। ভট্‌চাযবাবুকে চার্জশিট একটা দেওয়াই উচিত। রূপা মাইতি নিজেই দেওয়াতে পারেন, কিন্তু দিচ্ছেন না। করুণায়। হাজার হোক বয়সে হয়েছে ভট্‌চাযবাবুর। তাছাড়া পুজো-আচ্চা করা পুরুত। তবু সহ্যের একটা সীমা আছে। অফিসে আসতে একটু না হয় দেরি হয়। চলেও যেতে হয় ঘন্টাখানেক আগে। তাই বলে ব্যোম করবেন? দেব শালা একদিন কমপ্লেন ঠুকে। সুপ্রিম কোর্টের রায় তো জানা নেই চাঁদু! ব্যোম ব্যোম বোল একদম ভি ওর চলে যাবে।

—আপনি মাথা গরম করবেন না স্যার। বসুন। টেনশন করলে সুগার বেড়ে

যাবে। প্রেসার চড়ে চড়্চড়ে হবে।—সাহেবকে শান্ত করে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করেন রূপা মাইতি।

—প্রেসার আছে, আমরা বুঝি স্যার। একা হাতে চারদিক সামলানোর ঝক্কি কি কম?—নিজের টেবিল ছেড়ে বিশ্বাসসাহেবের টেবিলের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ান পুতুতুণ্ডুবাবু,—আঠাশ বছর চাকরি হয়ে গেল স্যার। কম পি.এস. সাহেব দেখলাম না স্যার। আপনার মতো স্যার এত লোড, এত ঝক্কি, সত্যি কথা বলতে স্যার কেউই নেয়নি কোনোদিন। কিন্তু সুগার স্যার, ভারি খারাপ। সাইলেন্ট কিলার।

—সারাদিন একই বুলি কতবার আওড়াবেন? —মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে খুশি হন বিশ্বাসসাহেব। খুশি হবেন না কেন? সমাজ সংসারে তেল-চপচপে হয়ে থাকতে কে না ভালোবাসেন?

—আগে বলেছিলাম বুঝি?—গদগদ হন পুতুতুণ্ডুবাবু। অফিসের কাজে ফাঁকি না দিলেও সাহেবদের নেকনজরে থাকাটা ভীষণ পছন্দ করেন। কোন সাহেবের কোন তেল পছন্দ তা তিনি আঠাশ বছরে হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছেন। প্রথমদিকে অবশ্য সর্ষের তেলের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এখন সাহেবরা সানফ্লাওয়ার, রাইস ব্যান, রিফাইন, এমনকি পাম তেলও পছন্দ করা শুরু করেছেন। এ ছাড়াও বেবি অয়েল, বডিঅয়েল তো আছেই।

—বলেননি? হাজিরা খাতায় সই করতে এসেই তো কানের গোড়ায় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে গেলেন।—চেয়ারে চেপে বসেন বিশ্বাসসাহেব।

—আপনি পছন্দ না করলেও বলব স্যার। চিৎকার করে বলব। ট্যাড়া পিটিয়ে বলব। বুক চিতিয়ে বলব। মাথা উঁচু করে বলব। সত্যি কথা বলতে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করব কেন স্যার? তুমি কি বলো রূপা? সাহেবের মতো এত ঝক্কি, এত টেনশন—

—আহ! একটু থামবেন! আমি মরছি আমার জ্বালায়।—পুতুতুণ্ডুবাবুকে থামিয়ে রূপার চোখে চোখ রাখেন বিশ্বাসসাহেব,—একটা ফোন করুন তো—এক্ষুণি, এক্ষুণি ডেকে পাঠান।

অপেক্ষাতেই ছিলেন রূপা মাইতি। সাহেবের আদেশ মুখনিসৃত হতে না হতেই রিসিভার তুলে নেন হাতে। বেগতিক বুঝে সট্‌কে পড়েন পুতুতুণ্ডুবাবু।

—হ্যালো! পি.এ. টু পি.এস. বলছি। একবার চলে আসুন তাড়াতাড়ি। সাহেব ডাকছেন।

—যত সব অকাজের ঢেঁকি।—রূপা মাইতি ফোন ছাড়তেই গজ্ গজ্ করেন বিশ্বাসসাহেব। গলা চড়িয়ে হাঁক দেন,—চণ্ডীবাবু, সাহেবের গাড়ির ট্যাক্স রিন্যুয়াল ফাইলটা অ্যাকাউন্টস থেকে এসেছে?

—না স্যার। আমি কাল বিকেলেও খোঁজ নিয়েছিলাম—নিজের অবস্থান থেকে

ফাইলের অবস্থা শুনিয়ে দেন চণ্ডীমাধববাবু।

—বিকাশবাবু!!—সপ্তমে গলা চড়ে বিশ্বাসসাহেবের।

—সীটে নেই স্যার। ব্যোম! ব্যোম!—জানান দেন ভট্‌চাযবাবু।

—মানে? সীটে নেই মানে? অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই চরতে বেরিয়েছেন? কাকে বলে গেছেন?—'মেজাজ কি শুধু শুধু খারাপ হয়' ভঙ্গীতে চোখ রাখেন রূপা মাইতির চোখে।

—আজ্ঞে বিকাশ স্যার, বড়সাহেবের প্রিমিয়াম জমা দিতে গেছে, অফিসিয়াল কাজে।—জানিয়ে দেন চণ্ডীবাবু।

—বড়সাহেবের প্রিমিয়াম? কই, সাহেব তো আমাকে একবারও বলেননি! --মনের কষ্ট মুখে উথ্‌লে ওঠে বিশ্বাসসাহেবের।

—আপনাকে না জানিয়ে বিকাশবাবুর যাওয়া উচিত হয়নি।—প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেন রূপা মাইতি।

—সব স্বাধীন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে শিখেছে। সাহেবের সামনে থাকার বাসনা হয়েছে। তা থাকতে চান থাকুন, আমার কি! সাহেবের সামনে আর ঘোড়ার পিছনে—থাকার যে কি মজা তা যদি টের পেতেন! —গজ্ গজ্ করেন বিশ্বাসসাহেব। করবেন না কেন? বিকাশবাবু যদি বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারেন তাহলে বিশ্বাসসাহেবও গজ্ গজ্ করতে পারবেন। অন্তত করা উচিত। নইলে অফিসের ডেকোরাম থাকে না। বড় সাহেবের কাছে বিকাশবাবুকে চেনালো কে? এই শর্মাই তো!— মনে মনে অসন্তুষ্টির মাত্রা ছাড়ান বিশ্বাসসাহেব। বলা নেই, কওয়া নেই, বড়সাহেব বিকাশবাবুকে প্রিমিয়াম জমা দিতে পাঠিয়ে দিলেন? বড়সাহেব তো কখনো এমন করেন না। তবে কি কোনো স্খলন হল? ব্যক্তিগত সম্পাদকের কাজে কোনো ত্রুটি?

—মন খারাপ করছেন কেন স্যার? বিকাশদা বড়সাহেবের স্টেনো। ডিকটেশন নিতে গিয়ে হয়ত....পেনফুল ঘটনায় পেন কিলারের মলম লেপে দেওয়ার চেষ্টা করেন রূপা।

—মন খারাপ? কেন? মন খারাপ করতে যাব কেন?—ছায়া সুনিবিড় চোখ তোলেন বিশ্বাস সাহেব,—আমরা সবাই বড়সাহেবের পাঁঠা। তিনি লেজে কাটবেন না মাথায়,সে সাহেবই জানেন।

—আমাকে ডাকছেন স্যার?—খান পঁচিশেক ফাইলের পাহাড় কাঁধে আসরে অবতীর্ণ হন কমলবাবু,—ফাইলগুলোও নিয়ে এলাম। স্পীক করতে বলেছেন স্যার?

—আপনাকে? ডেকেছি? আমি?—মরমে মরে থাকা মনের ওপর ফাইলের কফিন দেখে বিরক্তিতে একশেষ হন বিশ্বাসসাহেব,—সাতসকালে আপনার সঙ্গে স্পীক্ করার সময় নেই মশাই।

—আহা রূপা দিদিমণি যে বললেন—ধপাস্ শব্দে পি. এস. সাহেবের টেবিলে ফাইলগুলো কাঁধমুক্ত করেন কমলবাবু,—তাছাড়া ফাইলগুলোও তো ক্লীয়ার করা দরকার!

—আপনি ডেকেছেন? কমলবাবুকে?—শান্ত, সমাহিত প্রশ্ন ঢেলে রূপার শরীর গতিক পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বিশ্বাসসাহেব। সারা সেকশনে এই একমাত্র মনোহরা মনোবীণা।

—আপনি যে বললেন ফোন করতে—না বুঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাওয়ায় লজ্জা-লজ্জা মুখ করেন রূপা মাইতি।

—কমলবাবুকে ডাকতে বলিনি। বলেছি স্যানিটরি ইন্সপেক্টরকে ডাকতো। —নাটকের ডায়লগ বলার মতো আস্তে আস্তে কেটে কেটে রূপা মাইতিকে বুঝিয়ে দেন বিশ্বাসসাহেব। জুলু জুলু চোখে সব লক্ষ্য করেন ভট্‌চাযমশাই। ইচ্ছে করে 'ব্যোম্' ফাটাতে। রামের বদলে রহিমের ডাক? পান থেকে এমন চুন অন্য কেউ খসালে এতক্ষণে তার মুণ্ডু খসিয়ে ছাড়তেন। নেহাৎ রূপা মাইতি, তাই সাতখুন মাফ হয়ে গেল। একেই বলে বৈপরীত্যের কেরামতী। লিঙ্গভেদের আকর্ষণ। পোলারাইজেশন। প্লাসের সঙ্গে মাইনাস আর মাইনাসের সঙ্গে প্লাস। বিকর্ষণের বিষ কর্ষণ নয়, আঁকশির আকর্ষণ।

— ফাইলগুলো থাক স্যার। আমি বরং সেকেণ্ড হাফে.....

—না, ফাইলগুলো নিয়েই যান। স্যার একটু হাল্কা হলেই আমি ফোন করব।—বিশ্বাস সাহেবের পক্ষে রায় শুনিয়ে দেন রূপা।

কমলবাবু পিছে মোড় ভঙ্গীতে ফাইলের গন্ধমাদন কাঁধে ঘুরতে না ঘুরতেই বেজে ওঠে ফোন। রিসিভার কানে তুলে কথা বলার প্রস্তুতি সূচক 'হ্যালো' শোনান রূপা। রিসিভার এগিযে দেন বিশ্বাস সাহেবের দিকে,—বাড়ির ফোন স্যার। মেমসাহেব—

—বলে দিন সীটে নেই, সাহেবের ঘরে আছে। মেমসাহেব! গোদের ওপর বিষফোঁড়া সহ্য করতে পারব না।

—কিন্তু স্যার আমি যে ধরতে বললাম!—অসহায় রূপা নাছোড় ভঙ্গীতে জানতে চান।

—ধরে থাকুন। ধরতে ধরতে একসময় ফস্কে যাবে—

—মানে?

—মানে বিরক্ত হয়ে লাইন কেটে দেবে।

—মেমসাহেব আমাকে সন্দেহ করবেন স্যার।—অথৈ জলে পড়ে যাওয়ার মতো ভান করেন রূপা মাইতি।

—সে কি আর করেন না ভাবছেন? খুউব করেন! হাজার বার করেন। ঠারে

ঠোরে আমাকে শোনাতেও ছাড়েন না। মেয়েরা, মানে বউরা বড় ক্রুকেড হয়। সবকিছুতেই সন্দেহ। আপনিই বলুন না!—সাক্ষীর কাঠগড়ায় রূপা মাইতিকেই দাঁড় করিয়ে ছাড়েন বিশ্বাসসাহেব,—আমার ব্যবহার, চাল-চলনে আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, আমি আপনার সঙ্গে কোনো ইয়ে, মানে সন্দেহজনক, মানে.....

—ব্যোম্! ব্যোম্!

—*আহ! ভট্‌চাযবাবু, সহ্যের কিন্তু একটা সীমা আছে।—রূপা মাইতির আঙুলে* আঙুল ছুঁইয়ে রিসিভার হাতে নেন বিশ্বাসসাহেব,— আপনার ওই 'ব্যোম্' অফিসে মানায় না। অফিসে ফাইল মানায়, কাজ মানায়।

আহাম্মক আর কাকে বলে! সবে একটু কায়দা করে রূপা মাইতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফায়দা তোলার চেষ্টা করে খিঁচড়ে থাকা মনটা ভালো করার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই বাধা। একদিকে গৃহকর্ত্রী, অন্যদিকে সাধকের ব্যোম্ ব্যোম্ দোদমা। ধুস! ধুস!

—হ্যালো! বলো....কই না তো....তেমন কিছু তো বলিনি....আহা তোমার সঙ্গে কথা বলব না কেন....সন্দেহ? সেকি? কখন বললাম? কি বলবে বলো....

না, কিছুই বলেন না বিশ্বাস-মেমসাহেব। উল্টে কড়্-কড়াৎ-কড়্ শব্দে ধম্‌কে দেন। সেই সকাল থেকে কী যে হচ্ছে কে জানে! কূল রাখতে গেলে শ্যাম পালায় আর শ্যামকে ধরলে কূল ভেসে উপচে পড়ে। বড়সাহেব সকাল থেকে মুখে অমাবস্যা মেখে বসে আছেন, তার ওপর স্ত্রীর তুফান। সোনায় সোহাগা।

—স্যানিটরি ইন্সপেক্টরকে ডাকব স্যার?—ক্রেডেলে রিসিভার না রেখেই জানতে চান রূপা।

—এখনো ডাকেননি?

—মেমসাহেবের ফোন এল যে!

—সময় মতো রিং করলে তো আর মেমসাহেবের ফোন আসতে পারতো না, এক দলা বিরক্তি ঝরান বিশ্বাসসাহেব—আপনারা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে তবেই ছাড়বেন। এই যে মেমসাহেব কোনও কথাবার্তা না বলে ফোন কেটে দিলো। পরিণতি কি হবে জানেন?

উদাস চোখ মেলে বিশ্বাসসাহেবের মুখের ক্যানভাস পড়া ছাড়া কোনও উত্তর খুঁজে পান না রূপা মাইতি।

—অফিস ফেরৎ ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কুরুক্ষেত্র থেকে পানিপথ, পানিপথ থেকে পলাশী—সব যুদ্ধ একসঙ্গে শুরু করবে। আচ্ছা রূপা, একটা কথা বলুন তো! স্বামীদের সন্দেহ করা ছাড়া স্ত্রীদের কি আর কোনও বাতিক নেই?

—না, মানে আমি তো কখনও আপনার ভাইকে সন্দেহ করি না, সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে ঘাবড়ে যান পি.এ. রূপা মাইতি।

—কি করেন না করেন আমি কি করে জানবো?

—আপনি স্যার ক'টা দিন ছুটি নিন। আমাদের সঙ্গে চলুন নৈনিতাল ঘুরে আসবেন। বাইরের আলো হাওয়া গায়ে লাগলে মেয়েরা খুশি হয়, পরামর্শ দেন রূপা।

ব্যোম! ব্যোম! ফাইল বন্ধ করে শরীরের আড়মোড়া ভাঙেন ভটচাযবাবু।

—*কথাটা মন্দ বলেননি। এই বুড়ো বয়সে ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থাটা একেবারে* পাকা হয়ে যাবে। গাছ পাকা। টুক করে পেড়ে ফেলতে কষ্ট হবে না একটুও

—ভটচাযমশাইকে পাত্তাও দেন না বিশ্বাসসাহেব।

—কেন স্যার অমন অলুক্ষুণে কথা বলছেন? তাছাড়া নিজেকে বুড়ো ভাবার মতো বয়েস আপনার হয়নি, চোখের বলয় রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে নেন রূপা—আপনি তো আর একলা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না। সঙ্গে আমার স্বামী পুত্র, মেমসাহেব এবং আপনার মেয়ে মিনিও থাকবে।

—বরাত, বুঝলেন? বরাত।

—না স্যার বুঝলাম না, হাল ছেড়ে চেয়ারে হেলান দেন রূপা।

এই তো সেদিন সুজিতবাবুর ছেলের বিয়েতে গেছিলাম। পুতুতুণ্ডুবাবুও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমি আর আপনি গাড়ির পিছনের সিটে বসেও ছিলাম। কিন্তু ফারাক ছিলো। বিস্তর ফারাক। তবুও আমার স্ত্রীর কানে কে কারা ঢেলে দিলো আমরা নাকি গলাগলি ঢলাঢলি করে বসেছিলাম। আরও হয়তো অনেক উপন্যাসের বিন্যাস হতো যদি না পুতুতুণ্ডুবাবু সঙ্গে থাকতেন।

—অনুমতি পেলে আমি স্যার আজই এই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি—নিজের চেয়ার ছেড়ে এক লাফে বিশ্বাসসাহেবের সামনে এসে দাঁড়ান পুতুতুণ্ডুবাবু—আমি মেমসাহেবকে গিয়ে বলে আসতে পারি আপনাদের দু'জনের মাঝখানে মাইলখানেক ফাঁকা হাওয়া ছিলো। তাছাড়া....

—থাক আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

—ব্যোম! ব্যোম!

—স্যানিটরি ইন্সপেক্টরকে আসতে বলবো স্যার? ক্রেডেলের উপর থেকে রিসিভার হাতে তুলে প্রসঙ্গ বদলাতে চান রূপা। তারপর একটুও সময় নষ্ট না করে কিংবা বিশ্বাসসাহেবের অনুমতির অপেক্ষা না করেই রিং করেন—হ্যালো, পি.এ. টু পি.এস. বলছি। একবার আসবেন! সাহেব ডাকছেন....না না, নিপ পাঠাতে হবে না, একবার চলে আসুন।

নিপ! রূপার মুখে শব্দটা শুনেই চমকে ওঠেন বিশ্বাসসাহেব। সব কি তবে রাষ্ট্র হয়ে গেছে? হোক, হোক গে যাক—

—স্যার!

—বলুন।—উদাস বাউল বিশ্বাস সাহেব,—'আমি হৃদমাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না' গোছের উদাসীনতায় উত্তর দেন।

—বড়সাহেব কি খুব রেগে আছেন? মুড অফ?

—জানি না। মুড অফ হওয়াই উচিত। এ. সি. ঘরে মশা-মাছি ভন্ ভন্ করলে কোন সাহেবের না রাগ হবে?

—মশা-মাছি?—যেন আজব কোনো জন্তুর নাম শুনলেন রূপা মাইতি। অন্তত চোখমুখ আর বলার ভঙ্গীতে তেমনি ভাবই প্রকাশিত হয়।

—তবে আর বলছি কি! বড়বাবু থেকে শুরু করে ভীমতাল, রামদাস পর্যন্ত সব ঘুমিয়ে থাকে। হাজারদিন বলেছি, বড়বাবু, সাহেব চেম্বারে ঢোকার আগে.....

—আপনিই তো নিষেধ করেছেন স্যার। হুট্ হাট্ বড়সাহেবের চেম্বারে ঢুকতে মানা করেছেন।—সাড়ে ছ'মিটার দূরে নিজের টেবিল-চেয়ারে গাঁট হয়ে বসে পি. এস. সাহেবের মুখের ওপর সাফ কথা শুনিয়ে দেন ভানুপ্রসাদ লোধ। সেকশনের বড়বাবু, সবার প্রিয় ভালোমানুষ।

—এই যে মশাই, কোথায় থাকেন?—ভালোবাবুর মুখের ওপর ভালোরকম জবাব দেওয়ার আগেই অনুরাগ সামন্ত এসে হাজির হন। এক্স সার্ভিসম্যান কোটায় স্যানিটরি ইন্সপেক্টর।

—কেন স্যার, অফিসে।—'প্যারেড সাবধান!' ভঙ্গিমায় টান টান জবাব দেন প্রাক্তন সেনা অনুরাগ সামন্ত।

—অফিসে থাকলে বড় সাহেবের ঘরে মশা-মাছির ভন্‌ভনানি হত না। বলেই রূপা মাইতির উদ্বিগ্ন চোখে চোখ রাখেন বিশ্বাসসাহেব,—শুনলেন? উত্তরের ছিরি শুনলেন?

—না না সামন্তদা, আপনার অমন কাটা জবাব দেওয়া ঠিক নয়। স্যারের যে কি টেনশন চলেছে তা যদি জানতেন!—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন রূপা মাইতি।

—সাহেব বুলায়া।—রূপা মাইতির দড়ের জবাবে দড়কঁচা কোনো শব্দ শোনানোর আগেই রামদাস সেলাম ঠোকে বিশ্বাসসাহেবকে।

চেয়ার ছেড়ে তড়াক্ উঠে দাঁড়ান বিশ্বাসসাহেব। রামদাসের কাছে আরো একবার জেনেবুঝে নিতে চান বড়সাহেবের মনের খবর, সাহাব গুস্‌সা মে হ্যায় ক্যা?

—মালুম নেহি।

—ঘরমে ঔর কোন হ্যায়?

—কোই নেহি।—বলতে বলতে খৈনির দলায় বুড়ো আঙুলের চাপ দেয় রামদাস।

—দুগ্‌গা দুগ্‌গা!—কপালে আঙুল ঠেকান রূপা মাইতি।

ব্যোম্‌! ব্যোম্‌! জয় তারা!—হাঁক দেন ভট্‌চাযবাবু।

ভ্রূক্ষেপ করেন না বিশ্বাসসাহেব। বরং সব ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ছোট্ট নোটবই হাতে ঢুকে যান বড়সাহেবের চেম্বারে। মনে মনে দুগ্‌গা নাম জপ করেন রূপা মাইতি। আজ একটু কাজ আছে। সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ অফিস ছাড়তে পারলে ভালো হয়। কিন্তু বড়সাহেবের মুড ভালো না হলে সব গুড়েই বালি হয়ে যাবে। পি.এস. সাহেব বম্‌কে থাকবেন। কানের পর্দায় ঘ্যানর ঘ্যান্‌ ভ্যান্‌তাড়ামো শোনাবেন। অফিস ছাড়ার কথা তোলাই যাবে না। অবশ্য শেষ সম্বল একটা আছে—আঁচল....

—রূপা, চা বলুন তো!—গদ গদ বিশ্বাসসাহেব অন্য চেহারায় ফিরে আসেন বড়সাহেবের চেম্বার ছেড়ে,—আরে অনুরাগবাবু, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। ভট্‌চাযবাবু, আপনার বাড়িতে কী যেন কাজ আছে বলছিলেন! যান, চলে যান।

—আমার যে আর কোনো সি.এল. পাওনা নেই স্যার!

—সি. এল. কি হবে? আমি যখন বলছি, আপনি চলে যান!—কল্পতরু হয়ে ওঠেন বিশ্বাস সাহেব।

—বড়সাহেবের ঘরের মাছি উড়ে গেছে স্যার? বিনীত অনুরাগ সামন্ত উদ্‌গ্রীব হন।

—উড়ে না গেলেও মরে গেছে নিশ্চয়। তাই বলে আপনি কিন্তু ফাঁকি দেবেন না। স্প্রে যেন ঠিকঠাক হয়।—সাবধান করে দেন বিশ্বাসসাহেব। আর পি.এস. সাহেবের খলবল উচ্ছ্বাস দেখে উল্লসিত হন রূপা মাইতি। মেঘ হয়ত কেটে গেছে।

—বুঝলেন রূপা, সাহেবের একটু বদহজম হয়েছিল সকাল থেকে। দু'একবার চোঁয়া ঢেঁকুর তুলেছেন বললেন—

—এখন? এখন কেমন আছেন বড়সাহেব?

—ভালো। খুউব ভালো। এক্কেবারে নর্মাল। আমি অ্যান্টাসিড দিতে চাইলাম। উনি হেসে ফেললেন।—চেয়ারের ব্যাকরেস্টে পিঠ ছড়িয়ে খুব জোরে হেসে ওঠেন বিশ্বাসসাহেব।

সং-সার

আয়, আয় এগিয়ে আয়। গরম খুন্তি ঠুসে চোখ একেবারে কানা করে ছাড়বো। সকাল হতে না হতেই চুরির মতলব?—রান্নাঘর থেকে রে রে শব্দের দানবিক আনবিক স্বর কানের পর্দায় আছড়ে পড়তেই বিছানা ছাড়তে হয়। একে বসন্তের হিমেল আনন্দ, তার উপর রবিবারের সকাল। আলসেমি মোড়া শরীর কি অত সহজে বিছানা ছাড়তে চায়? চায় না, তবু ছাড়তে হয়। ঠিক ছাড়তে নয়, ছাড়াতে হয়। মানে ছাড়িয়ে ছাড়ে। ছাড় বেছাড় ভীষ্মলোচন শর্মার অমন সংগীত চর্চা কানের পর্দায় চলকে পড়লে বিছানা কেন—ভূতও ছেড়ে যায়। সকালবেলা কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হলো? কার চোখে গরম খুন্তি ঠুসবে? কে ঢুকলো চুরির মতলবে? ঘুম ঘুম চোখে এমনি তিন তিনটে মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিছানা ছেড়েও ঝিম মেরে বিছানা ছুঁয়ে বসে থাকতে হয় কিছুক্ষণ।

যত্তো সব উদ্ভট বিদঘুটে শখ! তা বাপু এতোই যখন শখ তখন কোলে পিঠ করে রাখলেই তো পারো। আবার, আবার চোখ পিট পিটানি—দেবো একেবারে—

কি হলো? সাতসকালে অমন কাক চেল্লান চেল্লাছো কেন? ঘুমের বারোটা বাজিয়ে শাসনের উৎস মুখে রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় পবিত্র। পূবমুখো জানলায় দাড়িয়ে অন্যদিনগুলোয় রোদের রথ লক্ষ করে মনে মনে জপ করে—জবাকুসুম শঙ্কাশং....। আজ সকালে সে বালাই ঘোচাতে হয়।

কি! সাতসকালে আমি চেল্লাছি? পবিত্রের মুখের উপর খুন্তি হাতে রুখে দাঁড়ায় সবিতা। অন্য শঙ্কায় মনের ভিতর ফুটে ওঠে ভয়ের লাল, লাল জবার ফুল।

একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? পাড়ার আর পাঁচজন শুনলে কি ভাববে বলো তো? বউয়ের ধমকে দমে যায় পবিত্র। তবুও স্কুল মাষ্টারের নিপাট ভদ্রতায় গলার স্বর খাদের মধ্যমে নামিয়ে অবাধ্য ছাত্রীকে ভূগোলের কর্কটক্রান্তি রেখা বোঝানোর চেষ্টা করে।

সকাল হতে না হতেই অমন জ্বালাতন শুরু হলে আর আস্তে কথা গলায় আসে না। তাছাড়া কে কি ভাবলো তা নিয়ে আমার অতো মাথা ব্যথা নেই। উচিৎ কথা গলা উচিয়ে বলতে ভয় পাবো কেন? পবিত্রের স্বরে যতোই উদারার আভাষ

থাকুক না কেন, সবিতা একেবারে তার সপ্তকে চড়ে যায়। কর্কটক্রান্তি নয়, সোজা চড়ে যায় কর্কশকান্তিতে।

মেয়েরা অতো জোরে কথা বললে লোকে ভাববে ঝগড়া ঝাটি....।

কী? মেয়েরা মানুষ নয়? তারা জোরে কথা বলতে পারবে না। সাতসকালে বেহায়া ছুঁচো পাঁজিকে শাসন করতে পারবে না? তা এতোই যদি মেয়েদের দোষ তো বেলা আটটা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে না ঘুমোলেই তো পারতে—ফোঁস ফোঁস করে শুনিয়ে দেয় সবিতা।

সপ্তাহে তো মোটে একটা দিন। ঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে কথা বলো, নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করে পবিত্র, সবে সাড়ে সাতটা বাজে।

তবে আর কি! যাও আবার গিয়ে চাদর মুড়ি দাও গে! সপ্তাহে একটা দিন ঘুমিয়ে কাটালেই বা ক্ষতি কি?

চা হয়েছে? খুব আস্তে প্রশ্নটা সুইং করে পবিত্র। সাড়ে সাতটা না আটটা, সপ্তাহে একদিন না সাতদিন—এইসব কুটকচালের গূঢ় তত্ত্বে না গিয়ে প্রাতঃকৃত্যের আগের কৃত্য সারতে চায়।

আমি তো আর দশ হাতের দেবী দুর্গা নই। মেয়েকে আঁকার ক্লাসে, ছেলেকে তবলার স্কুলে পৌঁছে ঠাকুরঘর পরিষ্কার করে, গুচ্ছের টবে জল ঢেলে এসে এখনও একটু দম ছাড়ার টাইম পায়নি, ফিরিস্তি শুনিয়ে চা-য়ে নয়, পবিত্রের আঁতে কথার কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় সবিতা।

ঠিক! ঠিক! তুমি দুর্গা হতে যাবে কোন দুঃখে...

মানে? মস্করা করছো?

ক্ষেপেছ? তোমার সঙ্গে মস্করা? আমি বলছিলাম...

কী? কী বলছিলে শুনি!

তুমি হলে কালী। মা কালী— করাল বদনাং...

তা ভালো বদনের কাউকে তো বিয়ে করে আনলে পারতে। তখন তো একেবারে ঘুর ঘুর আর ঘুর ঘুর। কানপুরে আমার বিয়ের কথা যখন প্রায় পাকাপাকি তখন কি কাণ্ডটাই না ঘটালে। সাবি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

আর তুমি? তুমি কি করেছিলে? পরামর্শটা কে দিয়েছিলো? আমার ঘাড়ে অমন একটা মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা কে চাপিয়েছিল শুনি? পুরানো কাসুন্দি ঘাটার মুডে মশগুল হয়ে ওঠে পবিত্র।

ওঃ। যার জন্যে চুরি করলাম, সেই বলে কিনা চোর? কলঙ্ক তোমার হয়েছিলো না আমার? ছিঃ ছিঃ ভাবলেও লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে, পুরানো কাসুন্দি তো নয়, পচে ওঠা সরষে খোলের দুর্গন্ধ ছড়ায় সবিতার কথা বলার ভাব ভঙ্গীতে।

স্কুল কমিটির কাছে শো কজের জবাব তো আমাকেই দিতে হয়েছিলো। পচা গন্ধ ছড়ায় ছড়াক, তবুও লড়ে যেতে চায় পবিত্র। কানপুরে বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি হওয়ার পর 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না' ডায়লগটা সবিতার কর্ণকুহরে ছেড়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাই নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জীবনের পর জীবন (থুড়ি, বেচে বর্তে থাকা অবস্থায় জীবনের পর জীবন হবে কি ভাবে?) উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, কথার পিঠে, ছেলে মেয়েদের সামনে, সমাজ সংসারে, আত্মীয় বন্ধু মহলে, উৎসবে অনুষ্ঠানে, ঘাটায় আঘাটায় খোঁটার পর খোঁটা কতোদিন সহ্য করবে? সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। সীমান্তের তাঁর কাঁটা ঘেরা বেড়ার মতো। এপারে মিত্রপক্ষ, পারাপ্পার হলেই শত্রুতা। আজ পারাপার হয়েই ছাড়বে পবিত্র। হোক শত্রুতা। পুরানো প্রেমিক প্রেমিকার শত্রুতা, নতুন বর কনের শত্রুতা। সংসারের পাকে পাকে দম দিয়ে দিয়ে দম্পতির মধ্যে শত্রুতা হোক। হয় হেস্থ, নইলে নেস্থ। হেস্থনেস্থ একটা করে ফেলাই ভালো। কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠুক, কাদা ঘাটতে পাঁক। পাকে পাকে জড়িয়ে বিপাক বিপত্তি যা হয় হোক—তবুও ছাড়াছাড়ি নেই।

শো কজ? না, আই ওয়াস? কতোগুলো বুড়ো লোকের ভড়ং, ভাংটামি। রসের নাগরদের তাড়ির সন্ধান করা। ওসব ওজর অজুহাত বুঝতে আমার বাকি নেই, তুম সের তো ম্যাঁয় সওয়া সের ভঙ্গীতে কোমর বাঁধে সবিতাও।

কি যা তা বলছো? স্কুল সেক্রেটারি হরিভক্তবাবু তোমারও মাষ্টারমশাই ছিলেন। তাছাড়া একজন শিক্ষক, ছাত্রীর চরিত্র হননের কারণ হলে স্কুল কমিটিই বা ছাড়বে কেন? ঘটনা যাই হোক না...

উঁহ! কি আমার পণ্ডিত মাষ্টারমশাই ছিলেন। আমি তোমাকে মানতামই না, ঠোঁট উল্টিয়ে কথা পাল্টিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সবিতা। মানবো কেন? ছাত্রীর সঙ্গে অমন ছুঁক ছুঁক হ্যাংলামো করলে কোনও মেয়েই মাষ্টারকে মানে না।

হ্যাংলামো করতাম আমি? রণদাকে বলে টিউশনি পড়ানোর জন্য কে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলো শুনি?

সে তো ক্লাস সেভেনে! বাচ্চা মেয়ে অতো শত বুঝিনি তাই, ঠোঁট ওল্টায় সবিতা।

বাচ্চা মেয়ে? তাচ্ছিল্যের হাসি ছড়ায় পবিত্র—টসটসে পাকা। নইলে দু'বছর কাটতে না কাটতেই এক পারাগ্রাফ? 'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস—' ভাবসম্প্রসারণ করতে করতে কে লিখেছিলো—পবিত্রদা আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভীষণ ভালবাসি—নদীর এপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে গেল। আমাকে তুমি ওপাড়ে নিয়ে চলো। কে লিখেছিলো গানের কলি—আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা—আমি যে নদী চিনি না।

বেশ করেছিলাম, লিখেছিলাম। লিখেছিলাম বলেই তো বর্তে গেছিলে? তর্কের নেশায় পেয়ে বসে সবিতাকে।

বেশ তো করেইছিলে। নইলে কি আর আমাকে অতো নিচে নামতে হতো?

তোমার জন্যেই তো! কুমারী হয়েও বমি করার ভান করে করে প্রমাণ করতে হয়েছিল আমি গর্ভবতী। আমার সন্তানের বাপ তুমি। ছাকনির বুকে ধোঁয়ামেলে দেওয়া গরম চা ঢেলে কাপের পেট ভরায় সবিতা—

শেষপর্যন্ত তো সবাই তোমাকেই দুষেছিলো—

দুষবে না? আমি যে মেয়ে। আমাদের যে সখ আহ্লাদ থাকতে নেই। সুখ শান্তি থাকতে নেই। থাকলে কি আর সাতসকালে তোমার মুখ ঝামটা খেয়ে মরতে হয়? কান্নার বেগ চেপে হাউ হাউ করে ওঠে সবিতা।

যাব্ বাবা! আমি আবার কখন মুখ ঝামটা দিলাম। উঠতে বসতে যা বলার গড়গড় করে তো তুমিই বলে যাও। কথায় কথায় তো তুমিই খোটা দাও—কানপুরের ছেলেটার সঙ্গে যদি বিয়ে হতো—

ভাল হতো! ঢের ঢের ভাল হতো! তোমার মতো অমন একটা স্বার্থপর লোকের হাতে পড়ে জীবনের হাড় মাস তো কালি হয়ে যেতো না—পবিত্র এবং কান্নার ঢেউ দুই তরফকেই মাঝ পথে সরিয়ে রাখে সবিতা।

আমি স্বার্থপর? অবাক হয় পবিত্র।

স্বার্থপর নও? সকাল থেকে ছেলেমেয়েদের পিছনে খাটতে খাটতে দম বন্ধ হবার যোগাড়। নিজে তো ভুস ভুস নাক ডাকিয়ে আটটা বাজিয়ে দিলে। ন'টায় যাবে বাজারে—দশটার আগে...পুরানো কাসুন্দি থেকে একেবারে টাটকা নলেন গুড়ে ফিরতে চায় সবিতা।

অনেক আগেই তো বাজারে যেতে পারতাম। চা টিফিন হয়েছে? হয়নি! তাহলে দোষটা কার শুনি? যুক্তি তর্কের জাল ফেলে সবিতাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে পবিত্র।

নিজেও তো এককাপ চা করে নিতে পারতে—

তা পারতাম। তবে কি জানো?

কী?

সক্কাল সক্কাল তোমার হাতের চা না খেলে নেশাটা ঠিক জমে না, বেসিনে চোখ মুখ ধুতে ধুতে বউকে একটু তোয়াজ করে নেওয়ার চেষ্টা করে পবিত্র। রণে ভঙ্গ দিয়ে বঙ্গবালার স্বামী সোহাগি ভাবনা উস্কে দিতে চায়। তাছাড়া সাবি তো (সবিতাকে সেই ছাত্রীকাল থেকেই সাবি ডাকার অভ্যেস পবিত্রর) খুব একটা মিথ্যে বলেনি। দশটা পাঁচটা স্কুলে ক্লাস ঠেঙানো, সকাল সন্ধ্যেয় টিউশানি গুঁতানো ছাড়া সংসারের কোনও দিকেই তো খেয়াল রাখতে পারে না পবিত্র। এমন কি ছেলেমেয়ের

পড়াশুনো দেখারও সময় নেই। সংসার ধম্মো, আত্মীয়স্বজন, লোকলৌকিকতা সবই সামলাতে হয় সাবিকে। কাজের বোঝায় তাই মাঝে মধ্যে খাবি খেয়ে ওঠে। রাগ নয়—পবিত্রের মনে হয়—গানের কলি—এ যে অভিমান। মানভঞ্জনের তোয়াজ যে সে করে না তা নয়, তবু মাঝে মধ্যে অভিমানের সঙ্গে অভিমান জুড়ে গিয়ে টানাটানি একটু বেশি হয়ে যায় বইকি। কি আর করা যাবে—সবই মুডের ব্যাপার। টিভি কিংবা রেডিওর টিউনিংয়ের মতো। কখনও অন, কখনও অফ। তা বাপু একজনের অফ মুডে অন্যজনেরও অফ হওয়ার কি দরকার? অন হয়ে চনমনে থাকলেই তো হয়। সে সব বোধ পবিত্রের আছে—তবু মাঝে মধ্যে আঁতে ঘা লেগে একটু হাঁ হুঁ হুঙ্কার না ছেড়ে পারে না। সুতরাং হেস্তনেস্ত ক্ষান্ত করে সকালের ফুরফুরে মুড আবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। নিজের মুড ভাল করে তুললে সাবির মুড ভাল হতে কতোক্ষণ। দু'চারটে ভালো ভালো তোয়াজের বুলি ছাড়লেই ভালোবাসার ঝুলি উজার করে দেবে সাবি।

কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। চা তো আর হাত ধোওয়া জল নয় যে এর হাতে ভাল ওর হাতে মন্দ হবে, তিরিক্ষি মেজাজের তীর তুণ থেকে ছুঁড়েই দেয় সবিতা।

আর্ট, বুঝলে আর্ট। সংসারে সব কিছুতেই আর্ট লুকিয়ে আছে। শিল্পকলা। সে তুমি চা বানানো, রান্না করা, কথা বলা, ঝগড়া করা—যাই করো না কেন, সবই ওই আর্ট। সব কিছুর আলাদা আলাদা অথচ নিজস্ব শিল্পকলা আছে।

কাচকলা আছে। পাগলের প্রলাপ না বকে বাজারে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো, ঠকাস শব্দে চায়ের কাপ ডাইনিং টেবিলের উপর রাখে সবিতা। সঙ্গে দু'টো ক্রীম ক্রাকার বিস্কুট। চায়ের কাপ রাখা তো নয় একেবারে ক্রাকার ছোড়া—মনে হয় পবিত্রের।

আহা তাই যদি পারতাম, মনে যাই হোক না কেন, মুখে প্রকাশ করে অন্য ভাব। ভাবসাগরে ডুব দিয়ে আপাতত ওম্ শান্তির অরূপরতন খোঁজার চেষ্টায় চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবায় পবিত্র। চোখ বন্ধ করে আমেজ পান করে নেয়।

কী?

রামচন্দ্রের মতো উদ্ধার করতে। তুমি যদি অহল্যা হতে! পাষানী অহল্যা! আমার পবিত্র (নামেও যে আমি পবিত্র) পদস্পর্শে তোমাকে—

তাই তো চাও তুমি। আমি পাষাণ হয়ে থাকি আর ঝাটা লাথি খাই—উল্টো বুঝে চিৎকার করে সবিতা।

আমি কি সে কথা বলেছি—

বলোনি? বলতে আর কী বাকি রাখছো? এই তো সেদিন বললে আমার মুখে সাইলেন্সার লাগানো দরকার। ছেলেমেয়েগুলোরও বলিহারি। অমনি হুক্কা হুয়া

রা—তুমি ঠিক বলেছ বাপী। মায়ের টোনের একটা টিউনিং করা দরকার। বড্ডো বেশি সুফার উফার হয়ে গেছে। ইক্যুয়ালাইজার কাজ করছে না। দরকার বাস কন্ট্রোলের।

বাবা! ঠিক ঠিক মনে রেখেছ তো দেখছি। পড়াশুনোয় তো এমন ছিলে না, চোখের কোলে হাসি জমিয়ে উত্তর দেয় পবিত্র।

তোমাদের সব ব্যবহার মনে রাখতে হয়। টেপ করে রাখতে হয়। নইলে পস্তাতে হয়। আমিও শেষ দেখবো। সব দেখে শুনে তবেই ছাড়বো—তিন সত্যি বলার প্রতিজ্ঞা করে সবিতা।

ছেলেমেয়েরা কি আর তোমাকে অসম্মান করার জন্যে বলেছে? ওরা তো মজা করেছে—শেষ চুমুকে কাপ নিঃশেষ করে পবিত্র।

সে তো তুমি বলবেই। ছেলেমেয়েদের কোলে ঝোল টানবে। আজ আমার সঙ্গে মজা করছে। কাল করবে তোমার সঙ্গে। পরশু পড়শী আর তারপরের দিন স্কুলে দিদিমণি মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে। যেমন বাপ তেমনি শিক্ষাই তো পাবে, জ্বলন্ত গ্যাস স্টোভের বুকে কড়াই চাপিয়ে রিফাইন তেল ঢালে সবিতা। সকালের জল খাবার—লুচি বানাতে হবে যে।

ভুল বললে!

মোটেও না! ভবিষ্যতে মিলিয়ে দেখে নিও—

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হাতে খড়ি হয় মায়ের কাছে। মিনু বিনুরও তাই হয়েছে। ভালো কিছু শিখলে তোমার কাছেই শিখেছে আর খারাপ হলে তো—আবার একটু ঘেঁটে দিতে চায় পবিত্র। মজার রসে কড়া পাক দিয়ে পাকিয়ে দিতে চায় মান অভিমানের শিল্পকলা।

তা নিজে তো ভালো, ভালো শিক্ষা দিলেই পারো। কই কখনও তো বলতে শুনি না—আয় বিনু অঙ্ক বইটা নিয়ে আয়। মিনু দেখি তোর ইংরাজী বইটা—ভেংচি দিয়ে পবিত্রের গলা নকল করার চেষ্টায় প্রাণান্ত হয় সবিতা। ঠিক তখনই গলার কাছে কফ আটকে শুরু হয় কাশির দমক।

ষাট ষাট! দৌড়ে এসে মাথায় ফুঁ দেয় পবিত্র, কেউ নাম করছে বোধ হয়।

কি হলো গো বৌদি? সাতসকালে অমন চোখ উল্টে কাশতে লেগেছ কেনো? ও দাদাবাবু, দাইড়ে দাইড়ে ধম্মো না দেখে জলের ছিটে দাও। হৃদপেণ্ডটা যে কফের সঙ্গে উঠে আসতে চাইছে—কথার তোড়ে পবিত্রকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে সেবাদাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ছবির মা। ঠিকে ঝি হলেও সবিতাকে ভালোবাসে বোনের মতো। কিন্তু পবিত্রকে ততোটা পছন্দ করে না। কেন করে না, কে জানে? জানে অবশ্য একজন—সে সবিতা। দাদাবাবুর প্রতি ছবির মায়ের হাবভাব দেখে একদিন খোলামেলা জিজ্ঞেস করেছিলো সবিতা—হ্যাঁরে! দাদাবাবুর সঙ্গে অমন

খিটির মিটির করিস কেন?

খিটির মিটির করবো ক্যান? আমরা ঝি চাকর। দাদাবাবু হলো গ্যে মনিব। মনিবের সঙ্গে খিটির মিটির করলে কি আর ঝি চাকরের চাকরী থাকবে, না থাকা উচিৎ? উল্টে প্রশ্ন ঝেড়ে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলো ছবির মা।

না, না আমার কাছে লুকোস নে। খোলসা করে বলে ফেল, একদলা নলেনের ঝোলা গুড় ছবির মায়ের রুটির থালায় ফেলে আদর ছড়িয়েছিলো সবিতা। ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে অনেক খবর পাওয়া যায়। ঘরের খবর, বাইরের খবর, হাড়ির খবর, নাড়ির খবর—অনেক অনেক খবর।

তুমিও যেমন! নুকোবো কেন? মাথা নিচু করে চোখ এড়িয়েছিলো ছবির মা।

দাদাবাবু কি করে তুই জানিস তো? চোখ গোল করে তর্জনী উঁচিয়েছিলো সবিতা—মাষ্টারি, মানে ছাত্র পড়ায়। দাদাবাবু মাষ্টার হলে আমি হলাম মাষ্টারনি। মাষ্টারের চোখ তবুও ফাঁকি দেওয়া সহজ—মাষ্টারনির নয়। বল, দাদাবাবুর সঙ্গে অমন ব্যবহার করিস কেন? আজ তোকে বলতেই হবে।

সে ভারি নজ্জার কথা গো! গুড় মাখা রুটি মুখে দিয়ে লালে লাল হয়ে গেছিলো ছবির মা।

লজ্জার কথা? অবাক হওয়ার সীমানা ছাড়িয়েছিলো সবিতা। ছিঃ ছিঃ শেষ পর্যন্ত একটা বুড়ি ঝিয়ের সঙ্গে? ভাবতেই বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছিলো সবিতার—ওই তো কালো কুচকুচে লোল চামড়া সার অসার শরীর? সেই শরীর ঘিরেই মোহ? কেন বাপু, তোমার নিজের বউটা কি গায়ে গতরে যৌবনে কিছু কম আছে? দু'দুটো ছেলেপুলে হয়ে যাওয়ার পরেও এমন টানটান শরীর স্বাস্থ্য ক'টা বউয়ের আছে? দিনে রাতে যখন চাইছো, যেভাবে চাইছো—খামতি তো কিছু রাখছি না—ভাবতে ভাবতে ঝিম হয়ে উঠেছিলো সবিতার মাথার ভিতরের সব কটা কোষ—তবুও ছুকছুকানি? ঝি-চাকরের শরীরের উপর নজর? মানুষ পলিগ্যামি—কথাটা বার বার শুনেছে পবিত্রের নিজের মুখে, তাই বলে ঝি চাকরের প্রতি আসক্তির কথা তো জন্মেও শোনেনি সবিতা। তাছাড়া তুমি মাষ্টার—ঘৃণায় কুঁকড়ে গেছিলো সবিতা—ওরা ঝি চাকর। বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজকম্মো করে নিজেদের সংসার ধম্মো চালায়। কাজের সুবাদে ওদের দরজা তো বন্ধ নেই কোথাও। আমলা থেকে শুরু করে পিওন পর্যন্ত—ওদের অনায়াস গতির খামতি নেই। তোমার নামে যদি পাঁচখানা করে গল্প ফেঁদে পাঁচ কানে ঘোরায়? তখন তুমি কোথায় যাবে? ছেলেমেয়েরা বড়ো হচ্ছে—বাপের কীর্তিকলাপ শুনলে...।

কি ভাবতিছ? উদাস সবিতাকে ঝটকা দিয়েছিলো ছবির মা।

ভাবছি আমার কপাল! ছবির মায়ের উপর রেগে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো সবিতার। কিন্তু না—তবুও মুখে টু শব্দ করতে পারেনি। এসব কেসের তদন্ত ঠাণ্ডা

মাথায় করতে হয়। মাথা গরম করলেই কেচে গণ্ডুস হয়ে বিগড়ে যায় কেস। পবিত্রের কথা বাদ দিয়ে ছবির মায়ের চিন্তা শুরু করেছিলো সবিতা—একপাল ছেলেপুলের মা হয়েও জ্বালা কমেনি একটুও। সেই জন্যেই বোধ হয় বরটা পালিয়েছে। পালিয়েছে না মরেছে সে খবর অবশ্য কেউ বলতে পারে না। নানান জনে নানান কথা বলে। চুরি বিদ্যে জানা ছিলো ছবির বাপের। রিকসা চালানো ছেড়ে সেই বিদ্যেই নাকি জাহির করা শুরু করেছিলো। সবিতা অতশত জানে না, জানার দরকার নেই—ইচ্ছেও না। পাড়ার পাঁচটা বউ গল্প করে তাই শুনেছে। তাছাড়া ছবির বাবাকে কোনওদিন চোখেও দেখেনি। নামকরা ইস্কুলের নামকরা মাষ্টারমশাইয়ের বউ সে। ঝি চাকরদের অতশত খবরে তার কি দরকার? কিন্তু দরকার হয়েছিলো। পবিত্রের সম্বন্ধে এমন সব কথা শুনলে খবর জানার দরকার হবে না? না, এসব সহ্য করা যায় না—সহ্য করা উচিৎও নয়। সবকিছু ইনিয়ে বিনিয়ে জেনে নিয়ে জবাব দিতে হবে—বিদেয় করতে হবে অমন বেহায়া বেলাল্লা ঝি-চাকর। সুতরাং গলা নামিয়ে ছবির মায়ের ঝটকা লাগানো প্রশ্নের উত্তরে মৃদু মোলায়েম প্রলেপ ছড়িয়েছিলো সবিতা—ভাবছি তোর কথা।

আমার আবার কথা কি গো? আমার কথা সব ঘর মোছা ন্যাতা হয়ে গেছে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলো ছবির মা।

দাদাবাবু বুঝি তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে? সরাসরি জানতে চেয়েছিলো সবিতা।

বলো কি গো বৌদি! দাদাবাবু করবে খারাপ ব্যাভার? হা হা করে উঠেছিলো ছবির মা।

তবে যে বলছিলি....

কী? কী বলছিলাম?

ওই যে লজ্জার কথা।

সে অন্য ব্যাপার। দাদাবাবুর মতো অমন মানুষ ভূসংসারে ক'টা আছে—সবিতার কথা কানে না তুলেই বলার ধুমকিতে আপ্লুত হয়েছিলো ছবির মা—তোমার কপাল ভালো গো বৌদি, দাদাবাবুর মতো সোয়ামি পেয়েছিলে। যা ছাঁড় বেছাড় বলো তুমি—সবই তো মুখ বুজে সহ্য করে। ছবির বাপ হলে ঠেঙিয়ে বেন্দাবন দেখিয়ে ছাড়তো—

চুপ কর! তোর আর দাদাবাবুর হয়ে ওকালতি করতে হবে না—এক ধমকে ছবির মাকে থামিয়ে দিয়েছিলো সবিতা। মনে মনে বুঝেছিলো—ঝি-চাকরদের বেশি লাই দিতে নেই। মাথায় চড়ে বসে। মনিবের দাম্পত্যে মাথা গলানোর অধিকার তো সবিতা দেয়নি। আসল কারণ যে অন্য। মজে আছে যে! কিন্তু কখন? ভাবনার কূল কিনারা হাতড়েছিলো সবিতা--ছেলেমেয়েদের ইস্কুল টিউশানিতে নিয়ে যাওয়া

ছাড়া সে তো বাড়ি ছাড়া হয় না কখনও। আর ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ফস্টি নষ্টি? না, এতো সহজে মাথা গরম করে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। নাও ভাসিয়ে ধীরে ধীরে ছলাৎ ছল বৈঠা বেয়ে চলতে হবে স্রোতের উজানে, নইলে নদীর ওপারে পৌঁছাতে পারবে না। অমায়িক ব্যবহার ঢেলে সব কিছু বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—কঠিন কঠোর সিদ্ধান্ত! হয় বউ অথবা ঝি। দুই নৌকোয় পা রাখা চলবে না। দরকার হলে ছেলেমেয়ের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াবে—লজ্জার সংসার ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাবে যেদিকে দু'চোখ যায়।

উকালতি নয় গো বৌদি! সত্যি কথা। পাড়ার পাঁচজনেও দাদাবাবুর সুনাম সুখ্যাতি করে—

তা হলে তুই অমন খিটির মিটির করিস কেন?

সে অন্য কথা—

সেই অন্য কথাটাই তো খোলসা করে বললে পারিস।

নজ্জা করে। ভারি নজ্জা করে—

কেন? লজ্জা করবে কেন? লজ্জা করার মতো—

তুমি যদি কিছু মনে করো।

মনে করার মতো ব্যাপার হলে মনে তো করবোই। কী? স্পর্ধা তো কম নয়—মনে করার মতো পর্যায়ে চলে গেছে? রাগে দাউ দাউ জ্বলে উঠতে ইচ্ছা করেছিলো সবিতার। তবুও নাটকের শেষ দৃশ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হয়। হিংস্র হয়েও অমায়িক হতে হয়। গাছের ডালে বসা কাকের মুখ থেকে মাংস মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিনিয়ে খেতে হলে শেয়ালের মতো প্রশংসা ঢেলে দিতেই হবে।

না, তেমন কিছু নয়। আসলে—

আসলে?

দাদাবাবুকে না দেখতে একেবারে ছবির বাপের মতো। লজ্জায় আঁচলের খুঁট দাঁতে কেটেছিলো ছবির মা—লোকটা যতোই খারাপ হোক আমারে বড্ডো ভালোবাসতো।

মর মুখপুড়ি! যবনিকার ফল শূন্য হওয়াতে খুশি হয়েছিলো সবিতা।

শেষপর্যন্ত বাজারের ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে নেয় পবিত্র। গোটা গোটা মেয়েলি হাতে লেখা সংসারের ফরমায়েস। না, খুব বেশি ফরমায়েস সবিতা করে না কখনও। বারো বছর সংসার করে বুঝে গেছে। বুক চিতিয়ে টিচার্স রুমে মাঝে মধ্যে ঘোষণাও করে—সবিতার মতো অমন হিসেবি সংসারী বউ পাওয়া ভার। তবুও উসকে দেয়। মাঝে মধ্যে একটু খুঁচিয়ে খচিয়ে দেয় বউকে। পবিত্রের সে পবিত্র-দুষ্টুমি বুঝতে পারে না সবিতা। রেগে যায়। দপ দপ দুম দাম জ্বলে ওঠে। বাজারের ফর্দটা হাতের উপর মেলে সেই দুষ্টুমিটাই আবার নতুন করে উগরে

নিতে চায়। তাছাড়া একটু আগে—সাতসকালে গরম খুন্তি ঠুসে দেওয়ার, ফুঁসে ওঠার রহস্য এখনও ফাঁস হয়নি। নেহাত দমকা কাশিতে চাপা পড়ে আছে। সেটাও জেনে নেওয়ার ইচ্ছেয় স্বগতোক্তির উচ্চারণ করে পবিত্র—এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?

কী?

যা ভেবেছিলো—ঠিক তাই। রান্নাঘরে সবিতার কানে পৌঁছে প্রশ্ন হয়ে ফিরে আসে পবিত্রের ফিসফিসানি।

গত সপ্তাহেই তো এককিলো আনলাম—

বস্তুটা কি বলবে তো?

চিনি।

আমি খেয়েছি! সরবত কর, জলে গুলে খেয়েছি, কাশির রেশ গলা থেকে ফুরোয় নি, তবুও ঝাঁঝ ঝরায় সবিতা।

মনে মনে খুশি হয় পবিত্র। লেগেছে। তীর নিশানায় লেগেছে। তবুও মনের খুশি মুখে প্রকাশ করে না—আমি কি তোমার খাওয়ার কথা বলেছি। খাও না যতো পারো। সরবত করে খাও। মুঠো মুঠো চিবিয়ে খাও। আমার কি—কুচো ক্রিমি যখন খোঁচা দেবে তখন বুঝবে। গেলাস গেলাস কালমেঘ আর চিরতার রস খেয়েও কূল পাবে না।

নিজেরই তো ছত্রিশবার চা লাগে। চিনি ছাড়া খেলেই তো পারো।

তাই খাওয়া উচিৎ। চল্লিশ বছর বয়েস হতে চললো—

কতো? কতো বয়েস হলো? চল্লিশ? আসছে জন্মে হবে। মাথায় কালো চুল কটা আছে গুণে বলা যায়।

আজ একটু গুনে দিও তো প্লিজ— রসিকতায় ঝলমল করে ওঠে পবিত্র। হাত রাখে সবিতার কাঁধে।

কি আদিখ্যেতা করছো? ছবির মা বাসন মাজতে নিচে নেমেছে—এখনই এসে পড়বে, বিরক্ত সবিতা এক ঝটকায় সরে দাঁড়ায়।

তোমারও কিন্তু বয়েস কম হলো না সাবি—আটত্রিশ ঊনচল্লিশ তো হবেই, বলতে বলতে নিরাপদ দূরত্বে রান্নাঘরের বাইরে সরে দাঁড়ায় পবিত্র।

একদম কানা করে দেবো! গরম খুন্তির স্যাকাঁয় নোলা ভেঙে ছাড়বো—কথা নেই, বার্তা নেই প্রসঙ্গহীন সকালের সেই ফর্মে আবার ফিরে যায় সবিতা। খুন্তি হাতে তেড়ে আসে রান্নাঘরের দরজায়। বয়সের হিসেবের সঙ্গে কানা করে দেওয়ার সম্পর্ক কোথায়? বয়েস কি ফুলের কুঁড়ি যে চোখে দেখবে? এবার সত্যি সত্যি রাগ হয় বউয়ের উপর। সকাল থেকে কেন যে কানা করে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে কে জানে?

দাও! কানা করে দাও! তুমি তো চাও আমি কানা হয়ে যাই। অন্ধ বোবা হয়ে

যাই—রুখে দাঁড়ায় পবিত্র।

আমি কি তোমাকে কানা করতে চেয়েছি নাকি? ঘাবড়ে যায় সবিতা—দেখতে পাচ্ছো না, সকাল থেকে কি জ্বালাটাই না জ্বালাচ্ছে। অতোই যদি পোষার শখ। বেঁধে পুষলেই হয়—

সবিতার হাতের উঁচিয়ে ধরা খুন্তি বরাবর সিঁড়ির বাঁকে চোখ পড়ে পবিত্রের। চোখাচোখি হয় লাল্টুদের পোষা হুলোটার চোখে। পবিত্রের চোখে চোখ রেখে গোঁফ চুমড়ে কি যেন বলার চেষ্টা করে হুলোটা—মিঁ-এ্যাঁ-ওঁ!

হো হো করে হেসে ওঠে পবিত্র। স্নেহের ভালোবাসার আদরের হাত রাখে সবিতার কাঁধে—সংসারের মানে কি জানো? আবোল তাবোল। হযবরল। ছিলো রুমাল—হয়ে গেলো—বিড়াল। ছিলো ছানা, হয়ে গেল চোখ-কানা।

স্বাধীনতাহীনতায়

স্বাধীনতা হীনতায় স্বামী ছাড়া বোধহয় আর কেউই বাঁচতে পারে না। রাস্তায় যে ধম্মের ষাঁড় ঘোরে, তারও চারপায়ে থপ্‌থপ্‌ চলার স্বাধীনতা আছে। নেড়িটাও সুযোগ বুঝে রান্না ঘরের হুড়কো খোলা থাকলে গেরস্থের হাড়িতে মুখ ডোবায়। পাড়া খেদানো বেড়াল তাড়া খেয়েও ঘুরে দাঁড়ায়, একবার অন্তত গোঁফ চুমরে প্রতিবাদ করে—ম্যাঁ-ও-ও!

কিন্তু সুকুমার?

সে বড়ো ভালোমানুষ। সাতেও নেই—পাঁচেও থাকে না। আগে নেই, ভাগেও না। তবু দুর্ভাগ্য—লোকে তার নিন্দে করে। মন্দ বলে। আসলে লোকেদের এমনিই স্বভাব—কাতর হওয়ার স্বভাব। পরশ্রীকাতর। পরস্ত্রীকাতর হতে দম লাগে। পিঠে শক্ত চামড়ার দরকার হয়। পকেটে রেস্ত লাগে। পটাপট মুখস্থ মিথ্যে বলার ভঙ্গী জানতে হয়। কাতর মনে মন ডুবলে সমূহ বিপদ। ভুবন জোড়া প্রেমের ফাঁদ পাতা থাকলেও ফাঁদ কাটার কাটারিরও অভাব নেই। তাই স্ত্রী-র সঙ্গে শ্রী-র বিনিময় ঘটিয়ে বিশ্রী একটা পাংশুটে হিংশুটে কাতর পরশ্রী স্বভাবের বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে সুকুমারের পড়শীরা।

কেন এমন হয়? কেন এমন হলো?

হবে না কেন! এই তো সেদিনের কথা। তিরিশের কোঠায় পা ছিল সুকুমারের। আর ছিলো ভালো চাকরি (এই ডামাডোলে ভরা বেকারিত্বের বাজারেও, কারণ সুকুমার ছাত্রজীবনে সত্যিকারের সুকুমার ছিলো)। সংসারের লায়াবিলিটি যা কিছু ছিলো সব কড়ায়-গণ্ডায় পালন করে গেছিলেন সুকুমাবের বাবা। ছেলেমেয়ের শিক্ষা দীক্ষা লালন পালন থেকে শুরু করে ইটের পর ইটের বুনোটে ঘর বানানো এবং অবসরের পাওনাগণ্ডায় সুকুমারের দুই দু'টো বোনের পাত্রস্থ করা পর্যন্ত। লোকে বলে নিজের শ্রাদ্ধের টাকাও নাকি ফিক্সড্‌ ডিপোজিট রেখেছিলেন ছেলে আর মায়ের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে। না রাখলেও কি খুব একটা ক্ষতি ছিলো? লায়েক ছেলে বাবার সৎকারের শেষ সৎকাজটুকু কি করতে পারতো না? খুউব পারতো! আসলে মনুষ্য সমাজের স্বভাবই এমনি। ছুঁচ হয়েও চালনির ছিদ্র খোঁজার প্রবণতা।

তখনও সরকারি চাকরির বয়স ষাট হয়নি—আটান্নতেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন সুকুমারের বাবা। তারপর মোটে দু'বছর। প্রাতঃভ্রমণ, বাড়ির উঠোনের ঘাস তোলা, বাজার করা, টিভি দেখা, খবরের কাগজ মুখস্থ করা, বড়মেয়ের শিশু-মেয়ের জন্যে ঝুমঝুমি কেনা, ছোটমেয়ের পুত্রসন্তান কামনায় ঠাকুর মন্দিরে মানত করা ইত্যাদি ইত্যাদি অবসর উত্তর-জীবনের কাজকর্মে ডুবে থাকতে থাকতেই একদিন ডুব দিলেন পরপারের সিন্ধুসাগরে। সাধের সংসারে আহ্লাদের স্ত্রী আর পরকালের সলতে সুকুমারকে রেখে বিলিন হলেন পঞ্চভূতে। সুকুমারের মা বুক বাঁধলেন। ছেলেকে সংসার সাজিয়ে না দিয়ে তিনি হারবেন কেন? হারাবেন কেন?

ব্যস, অমনি বছর ঘুরতেই বিয়ে হয়ে গেল সুকুমারের?

না, মোটেই না! বিয়ে আবার কি—এই তো বেশ আছি। তুমি, আমি আর আমাদের সংসার। মাঝে মধ্যে বিনু রিনুরা আসে। বিনুর মেয়ে এখন পা পা হাঁটি হাঁটি শিখেছে। থপ থপ করে হাঁটে। মুখে আধো বোল মা-ম্-মা! রিনু ক'দিন পরেই ভর্তি হবে নার্সিং হোম-এ। দুই জামাই সনৎ আর রঞ্জয়। দিলখোলা হাসি খুশির চলন্ত বিজ্ঞাপন। তাছাড়া তোমার শরীরে তাকৎ যতক্ষণ আছে, উটকো ঝামেলায় কাজ কি? বিয়ের কথা বলতেই মাকে বোঝাতো সুকুমার।

বলিস কি রে? আমি কি চিরটাকাল হাঁড়ি ঠেলবো? পরকালের কম্মো করবো না? একটু নাম ধাম ধম্মো টম্মো? তোর বাবার কতো ইচ্ছে ছিলো ছেলের বঁউয়ের মুখ দেখার—সে সাধ তো তাঁর পুরণ হলো না। আমি মলে তবে কি তুই—?

না মা, না! বালাই ষাট তুমি মরবে কেন? মরুক তোমার শত্তর—মায়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসির হুল্লোড়ে সব ভাসিয়ে দিতো সুকুমার। মায়ের তর্ক, মায়ের যুক্তি সব। বোনেরা বলতো—দাদা বিয়ে কর। আমরা প্রাণ খুলে আনন্দ করি। ভগ্নিপতিরা পকেটে সব সুন্দরীদের ছবি নিয়ে ঘুর ঘুর করতো সুকুমারের পাশে পাশে—কি যে করছেন দাদা। টুকটুকে একটা বৌদি নিয়ে আসুন। বন্ধু কাম অফিস কলিগ হিমাদ্রী রবিবার সন্ধেয় পারমিতাকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে চলে আসতো সুকুমারদের বাড়ি। পারমিতার বোনের রঙটা একটু চাপা হলেও আঙুল ছিলো চাঁপার কলি, চোখ জোড়া তার পটল চেরা, মুখ পানপাতার আদলে, চুলে কালবৈশাখির ঢল, স্বভাবে একেবারে পাঁকের নম্রতা, বিদ্যেয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঘরে পালটি, বয়েসে মানানসই। বোনের গুণপনার বহর দিদি পারমিতার মুখে শুনতে শুনতে মুখ টিপে হাসতেন সুকুমারের মা। ঘরে বানানো আলু চিপ্‌স গরম তেলে ঢেলে মাথা নাড়াতেন—সুকুর পছন্দ হলে আমি কেন আপত্তি করবো। তাছাড়া বাপু, আমার অতো বাছ-বিচার নেই। চলনসই একটা ভালো বউ পেলেই যথেষ্ট। হিমাদ্রী পিঠে চাপড় মারতো সুকুমারের—কি রে ভিড়বি নাকি আমার শালীর ভরা

ঘাটে? ধুস! কি যে বলিস, লজ্জায় লালচে মুখ খয়েরী হতো সুকুমারের। তবুও ছাড়াছাড়ি ভুলে যেতো নাছোড় হিমাদ্রী—আমার বউয়ের চেয়ে তিন বছরের ছোট। এখনও কচি আছে, দড়কচা মেরে যায়নি। স্বামীর কথা শুনে রাগে মুখ ঘোরাতো পারমিতা—কি যে বলো, মুখের কোন লাগাম নেই। মাসিমা শুনলে কি মনে করবেন? খারাপ কিছুই ভাববেন না, বউয়ের চোখে চোখ রাখতো হিমাদ্রী—ভাববেন বন্ধুর বউয়ের মতো অমন ঝুনো তো হবে না নিজের ছেলের বউ। সে কথা শুনে পারমিতা ফুঁসে ওঠার আগেই সুকুমারের কানের দরজায় মুখ নামাতো হিমাদ্রী—এর পরে বিয়ে করলে যে বন্ধু ভাগ্যে পুত্র লাভের কথা ভাবতে হবে। ভালগার! তুমি সত্যি সত্যিই একটা ভালগার। নিজের শালীর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে লজ্জা করে না? চিপ্‌স চেবানো প্লেট তুলে 'মার ঝাড়ুমার' ভঙ্গীতে টানটান হতো পারমিতা। কিন্তু হিমাদ্রী? না, একদম বিচলিত হতো না। উল্টে বুঝিয়ে দিতো—চোরা না মানে ধম্মের কাহিনী। বলতো—আমি কতো ভাগ্যবান বলো! একদিকে শালী অন্যদিকে বন্ধুপত্নী, চুটিয়ে পরকীয়া করার এমন লাইসেন্স আর কোথায় পাওয়া যাবে? আহ! হিমাদ্রী! কি হচ্ছে বলতো? প্রতিবাদে মুখর হতো সুকুমার। কী আর হবে? ফ্যাঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ার ভান করতো হিমাদ্রী।

পারমিতার বোনের সঙ্গেই বুঝি শেষকালে বিয়ে হলো সুকুমারের?

না, মোটেও না। বিয়ে দূরে থাক, একটু ইয়েও হলো না। চেষ্টার ত্রুটি করেনি হিমাদ্রী-পারমিতা। জলে স্থলে জঙ্গলে বেড়ানো কিংবা পিকনিকের অছিলায় ছলে বলে কৌশলে অপরাজিতাকে সুকুমারের কাছে পিঠে ঠেলেছিলো অনেক অনেকবার। কিন্তু সুকুমার অপরাজিত থেকেছে—ভীষ্মের ভূমিকায়। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পরে হতাশ অপরাজিতাও রায়' শুনিয়েছিল দিদি-জামাইবাবুর এজলাসে—সারাজীবন কুমারী থাকতে হলেও অমন স্থবির একটা শহীদ বেদীকে বিয়ে করবো না।

সুকুমার কি সত্যিই স্থবির? অনড় শহীদ বেদী?

ঠিক তা নয়—তবে বিয়েতে কেমন যেন একটা অনীহা ছিলো সুকুমারের। হয়তো দায় দায়িত্ব এড়ানোর ইচ্ছে। মায়ের ছায়ায় তো আর মন্দ চলছিলো না। শুধু শুধু উটকো ঝামেলা পোহাতে যাবে কেন?

বিয়ে কি উঠকো ঝামেলা? সমাজের অমোঘ নিয়ম। তবে নিশ্চয়ই সুকুমার অসুস্থ ছিলো। অপারগ ছিলো।

সে সন্দেহ যে মা বোন ভগ্নীপতি হিমাদ্রী-পারমিতা অপরাজিতাদের হয়নি তা নয়। তবু মুখ ফসকে সরাসরি কেউ সুকুমারের মনে ফোস্কা তৈরি করতে চায়নি। ঠারে ঠ্যোরে বুঝিয়েছে কেউ কেউ। তবুও ভবী সুকুমারকে ভোলার পাত্র করে তুলতে পারেনি। সংসারে সবাই তো আর সমান তালে চলে না। অনেকে বিয়ে

করে ঠিকই, কেউ কেউ আবার করেও না। তারা এক একটা কেউকেটা ভাব নিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে। বিয়ে না করে সুকুমারও নিজেকে কেউকেটা ভাবতো। বলতো, বিয়ে করা ছাড়াও, জীবনে অনেক কিছু করার আছে।

ওঃ! সুকুমার বুঝি সমাজ সেবা করতো? কেমন ছিলো তার শৈশব কৈশোর যৌবনের দিনগুলি?

শৈশব কৈশোরে সুকুমার ছিলো খাঁটি সুকুমার। মন দিয়ে পড়াশুনো করতো। বাবা-মা মাষ্টারমশাইদের কথা শুনতো। খারাপ রেজাল্ট ছিলো না কোনও বছর। কলেজেও অনার্স ছিলো। একটু ছাত্র রাজনীতি করতো। তবে আহামরি কিছু না। আণ্ডায় গণ্ডা মেলানো গোছের। তবে পাড়ার ক্লাবে দু'একটা কাজ করেছিলো বটে সুকুমার।

কী? কী কাজ করেছিলো?

এমন কিছু নয়। বছরে একবার 'রক্তদান' শিবিরে খুলতো। আর বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে, চাঁদা তুলে, ঊনিশ পয়সায় লটারীর টিকিট বেচে একটা লাইব্রেরী করেছিলো—বিবেকানন্দ পাঠাগার। আর কি করতো সুকুমার? অফিস ফেরতা এসে বসতো ক্লাবঘরে। আলোচনা করতো, ফুটবলের মাঠ চাই—ক্রিকেটের টিম চাই—ব্যায়ামের আগার চাই—পাড়ায় পুজোর মণ্ডপ চাই—ওয়ার্ড কমিটিতে প্রতিনিধি চাই—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মশাহীন ড্রেন চাই—চকচকে পিচ বাঁধানো সড়ক চাই—

বাহ! বাহ! মোদ্দা কথা সুকুমার তো পাড়ার নেতা ছিলো?

ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম। দেয়ার ওয়াজ অ্যা সুকুমার—। তবে নেতা ঠিক নয়। নেতা নেতা ভাব ছিলো। তারপর কি যে হলো, সব ওলট পালট হয়ে গেল। পালটি খেয়ে তেজের ডালটি গেল ভেঙে।

কী হলো?

কবি হয়ে গেল সুকুমার। ক্লাবের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলো 'দেয়াল' পত্রিকা।

কিন্তু সুকুমার কবি হবে কেন? সুকুমার তো ভালো ছেলে ছিলো।

কেন, ভালো ছেলেরা বুঝি কবি হতে পারে না? কবিতা লিখতে পারে না?

না না, তা নয়। কবি মানে তো কেমন উদাস উদাস ভাব। বাউল বাউল মন। ভাবনার ভাবে বিভোর। ঢোল ঢোল পাজামা পাঞ্জাবি। কাজী নজরুল ইসলামের মতো বাবরী চুল। গোল গোল চোখে নেশাখোরের ঢুলু ঢুলু চাউনি। হাতে ডাইরী—কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা। কথা কম—বাতেলা বেশি। সবজান্তা দাদা। পৃথিবীতে কবিতার একমাত্র বোধ্যা। পায়ে চটি, গালে দাড়ি। কলেজের যুবতীদের মুঠোয় কলজে দানের ইচ্ছে আর অফিস গামিনী পদ্মিনীদের বিছানায় বিছানোর বাসনা। সুকুমার তো তেমন ছিলো না। তবে কি তার হৃদয়ে কোনও চপলার চপ্পলাঘাত

পড়েছিলো? কিংবা নিদেনপক্ষে কোনও হাতছানি? অপরাজিতা ছাড়া অন্য কোনও ফুলের নাম গন্ধ ছড়ানোর চেষ্টা করেছিলো কেউ?

না, সে খবর অন্তত পড়শীদের জানা নেই। তাছাড়া তেমন কিছু হলে কেউ না কেউ তো টের পেতো। এ পাড়ার কতো মেয়েই তো এ বাড়ি ছেড়ে ও বাড়ি গিয়ে উঠেছে। অলিতে গলিতে সন্ধেবেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড়ের সঙ্গে চুমুও খেযেছে। তারপর একদিন চুমু হজম হয়ে যেতেই কনে বউটি সেজে বাপ-মায়ের বাধ্য মেয়ের মতো পাড়ি দিয়েছে দূরপাল্লার কোনও শ্বশুরবাড়িতে। আর ছেলেটা? কিছুদিন গলির মুখে দাঁড়িয়ে সন্ধের স্মৃতি রোমন্থন করে করে হয়রান হয়ে অন্য কোনও পাণিগ্রহণ করে ব্যোমভোলার সংসার সাধনে মেতে আছে, দোষ কারও নয় গো—ভাবনায় বিভোর হয়ে।

সেই তখন থেকে শুধু জাবর কাটা চলছে। জবর খবরের নাম গন্ধও নেই। নাড়ির খবর, হাঁড়ির খবর, বাসি খবর, খাস খবর যদি কিছু থাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। এমন যে ভালো মানুষ সুকুমার—পাড়ার জন্যে এতকিছু করলো, তাকে নিয়েই বসলো ওয়ার্ড কমিটি? নালিশ সালিশ কাজির বিচার চললো? কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না?

হ্যাঁ, প্রতিবাদ তো করেছিলো। নইলে সুকুমার কি বহাল তবিয়তে পাড়ায় বাস করতে পারতো? ওয়ার্ড কমিটির তাবৎ মাতব্বর, কাজির কাজি, লাটের বাটদের দল সেই যে পিঠটান দিলো তারপর আর বিচারসভা বসানোর চিন্তাও করেনি এতদিনে।

অন্যায়টা কি করেছিলো সুকুমার? অপরাধের বহর ছিলো কতটা?

সাংঘাতিক অন্যায়! ঘোরতর অপরাধ করেছিলো সুকুমার। আরে বাপু, শখ যখন ষোল আনাই ছিলো তখন অতো ভড়ং ভাংটামী করার দরকার কি? আর পাঁচটা মানুষের মতো বয়সকালে সময়ের তালে তাল মিলিয়ে চললেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো। সমাজের নিয়ম মেনে চলাটাই তো নিয়ম। অনিয়মটা অপরাধ, জঙ্গীপনা।

একটু খোলসা করে বলা যায় না?

যাবে না কেন! সুকুমার শেষপর্যন্ত বিয়ে করলো।

বাহ! বাহ! ব্রেভো! এসো চাঁদ, আকাশে এসো! দিল্লির লাড্ডু খেয়ে আমরা কেন একা পস্তাবো—তুমিও সঙ্গে এসো, রঙ্গে রসে ভঙ্গে বিভঙ্গে এই বঙ্গের সংসারে থাকবে এসো।

চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করলো সুকুমার। আড়ংঘাটার মেয়ে। সুকুমারের চেয়ে বছরখানেকের বড়ো বই ছোট নয়। তায় দিদিমনি। গ্রামের কোনও প্রাথমিক

ইস্কুলে। রানাঘাটে কোন এক আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়ে পরিচয় এবং পরিণতিতে পরিণয়।

সেই পরিণয়ের পরিণতি?

সে মোটামুটি সুখের—

ধুস! তবে আর এতক্ষণ সুকুমারের চরিত্রহননের ময়দা মাখামাখি করে ফয়দা কি হলো? মুখ ব্যথা করা আর সময় নষ্ট ছাড়া?

হবে, হবে! আস্তে আস্তে সব হবে। কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতা—জিত্‌তে হলে ধৈর্য্য চাই।

বেশ! বেশ!

ফুলশয্যার রাত্তিরে সেই যে সুকুমার ঘরের কপাট আটকে নিজেকে ঘরমুখো করলো, আর কোনওদিন ফিরেও দেখলো না বাইরের জগৎটাকে। ক্লাব, লাইব্রেরী, রক্তদান, খেলার মাঠ, ক্রিকেট, ফুটবল এমনকি কবিতা লেখাও তুলে দিলো শিকেয়। হিমাদ্রী পারমিতারা তো আগেই কেটে পড়েছিলো। এবার সবাইকে কাটিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলো শামুখখোলে। না গুটিয়ে উপায় কি? সেই সাতসকালে পাঁচটা চল্লিশের ট্রেন ধরতে হয় নমিতাকে। বয়েস হয়েছে মায়ের। গরমকালে তবুও সকালের ফরসা চেহারা নজরে পড়ে। শীতকালে তো তখন মাঝরাতের বিভীষিকা। সুতরাং চক্ষু লজ্জায় ছুটি দিতে হয় মাকে। অ্যালার্ম ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজলেই দড়াম করে বিছানা ছাড়তে হয় সুকুমারকে। চায়ের জল ফোটাতে হয়। পাতা ভেজাতে হয়। ছাঁকনিতে ছেঁকে কাপ ভরে মেলে ধরতে হয় বউয়ের ঠোঁটে। তবেই ঘুম ভাঙে নমিতার।

তারপর? তারপর?

সুকুমার যতোক্ষণে টিফিন কৌটোয় পরোটা আলুভাজা ভরে ততোক্ষণে বাথরুম সেরে তৈরি হয়ে নেয় নমিতা। রাতের পোষাক—নাইটি কিংবা সায়া শাড়ি, ব্লাউজ আর নিচের পোষাক টোষাক বেডরুমের কোণে কেঁৎরে ফেলে সদর দরজা হাট করে নমিতা। পিছনে সুকুমার। কাঁধে ঝোলে হট-পট। ডানহাতে দোলে জলের বোতলের থলি, বা হাতে দুধের ক্যান। নমিতাকে গাড়িতে তুলে সোজা রঘুবীরের খাটাল—নমিতার পাকস্থলী যে ভেজাল সহ্য করতে পারে না।

বিয়ের আগে তো অতো ভোরে সুকুমারকে খাটালে দেখেনি কেউ কোনদিনও।

তখন যে হাবুলের দুধ ছিলো। প্লাস্টিকের ঠোঙায়। এখনও যোগান আছে—তবে মায়ের জন্যে। চায়ের জন্যে। টুকটাক পিঠে পায়েসের জন্যে।

আহা! বেচারি! ডেয়ারির দুধে কি বুড়ি বয়েসের পুষ্টি হয়?

খাটাল থেকে ফিরে নমিতার রাতের পোষাক ধোওয়া কাচা। জল নিঙড়ে

ছাদের দড়িতে টান টান মেলে শুকতে দেওয়া এবং তারপর একবাটি মুড়ি (চানাচুর, পেঁয়াজ কিংবা কাঁচা তেল ছাড়া) চিবুতে চিবুতে খবরের কাগজের হেডিং পড়ে নেওয়া সুকুমারের সকালের ঋকবেদ। বাজারে অবশ্য রোজ যেতে হয় না, কারণ অনিল আসে বাড়ির উপর। ভ্যান রিক্সায় সবজীর পসরা সাজিয়ে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে উচ্ছে বেগুন পটল মুলোর সওদা সেরে কুটনো কাটতে বসে যায় সুকুমার। কখনও কখনও বাটনা বাটতেও দেখা গেছে—এই যেমন লঙ্কা পেঁয়াজ পোস্ত।

আর সুকুমারের চাকরি?

আগে ছুটতো ন'টা বত্রিশের ট্রেনে। এখন এগারটা সাতচল্লিশ ধরার চেষ্টা করে। এগারটা সাতচল্লিশ ফেল করলে ফিরে আসে স্কুল ফেরৎ নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে।

মাইনে কাটা যায় না?

সে খবর বাপু জানা নেই। পড়শী, আদার ব্যাপারী। জাহাজের সংবাদ জেনে লাভ কি? তাছাড়া সুকুমারের মাইনে কাটা গেলে কি কেউ পূরণ করে দেবে? দিদিমনিগিরি করে নমিতাও তো কিছু আয় করে—না কি?

একটা পুরুষলোকের অফিস কামাই করে সারা দুপুর ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে? কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া, বেকার বেকার মনে হয় না নিজেকে?

পড়ন্তবেলায় বিপরীতের মর্ম বোঝা অতো সহজ নয়। একে মা মনসা তার উপর ধুনোর গন্ধ। দিদিমনি স্ত্রী বলে কথা। ব্যাচেলারশিপের কনফারমেশন পেতে পেতে হড়কে যাওয়া। বেতনহীন ছুটিকাটা গেলেও অফিস থাকবে। নমিতাহীন দুপুর একবার পার হয়ে গেলে পরের দিন আর ফিরে আসবে না। (এমন সব ভাব করে যেন কোনওদিন বউয়ের সঙ্গে নির্জন দুপুর কাটায়নি)। এতদিনের জমে থাকা না বলা উপন্যাস আর কবে শোনাবে? তাছাড়া নমিতারও তো একটা সঙ্গ দরকার। পুতুলখেলার সঙ্গী। একটা সংসারের শিকড় উপড়ে উঠে এসে আর একটা সংসারের টবে পুঁতে সার মাটি চিনতে সুকুমারের পরশ তো অবশ্যই দরকার। অফিস গেলে বিকেল থাকে না। সন্ধে ফুরিয়ে যায় ট্রেনে বাসে ঝোলার কসরত করতে করতে।

সুকুমারের বিকলে বুঝি খুব ঘন? বসন্তের গানে আকুল?

হবেই তো! মা যে তখন হরিতলায় চলে যান—গ্রন্থপাঠ শুনতে। রান্নার বই খুলে সুকুমার তখন এটা সেটা অখাদ্য সুখাদ্য বানাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। নমিতা শিক্ষিকার নির্দেশ দেয়। সুকুমার বাধ্য ছাত্র হয়ে নির্দেশ পালন করে। ছবির মা কামাই করলে ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে। শুকনো শাড়ি কাপড় জামা প্যান্ট তুলে পাট করে আলনায় রাখে। কাজ কি সংসারে কম? হাতের কাজ ফুরোলে ফুরফুরে

হওয়ার বাসনায় নমিতার উঁকি দেওয়া মন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু গঙ্গার পাড়ে যেতে হয় সুকুমারকে। চিনে বাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে স্বপ্ন দেখতে এবং দেখাতে হয়। ছেলে না মেয়ে—কী সন্তান নমিতা গর্ভে ধারণ করবে তাই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। নর্মাল হবে না সিজার ভেবে শিউরে উঠতে হয়। মেটারনিটি আর পেটারনিটি ছুটি ফুরোলে নটে গাছ না মুড়িয়ে যায় তার পরিকল্পনায় কতদিন কনডোম না পিল চালাতে হবে ভাবতে হয়। বিবাহিত জীবনে ভাবনার কি শেষ আছে?

বাব্‌বা! আমাদের কালে অতো শত ছিলো না।

ছিলো, ছিলো! সবকালেই ছিলো। ছিলো না শুধু পরিকল্পনা।

কিন্তু ওই যে বলছিলে নালিশ সালিশ? প্রতিবাদ ওয়ার্ড কমিটি—?

সে এক বিদিকিচ্ছিরি কেচ্ছা! সুকুমারের পড়শী যতো বউ-ঝিদের নালিশের বহর! স্বামীদের কানের কাছে দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান রামায়ণ মহাভারত বাইবেল কোরাণ পাঠ—সুকুমারদাকে দেখে শেখো। স্বামী হওয়া উচিৎ সুকুমার ঠাকুরপোর মতো! বউকে ভালোবাসতে, যত্ন করতে শিখতে হয় সুকুমারের কাছে। লজ্জা করে না ঠ্যাং-য়ের উপর ঠ্যাং তুলে হুকুম চালাতে—সুকুমার ঠাকুরপোর পা ধুয়ে জল খেয়ে এসো। বউকে কেমন যত্নআত্তি করতে হয় দেখে এসো—

বউ কি অতিথি যে যত্ন আত্তি করতে হবে?

নালিশ তো সেইজন্যেই। ঘুম থেকে উঠে ঘুমুতে যাওয়া ইস্তক বারো মাস তিনশো পয়ষট্টি দিন সুকুমারের জন্যে খোঁটার খোঁচা খেতে কোন গেরস্থ স্বামীর ভালো লাগে? একদিন তো অমিতবাবু সুকুমারকে ডেকে বলেই দিলেন—বউ নিয়ে অমন আদিখ্যেতা করো না তো বাপু। আমাদেরও বউ আছে, বুঝেছ!

কেন, অমিতবাবু এসব বললেন কেন সুকুমারকে?

না বলে উপায় কি! মুখোমুখি বাড়ি। অমন সব আদিখ্যেতার কাণ্ড ঘটালে পিত্তির ভাণ্ড জ্বলবে না? নমিতাকে পাশে ঘেসটে নিয়ে সাতসকলে যাচ্ছিলো বাজারে। মুখোমুখি চোখাচোখি কাকলির সঙ্গে।

কাকলি বৌদি? মানে অমিতবাবুর স্ত্রী?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! সকাল সকাল সেজেগুজে কত্তা গিন্নি বুঝি দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছো। সাদামাঠা কৌতুহল ছিলো কাকলির জিজ্ঞাসায়। না দিদি, দক্ষিণেশ্বর যাবো কেন, যাচ্ছি হার্ডওয়ারের দোকানে, চোখ উল্টে জবাব ঝরিয়েছিলো নমিতা। কেন? হার্ডওয়ার কেন? সুকুমার ঠাকুরপো বুঝি কম্পিউটার কিনবে? ছেলেমেয়ের দৌলতে কাকলি যে ততোদিনে কম্পিউটর হার্ডওয়ার সফটওয়ার, ই-মেল, ইন্টারনেট শব্দগুলো শুনে শুনে মুখস্থ করে ফেলেছে।

—মেয়েদের যেমন স্বভাব। তেমনিই কাকলিরও কৌতূহলের পর কৌতূহল।

কম্পিউটার? কম্পিউটার কেন? অবাক নমিতা সুকুমারকে ছেড়ে কাকলির পাশে দাঁড়িয়েছিলো—কাল থেকে একটা কাঠের মিস্ত্রি লাগাবো, তাই পেরেক স্ক্রু কবজা কিনতে যাচ্ছি। নমিতার জবাবে কাকলি তো থ—কি গো ঠাকুরপো, শাড়ি গয়না ছেড়ে শেষপর্যন্ত পেরেক পছন্দ করতে বউকে নিয়ে বাজারে চললে? সত্যি নমিতা! কপাল করেছিলে ভাই। নামেও সুকুমার, কাজেও সুকুমার স্বামী তোমার।

তারপর? তারপর?

তার আর পর নেই। বরং বলতে পারো শুরু। কাকলির পটাং চ্যাটাং ব্যাক্যির শুরু। নাজেহাল অমিতবাবু বাজার ফেরৎ সুকুমার শুনিয়ে দিলো যুৎসই অযুত কথা। ঠুকে দিলো নালিশ ওয়ার্ড কমিটির দরবারে। হয় সুকমার বউ নিয়ে পাড়ায় থাকুক, নয়তো খদ্দের দেখে দিন, বাড়ি বিক্রি করে আমরা পাড়া ছাড়ি। অমিতবাবুর রা-এ রা জুড়ে দিলেন একরাশ পড়শী। সহ্যের একটা সীমা আছে মশাই—অত্যাচারিত গৃহস্বামীরা এবার পথে নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। প্রয়োজনে সব ধর্মের ঘট ভেঙে চুরে দিয়ে ধর্মঘট ডাকবে। মিছিল করবে, স্লোগান দেবে—দুনিয়ার স্বামী এক হও! এক হও!

কিন্তু তা তে তো অশান্তি আরও বাড়বে। স্ত্রীরা ডিভোর্স চাইবে। খোরপোষ দাবি করবে। ছেলেপুলে নিয়ে ড্যাং ড্যাং বাপের বাড়ি চলে যাবে। আর স্বামীরা সব অনাথ হয়ে ঘরে ঘরে অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা হবে।

ঘোড়ার ডিম হবে। লাউয়ের ডাঁটা হবে। ডিভোর্স খোরপোষ কি ছেলের হাতের মোয়া? ওয়ান ডে ক্রিকেটের মতো টানটান খেল জমবে—

খেল কি কিছু জমেছিলো?

জমেনি আবার। পঞ্চায়েত মানে ওয়ার্ড কমিটি মাদুর পেতে বসে পড়েছিলো কালিমন্দিরের নাট চত্বরে। অমিতবাবুর অভিযোগ খতিয়ে দেখে সুষ্ঠু একটা গতি করার ইচ্ছেয়। হাজির করানো হয়েছিলো সুকুমারকেও। বাদি আর বিবাদি। সভাপতিকে বরণ করে সভার কাজ যেই না শুরু হয়েছে অমনি বিবাদ। ফুল ঝাড়ু, খুন্তি, আঁশ নিরামিশ বটি, হাতা, বেলুন হাতে হৈ হৈ হা রে রে রে। একেবারে দেবী চৌধুরানিদের বজরা আক্রমণ—। কাকলি, নির্মলা, সাধনা, দীপালি, সুমিতা, অমিতা, টুকুদি, ফলুমাসি, ঝর্ণাপিসি, ননীবালা, শিখা, রেবা, রেখা, সবিতা, তনু, উমারা সব ঝাঁকে ছাঁকে ছেঁকে ফেলেছিলো মন্দির চত্বর।

কেন? ওদেরও কি কোন দাবী ছিলো?

ছিলো বই কি! একটাই দাবী—মিটিং করছো করো। মিটিং শেষ হলে কিন্তু ঘরে ঢুকো না।

সে কী? যার ঘর তাকেই বার করা?

ঘরে ঢুকতে হলে, বউয়ের রান্না জিভ চেটে খেতে হবে। প্রকৃত স্বামীর মতো স্বামীজি হয়ে লোটা কম্বল কৌপিন নিয়ে থাকতে হবে। নইলে ওয়ার্ড কমিটি সমেত সবকটা স্বামীকে বধূ নির্যাতনের দায়ে—

অন্যায়, ভারি অন্যায়! স্বাধীনতা হীনতায় কি বাঁচা যায়?

যাই বই কি! আলবৎ যায়! স্বাধীনতা দরকার দেশের। সংসারে আবার কিসের স্বাধীনতা? ঘানি ঘোরাবে, ঘোরাও। সর্ষে দেখা চলবে না। তাই তো চোখ বাঁধা থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত পায়ে আহস্বা-স্বা বলাও নিষেধ—মুখে কুলুপ আঁটা। স্ত্রী অধীনতাই স্বামী জীবনের এক এবং অদ্বিতীয় স্বাধীনতা। সুকুমার হয়ে নমিতার সঙ্গে পছন্দ করে পেরেক কিনতে যাওয়াটাই স্বাধীনতা। স্ত্রীর ত্যক্ত বেশবাস বেশ সুন্দর করে সুগন্ধি ডিটারজেন্ট ধুয়ে রোদে মেলে দেওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা। গৃহকর্মে নিপুন সুকুমার-স্বামীরাই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হয়—বুঝলে চাঁদু?

ভালোবাসা যারে কয়

—অতগুলো টাকা কী হল?

—কোন টাকা?

—ওই যে, ডি. এ-র টাকা, যেটা বাড়ল?

—তাই নাকি? ডি. এ আবার কবে বাড়ল?

—বাড়েনি? জানুয়ারি থেকে থ্রী পার্সেন্ট ডি.এ বাড়েনি?

—বাব্‌বা! সব খবর রাখো দেখছি! কোত্থেকে জানলে শুনি?

-কেন?

—সোর্স অব ইনফরমেশনটা জানতে পারলে সুবিধা হয়।

—খবরের কাগজ! বুঝলে চাঁদু খবরের কাগজই হল সব সোর্স অব ইনফরমেশন। চোখ ঘুরিয়ে হাত উল্টে কোমর বেঁকিয়ে ত্রিভঙ্গ মুরারি হয়ে খবরের উৎস ফাঁস করে সাধনা।

—ওঃ। হতাশ তাপস আকাশে ঘোরা সিলিং ফ্যানের দিকে চোখ রেখে উদাস হয়,—না এখনো হাতে পাইনি। তাছাড়া থ্রী পার্সেন্ট—ক'টাকাই বা পাব—

—মিথ্যে কথা বলবে না। টুম্পার বাবা পেয়ে গেল, আর তোমার বেলায়.... একটু দম নিয়ে নেয় সাধনা। কোনও অজুহাতে দমবার পাত্রী সে নয়।

— পরের কথা বিশ্বাস করে ঘর জ্বালানো তোমার স্বভাব হয়ে গেছে,—ছাদের আকাশ নয়, এবার সরাসরি সাধনার চোখের আকাশে নজর নিক্ষেপ করে তাপস।

—কী! ঘর জ্বালাই আমি? বলতে পাবলে এতবড় কথা? বরং তোমার জ্বালানো ঘরে জল ঢেলে আগুন না নেভালে.....বাঁ হাত কোমরে আর ডান তর্জনী কপালের কাছে মেলে ধরে পরবর্তী ভাষার ভাসমান ভেলা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সাধনা।

—পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তাই তো?—শূন্যস্থান পূরণ করে দেয় তাপস নিজেই।

—যেতই তো! হাজারবার যেত, একশবার যেত!

—বাঁচা যেত। পলে পলে তোমার মতো অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে হিসেব দাখিলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

—হিসেব করে রেখেছিলাম তাই সংসার চলছে। তোমার মতো উড়নচণ্ডীর হাতে হিসেব থাকলে সংসারের পাট লাটে উঠে যেত কবে। অফিস আর আড্ডা

ছাড়া কোন কাজটা করো?

—ওটাই তো আসল কাজ। অফিস না হলে হিসেবের কড়ি জুটত কোত্থেকে শুনি?—একটুও মেজাজ না চট্‌কে বরং মনে মনে—রাগ যে তোমার মিষ্টি ওগো—গেয়ে ওঠার রসিকতায় মনের কানাচগুলো রসে টইটম্বুর করে নিতে ইচ্ছে করে তাপসের। রসবড়ার মতো—টস্‌টসে টোপা টোপা গোল গোল মনে গোল্লা পাকিয়ে উসকে দিতে ইচ্ছে করে সাধনার রাগ-বিলাসিনী রূপ।

—আর তো কেউ কোনো চাকরি করে না—সবাই বেকার। টুম্পার বাবা, পিন্টু কাকু, বরুণদা, মলয়দা....গলার স্বর একটু খাদে নামে সাধনার। আশ্বস্ত হয় তাপস। মেজাজ বোধহয় পশ্চিমপাটে চলল (এত তাড়াতাড়ি আড়াআড়ি মিটে গেলে কি ভালো লাগে?) ডুবসাঁতার কাটতে। কিন্তু না, সময় মেলাতে ভুল হয়েছে তাপসের খাদে নামা গলার স্বর পাঁক-পাকিয়ে উঠে আসে সোজা তার সপ্তকে—টুম্পার বাবা, মলয়দা, বরুণদা—চাকরিও করে, আবার সাইডে বিজনেস। পয়সা আয় করতে জানে—তোমার মতো কুঁড়োর হদ্দ নয় তারা।—ফর্দ শুনিয়ে ইংরাজির ফুলস্টপের ফুট্‌কি নয়, বরং বাংলা যতিচিহ্নের দাঁড়ি হয়ে টান টান দাঁড়ায় সাধনা।

—বাহ্ বাহ্! ব্রেভো! ব্রেভো!

ভাগ্যিস এ ঘর বা এ অঞ্চলে পায়রার বসবাস নেই—থাকলে তাপসের চট্‌পটাস হাততালির স্বরে ভয়ে উড়ে প্রাণ বাঁচাত।

—তোমার মুরোদ তো ওইখানে, পারো খালি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে।—লাল মুখে ঝংকার ছড়ায় সাধনা। ঝংকার তো নয়—ঝন্‌ঝনে একদলা শুকনো হুপিং কাশি। অ্যাজমা রোগীর খাঁচা ঠেলে যেমন বের হয় তেমনি।

—তুমি বলোনি?

—কি?

—টুম্পার বাবা কিংবা বরুণদার বিজনেসের কথা? নিন্দে করোনি? চাকরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইন্সটলমেন্টে শাড়ি-শার্টপিস বেচে বেড়ানোর নিন্দে? বউয়ের নামে মলয়ের ইনসিওরেন্সের দালালি করা নিয়ে ব্যঙ্গ করোনি?

—করলেও তোমার জন্যে করেছি।

—আমার জন্যে?

—নয়ত কি? তোমার মতো কুঁড়ে লোক ব্যবসা করবে? চুরি জোচ্চুরি তো করছে না—পুরুষমানুষ খেটে রোজগার করছে, নিন্দে করতে যাব কেন?

—বেশ, কাল থেকে আমিও নেমে পড়ছি।

—সূর্য পশ্চিমদিকে উঠবে, বুঝেছ। যা উড়নচণ্ডী আর খরুচে লোক। পুঁজি খেয়ে হজম করতে দেরি হবে না একটুও। আমি কি আর বুঝি না ভাবছ?

—কী বোঝো?

—সব, সব বুঝি। ওই ডি. এ.-র টাকার হিসেব দেওয়ার ভয়ে আবোল তাবোল ভণিতা আমার বুঝতে বাকি নেই।—খাস কথা বলে ফেলে সাধনা।

—বিশ্বাস করো, আমাদের অফিসে এখনো পেমেন্ট হয়নি।—সারেণ্ডার করার ভঙ্গীতে বিনীত হয় তাপস।

তুলসীদার পরামর্শ উপেক্ষা করেই যত বিভ্রাট। তুলসীদার ছবি মনের পর্দায় হঠাৎ ভাসিয়ে নেয় তাপস। সেই প্রথম দিককার সব কথা। তখন তুলসীদার কাছে সেতার শিখতে যেত সপ্তাহে একদিন—প্রতি শনিবার সন্ধেয়। নতুন বিবাহিত তাপসের মনে তখন হেমন্ত বসন্তের হিন্দোল ভরা থাকত কানায় কানায়। সংসারের আগুনে পুড়ে পোক্ত টেরাকোটার মতো টানটান ছিল তুলসীদার কথাগুলো। ভাষায় ছিল রসের টলটলে ঢেউ। নিজের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার উপমা মেলে ধরার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ—খবরদার, মেয়েদের বয়েস আর ছেলেদের আয় কখনো কাউকে জানাবি না কিংবা জানতেও চাইবি না।

—কিন্তু ....

—বৌমা খুব বিরক্ত করছে বুঝি?—তাপসের মনের কথা পড়ে ফেলেছিলেন তুলসীদা—নতুন নতুন দু'চারদিন করবে। তারপর দেখবি একদিন গা-সওয়া হয়ে যাবে।

—আমি কি কম-সম করে কিছু একটা বলে দেব? না, প্রশ্নবোধক নয়, বরং জ্ঞানবোধক দৃষ্টি মেলেছিল তাপস।

—নৈব নৈব চ। খবরদার না। কম বেশি কোনও ফাঁসের ফাঁসিতেই লটকাবি না। লটকালেই ঝট্‌কা মারবে। না বুঝে কারেন্ট খাওয়ার মতো। শুধু বলবি....

—কী? —হাওয়ার গতিতে জেনে বুঝে নিতে চেয়েছিল তাপস।

—বলবি—তোমার বাবার কাছে খবর নাও। তিনি তো অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করে সব জেনে বুঝে বিয়ে দিয়েছিলেন। আর ভবী যদি একান্তই না ভোলে তখন রাগ করবি। চোখ লাল করে দার্শনিকের মতো বুঝিয়ে দিবি খাওয়া-পরার দায়িত্ব, শখ-আহ্লাদের দায় যখন নিয়েছি তখন টাকার খবরে দরকার কি? মাটি টাকা, টাকা মাটি—জপ করতে করতে কেটে পড়বে অন্য ঘরে কিংবা ডুব দিবি রবীন্দ্রনাথের গানে।

তুলসীদার পরামর্শমতো অন্য ঘরে কেটে পড়েও কি রেহাই পেয়েছে? কেটে কেটে খান খান হয়েছে। চুঁইয়ে পড়েছে রক্ত। তাপসের কাটা সেই ঘায়ে নুনের ছিঁটে শেষপর্যন্ত অফিসই ছড়িয়েছে। ক্যাশের বেতন বদলে হয়েছে কাগজের টুকরো—মাঠা কথায় চেক। ব্যস, অমনি পোয়া বারো। সোনায় সোহাগা। সপ্তাহে একদিন মোটে ছুটি—রবিবার। সেদিন তো ব্যাঙ্ক খোলা থাকে না। সুতরাং মাইনের চেক তুলে দিতে হয় সাধনার হাতে—সঙ্গে পাশবুক।

—আমি কি তোমার শত্তুর?—প্রথম মাসে চেক হাতে পেয়ে গঞ্জনার গম্‌গমে স্বর ঢেলে দিয়েছিল সাধনা তাপসের কানে।

—কেন?

—নিজেই চিন্তা করে দেখো।

—ধুস। আমি কেন চিন্তা করতে যাব। সব চিন্তা তো তোমার জিম্মায়। তুমিই তো আমার আসল চিন্তামণি।—নিজের ফাঁদে জড়িয়ে যাওয়া নিজেরই পা টেনে তোলার চেষ্টায় গুরু সমস্যার লঘু সমাধানে ব্যস্ত হয়েছিল তাপস,—এ মাস থেকে চেক, পাশবই, টাকা-পয়সা লেনদেন সবই তোমার জিম্মায়।

—হুম। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।—মুখে বললেও মনে মনে সেদিন খুশিই হয়েছিল সাধনা। এতদিনে একটা হিল্লে হওয়ার খুসি। সংসারে কর্ত্রী হওয়ার আনন্দ। স্বামীর টাকার ওপর একান্ত নিজস্ব অধিকার বর্তানোর আনন্দ।

সব শুনে তুলসীদা বলেছিলেন,—তুই একটা পাঁঠা। অফিস লাগোয়া ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারিসনি? বউয়ের কাছে খুলে মেলে একেবারে দিগম্বর হয়ে গেলি?

—মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশি হিসেবী হয়। তাছাড়া সাধনা বাজে খরচ করার বউই না!—নিজের পক্ষে সওয়াল ছুঁড়েছিল তাপস।

—তোমার বেসিক পে কত?—স্নান করতে যাওয়ার আগে দু'নম্বর চায়ের প্লেট তাপসের নাকের ডগায় ঠক্‌াস করে মেলে ধরে সাধনা। মতলব ভালো না—বুঝতে দেরি হয় না তাপসের। সকালের এক নম্বর ডবল হাফ চা পেতেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়—ঘুম থেকে উঠে হা-পিত্যেশ করে পায়চারি করতে হয় এ ঘর ও ঘর, সেখানে হঠাৎ অযাচিত চায়ের কাপ? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত কিংবা দুর্গা-অষ্টমীর সকাল থেকে অঝোর ধারার ধারাপাতের ঘটনায় মনে মনে ভীত হয়ে ওঠে তাপস। চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের টা না থাকলেও প্রশ্ন আছে। লুকোছাপা অপশন্যাল প্রশ্ন নয়, একেবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা—বেসিক পে জানতে চাওয়ার বাসনা। অফিসে চাকরি না করেও অফিসের এত খবর জোটায় কোত্থেকে? মাঝে মাঝে ভারি অবাক হয়ে ভাবে তাপস। বেসিক পে, ডি. এ, এইচ আর এ, সি সি এ, সব জলের মতো পরিষ্কার?

—কেন?—ঘুষ দেওয়া চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আগে লক্ষ বার ভাবার চেষ্টা করে। সাতসকালে ঘুষের চা-পান করানোর মতলবে ঘুষঘুষে জ্বরে আব্দারের ভাইরাস যে ছড়াবে তা প্রায় নিশ্চিত।

—হিসেব করব। থ্রী পার্সেন্ট পার মান্থ। চার মাসে কত টাকা এরিয়ার পাওয়া যাবে।—সোজা সাপ্‌টা ভণিতাহীন উত্তর দিতে দ্বিধা করে না সাধনা।

—সকাল সকাল কী শুরু করলে বলো তো? টাকা টাকা করে একেবারে

পাগল করে তুললে?

তুমিই তো বলেছিলে, এখন মনে নেই?—কোমল গান্ধারের পর্দায় স্বর নামে সাধনার। এই স্বরের মাদকতা বোঝে তাপস। কোমল গান্ধার, কোমল ঋষভের এই সুরেল ধাক্কায় বড্ড ভয় তার। নয়কে হয় করে দেয়। কথার কোমল পর্দায় ভারি সব আব্দারের আবেদন সুনিপুণ নিক্কণে কেমন সুন্দর অনুমোদন করিয়ে নেয়। অবশ করা রোগীর মতো তখন আবিষ্ট হয়ে ক্ষমতা অক্ষমতা সব একাকার করে তালগোল পাকিয়ে যায় তাপসের। দুর্বল হয়ে যায়। গলার স্বর জড়িয়ে আসে। একসঙ্গে গোটা পাঁচেক ঘুমের বড়ি খাওয়া মানুষের টালমাটাল অবস্থা হয়। কমিটমেন্ট করে ফেলে।

—কী?

—এরিয়ার ডি-এর টাকা পেলে চেন গড়িয়ে দেবে।

—তাই তো—চলকে টলে পড়ে তাপস। ফেব্রুয়ারি মাসের কমিটমেন্ট। বিবাহবার্ষিকীতে সবসময় পরার চেন গড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সে তো অনেক টাকার ধাক্কা। তাছাড়া এরিয়ারের টাকা ক'টার যে অন্য বাজেট করে রেখেছে। কমলের কাঠের দোকানে ধার শোধ করার বাজেট। কমলকে বলেও রেখেছে সে কথা। এখন অন্য খাতে খরচের ঝুঁকি নেওয়া কি সম্ভব?

—কি হল? কথা বলছ না?—কোমল গান্ধারের সঙ্গে শুদ্ধ ঋষভ আর দমকা 'সা' যোগ করে নরম অথচ কঠিন, গরম অথচ ঠাণ্ডা, আব্দার মেশানো ধমক ছুঁড়ে দেয় সাধনা।

—না, মানে এই ক'টা টাকায় কি আর সোনার চেন গড়ানো যাবে?—চায়ের ঢেঁকির ঢোঁক গিলে বোঝানোর চেষ্টা করে তাপস।

—সে আমি বুঝব। সুশান্তদাকে মাসে মাসে দিয়ে দিলেই হবে।—সোজা সরলরেখায় সমাধান করে দেয় সাধনা।

—আবার ইন্সটলমেন্ট।—আঁৎকে ওঠে তাপস। মাথার ওপর বন্ বন্ ঘোরা পাখার চক্কর মনে মেখে মাথা ঘুরিয়ে নেয়,—সংসার চলবে কি করে?

—কেন?

—এতগুলো ইন্সটলমেন্ট।

—আর পাঁচশ টাকা না হয় বাড়বে। ডি এ যোগ হয়ে বাড়া মাইনের টাকাটাই না হয় যাবে সুশান্তদার দোকানে।

—না না। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।

—কী! আমি বুঝতে পারছি না? সাধনার সরগমের কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার হঠাৎ কাঁচা বেগুন হয়ে ফুটন্ত সানফ্লাওয়ার তেলের কড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ে (আজকাল বিজ্ঞাপনের দৌলতে সরষে-তেলের রান্নাঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত

হয়ে আছে—কোলেস্টেরল কন্ট্রোলের রেশন কার্ড নাকি সানফ্লাওয়ার অয়েল)। বাঁ হাতের তালুতে কোমরের মেদ চেপে ডান হাতের তর্জনী আকাশে তুলে ফুঁসে ওঠে,—যত কাটাছাঁট আমার বেলায়? নিজে যে গাদাগুচ্ছের পান-সিগারেটের পিছনে পয়সার শ্রাদ্ধ করছ?

অর্থের কারণে সাতসকালে এমন অনর্থ? সরাসরি নেশায় টান? ধুস, এমন নেশা না করলেই হয়। 'মূর্খ শতকে' বর্ণিত আকাট মূর্খ মনে হয় নিজেকে। মনে হয় তাপস আর তাপস নয়। একজন 'অর্থহীনেহার্থ-কার্য্যার্থী'। অর্থহীন হয়েও ব্যয়বহুল রোগ-বালাই আহ্বানকারী নেশার পাঁকে পঙ্কিল? টেবিলের ওপর রাখা সিগারেটের প্যাকেট এক টুস্‌কিতে জানালার গরাদ গলিয়ে ছুঁড়ে দেয় বাইরে। এক ঠকাসে চায়ের কাপ ঠুকে দেয় প্লেটের ওপর—ধুত্তোর নিকুচি করেছে চা-সিগারেটের।

—ভাঙো। ভেঙে ফ্যালো। ভেঙে চুরমার করে দাও। গুণে তো আর নুন দেওয়ার শেষ নেই। কম জিনিসপত্র ভাঙলে সারাজীবন? আমি ইহা কা মাল উহা করে জোগাড় করলে কি হবে—সব মাল পয়মালে পাঠিয়ে তবুও শান্তি নেই।—এক চক্কর ঘুরে ঠক্কর খাওয়া কাপ প্লেটে তুলে গজ-গমনে গজ্ গজ্ করতে করতে রান্নাঘরমুখো হয় গজগামিনী সাধনা।

—সোনার ডিম পাড়া হাঁস যত্নে পুষে রাখতে হয়।—গলা চড়িয়ে সাধনাকে শুনিয়ে পুরনো নীতিকথার জ্ঞান ছড়িয়ে দেয় তাপস।

—অমন হাঁস অনেক দেখা আছে। এন সি সি প্যারেডের 'পিছে মুড়' ভঙ্গীতে বাঁই বাঁই ঘুরে দাঁড়ায় সাধনা।

—রিয়েলি?—অবাক হওয়ার ভাণ না ব্যঙ্গের উচ্ছ্বাস ঠিক কোন সুর প্রচ্ছন্ন হয় তাপসের গলায় বোঝা যায় না।—মুরোদ জানতে আর বাকি নেই। নেহাৎ আমার মতো একটা অপোগণ্ড জুটছিল তাই গলায় ঝুলেছো। নইলে—

—নইলে কী?

—জীবনে ছাদনাতলামুখো হতে হত না।

—ঠিক তার উল্টো। বৃহস্পতি, রবি, শুক্র, শনি সহায় ছিল তাই বর্তে গেছ। আমার মতো মেয়ে পেয়েছিলে তাই। রুম্পা কিংবা জিংগোর মায়ের মতো মেয়ে হলে তোমার নাকে ঝামা ঘষে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াত—তখন বুঝতে ঠ্যালা।—এক নিঃশ্বাসে শব্দ বাক্যের যাবতীয় স্টক উজাড় করে ঝুলি খালি করে দেয় সাধনা।

—জানি জানি!

—কি?

—রুম্পার মা চাকরি করে। জিংগোর দাদুর বাড়ি থেকে মাসোয়ারা আসে। যে গরু দুধ দেয় তার লাথি সহ্য করা যায়। সেপটিক ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি গোবর ছাড়া কি

দিলে সারাটা জীবন শুনি?—কথার পিঠে কথা, যুক্তির খাপে যুক্তি জড়ো করে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে তাপস,—রোজগেরে গিন্নির একটা কদর থাকে, বুঝলে?

—আমার চাকরিটা ছাড়াল কে শুনি?

—বাব্বা। তিনশ টাকা মাইনের দিদিমণির চাকরি,—এবার সত্যি সত্যিই ব্যঙ্গ উবছে পড়ে তাপসের কথায়,—তাও যদি মাসকাবারী পাওয়া যেত। মামন হওয়ার পর কানের কাছে রোজ ঘ্যানর ঘ্যানর কে করত শুনি?

—সে তো তোমার আর তোমার মায়ের প্ররোচনায়—হঠাৎ খাদে পৌঁছে যায় সাধনার গলার স্বর। কথাটা তাপস একেবারে মিথ্যে বলেনি। বিয়ের আগে পাড়ার প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলে দিদিমণির একটা চাকরি করত ঠিকই। মাইনেও ছিল, তবে তিনশ টাকা (যদিও সব মাসে একসঙ্গে তিনটে একশ টাকার নোট হাতের তালুতে রাখার সৌভাগ্য হয়নি কোনওদিন) আর মামনকে দেখভালের আয়া মাসকাবারী ছ'শ টাকা গুনে নিত জিভে আঙুল চুবিয়ে। দিদিমণিগিরি ছাড়িয়ে সাধনাকে মা-গিরিতে আনতে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হলেও প্রচেষ্টা অর্থকর হয়েছিল নিঃসন্দেহে।

—উরিপ্-বাপ্!—দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির পেটে চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে তাপস—আটটা চল্লিশ। এরিয়ারের টাকা চুলোয় তুলে এখুনি স্নানঘরে না ঢুকতে পারলে অফিসের কেরিয়ার খতম হয়ে যাবে। ন'টা সাতান্নয় ট্রেন।

দাড়ি কামাতে কামাতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে তাপস। আরও ঘণ্টা দু'য়েক আগে অফিসে পালাতে পারলে কী ভালই না হতো।

হাজার দিন বলেছি সকালবেলায় কোনো প্যাঁচাল পাড়বে না।—ধোঁয়া ওঠা ভাতের থালা উচ্ছেভাজা সহযোগে ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে স্বগতোক্তির উপদেশ ছাড়ে সাধনা।

—আমি আবার কখন প্যাঁচাল পাড়লাম? ক্যাঁচাল বাধালে তুমি....

—ভাতগুলো গলে গেছে। খেয়াল করিনি।

—গুড। ভেরি গুড! উচ্ছ্বসিত হয় তাপস,—ট্রেনটা তাহলে মিস্ হবে না।

—মানে?

—ভাতগুলো চিবিয়ে খাওয়ার সময় আর ঝক্কি দুই-ই বাঁচবে।—উচ্ছেভাজার পর পটলের ঝোলে গলা ভাত মাখামাখি করতে করতে জবাব দেয় তাপস,—সাধে কি আর তোমাকে এমন ভালোবাসি। কখন যে কি দরকার বুঝতে পারো বলেই না।

—থাক আর আদিখ্যেতা করে টিজ্ করতে হবে না। ভাত চিবানোর সময় না থাকলেও আমার মুণ্ডু চিবোনোর সময়ের তো অভাব হয় না,—মোক্ষম অভিযোগের তীর ছুঁড়ে দেয় সাধনা।

—ভারি সুন্দর উপমা দিয়েছ তো।

—উচিত কথা উপমা বলেই মনে হয়।

—যদি অবশ্য সে কথায় কোনো ঔচিত্যবোধ থাকে।

—আজ আর টিফিন বানানোর সময় পাইনি।—তাপসের কথার ধার ধারে না সাধনা। সেরে নেয় আরও একটা দরকারি কথা।

—সব্বোনাশ! আটটা টাকা খসে যাবে যে!—হাতের তালু চেটেপুটে ভোজনের শেষ স্বাদটুকু শুষে নেয় তাপস।

—ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে। টিফিন যেন কোনওদিন কিনে খাও না?

—আর খাওয়া চলবে না। চেনের ই এম আই দিতে হবে যে!—বেসিনের কল খুলে দেয় তাপস।

—আমি তাহলে সুশান্তদাকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।—সকাল থেকে সাধনার মুখের ওপর জড়ো হওয়া উতল ঝোড়ো হাওয়া কাটতে শুরু করে,—আচ্ছা এটুকু বোঝো না কেন—গয়না কি আমি আমার নিজের জন্যে গড়াই? মামন বড় হচ্ছে, তার বিয়ে দিতে হবে। দু'এক ভরি সোনা ঘরে থাকলে সাশ্রয় তো তোমারই হবে—না কি? এরিয়ার মানে বাড়তি টাকা, সেগুলো প্ল্যান করে জমানো উচিত।

—হুম!—মাথার চুলে চিরুনি চালায় তাপস।

—তোমার জুতোটা কি একবার 'ইন্সট্যান্ট সাইন' করে দেব? যা ধুলো জমেছে।

—কোন দুঃখে?—মুখে বললেও মনে মনে নেচে ওঠে তাপস। এত বছরের বিবাহিত জীবনে তবু একদিনের এবং প্রথম এবং সম্ভবত শেষদিনের জন্য হলেও জুতোয় 'সাইন' করতে চেয়েছে সাধনা। সে আনন্দ কি কম? কিংবা বেদনা?

—দুঃখে নয়, তোমার এরিয়ারের টাকায় চেন গড়াতে পারার আনন্দে। —ঝলমলে রোদের হাসি মুখে ছড়িয়ে 'ইন্সট্যান্স সাইন' করা জুতোজোড়া তাপসের মুখের সামনে তুলে ধরে সাধনা।

আর তাপস? জুতোজোড়া পায়ে গলানোর আগে মনে মনে গুণ গুণ করে ওঠে—সখী ভালোবাসা কারে কয়? কারণ দাম্পত্য জীবনে গৃহপালিত জন্তুর আনন্দ ভালোবাসা সব যে মিলে মিশে ঘুষঘুষে হয়ে আছে। সোনা গয়না শাড়ি, বাড়ি গাড়ি বেড়ানোর ঘুস দিয়ে তাকে সতেজ যাতনাহীন করে রাখতে হয়। তাপসও চেষ্টা করে। চেষ্টা করে তাবৎ স্বামীরা—কিন্তু পারে ক'জন? যে জন পারে, সে জন থাকে সুজন হয়ে—

গন্ধ

—শাক দিয়ে মাছের চেহারা ঢাকতে পারবে,—আঁশটে গন্ধ লুকোতে পারবে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! কার গায়ে কত আঁশটে গন্ধ আমার জানতে বাকি নেই।

—আমিও কিছু কম জানি না, বুঝলে?

—কি? কি জানো তুমি?

—তোমার কীর্তিকলাপ কী না জানি? সব, সব জানি—

—জানবে না! সারাদিন চরকি চরে বেড়ালে অনেক কিছুই জানা যায়।—লেজে পায়ের চাপ খাওয়া সাপের নিঃশ্বাসে ফুঁসে ওঠে তাপস।

—আমি চরকি চরে বেড়াই? আর তুমি, তুমি কী করো? ডানা মেলে উড়ে বেড়াও। চড়ুইয়ের মতো ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ চরে বেড়াও।—তার-সপ্তমে গলা ওঠে সাধনার। চড়বে না কেন? সাতসকালে অমন ন্যাকা ন্যাকা পাকা পাকা কথার পাক কানে ঢুকলে গলা, মেজাজ চড়ে চড়ে এক্কেবারে চচ্চড়ে হয়ে যায়। সারাদিন সংসারের ঘানি ঠেলে ঠেলে হাড়মাস কালি হয়ে গেল। তার ওপর অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথার ফোঁড়ন কারই বা ভালো লাগে?

—অমন ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ ওড়ার স্বভাব থাকলে তোমার দাঁড়ে অমন দাঁড়াহীন বসে থাকতাম না। সারাদিন খালি শালিখের কিচির মিচির বাক্যি শুনে শুনে কানে ঝালাপালার তালা লাগাতাম না।—শেষ চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়ায় তাপস।

—আহ! মা! সকালবেলায় কী শুরু কবলে? আমার এখনো হোম-ওয়ার্ক শেষ হয়নি।—লাগোয়া পড়ার ঘর থেকে বিরক্তি ঝরায় মামন।

—কি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? শুরু করলাম আমি?—শরীরে ধাওয়া না করলেও মুখে তেড়ে যায় সাধনা,—একেবারে বাপের ধারা পেয়েছে। বংশের রক্ত যাবে কোথায়?

—না, মোটেও না। শ্লোকে আছে মানুষ মাতুল-ধারায় বর্তায়। নরানাং মাতুলঃ ক্রম। মামাবাড়ির মতো, মানে মায়ের দিকে—

—দ্যাখো, আমাকে যা বলার বলো। খামোখা ভাইকে নিয়ে টানাটানি করবে না। টুবুল তোমার সংসারের ধার ধারে না।—হাতের মুঠি পাকিয়ে প্রতিবাদে সরব হয় সাধনা।

—দরজাটা বন্ধ করে নে মামুন।—মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে বাজারের থলি হাতে তোলে তাপস,—কি আনতে হবে?

—দড়ি।

—পাট না নাইলন?

—মানে? কি বলতে চাও তুমি?—চোখের স্যাটেলাইট ঠিকরে রাগের আলো ছড়িয়ে দেয় সাধনা।

—পাটের দড়িতে ব্যথা কম লাগবে। নাইলন দড়ি বড্ড শক্ত কিনা! তাই জানতে চাইছিলাম।

—তা তো চাইবেই। আমি মরলে তুমি তো মেলাগোল্লা হয়ে চরতে পারো। কিন্তু শুনে রাখো, আমি মরব না। তোমার হাড়ে দুব্বো ঘাস গজাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব, তারপর....

—থামলে কেন? বলো। বলো, তারপর কি করবে?—পলতে উসকে সাধনার বিরক্তির শিখা বাড়িয়ে দেয় তাপস,—দড়ি আনার ফরমায়েশ তো তুমি নিজেই করলে!

—করেছি বেশ করেছি। কাল থেকে অন্তত চল্লিশ বার ঘ্যানর ঘ্যান করেছি, আলু আনতে হবে। পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, তরি-তরকারি সব দরকার!—নাক ঘুরিয়ে কান ধরানোর ভঙ্গীতে বাজারের ফর্দ শুনিয়ে দেয় সাধনা।

—মনে না থাকলে কি করব?—স্বীকার করতে দ্বিধা করে না তাপস।

—থাকবে কেন? সংসারে মন থাকলে তো থাকবে!

—আহ্, সাধনা! বাড়াবাড়িটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?—রাশ টানতে গম্ভীর হয় তাপস। কে জানে, পাশের ফ্লাটের বোসগিন্নি হয়ত কান উঁচিয়ে রেখেছে। সোমবার স্টেশনে দেখা হলেই ইনিয়ে বিনিয়ে জ্ঞান দিয়ে দেবে—তোমরা ইয়ং কাপল্। সারাদিন খচর মচর ঝগড়া করো কেন? তোমার বোসদার সঙ্গে সাতাশ বছর পার করে দিলাম, কোনোদিন কোনো ঠোকাঠুকির আওয়াজ পেয়েছ?

—না না বৌদি। তেমন কিছু নয়। আমরা আলোচনা করছিলাম।—কাঁচুমাচু মুখে মাথা নিচু করে মনের আড়ালে মিথ্যে গল্পের প্লট খুঁজতে হবে তাপসকে।

—আলোচনা আমরাও করি।—সঙ্গে সঙ্গে বাউন্ডারি লাইন থেকে লুফে নেবে বোসগিন্নি,—তাই বলে তোমাদের মতো অমন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াই না। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি তাপসদা, মেয়েটা বড় হচ্ছে। তার মন্দ-ভালোর দিকেও তো একটু নজর দেবে! আমার কি? আমি হলাম পড়শি। কথায় বলে পড়শি—

—সে কি কথা! পড়শি হতে যাবেন কেন, আপনি হলেন আমাদের দিদির মতো।—মনে যাই থাক, মুখে ওটুকু বলতেই হবে তাপসকে। সাতাশ বছর ধরে সংসারের ক্যানভাসে জীবন রগড়ে এখনো যে চালে, যে চলনে, যে বলনে নিজেকে ধরে রেখেছে তাতে হাজারটা তাপসের মাথা ঘুরে যেতে পারে। সাধনা ওর মেয়ের

বয়সী। তবু বৌদির পাশে একদম ম্যাড়মেড়ে বেমানান মনে হয়।

—দিদিগিরিতে থাকতে আমার বয়েই গেছে। তোমাকে ভালো লাগে, ভালোবাসি, তাই বলে ফেললাম।—আই লাইনার লেপা চোখ টোপা করে শুনিয়ে দেবে বোসবৌদি,—তাছাড়া তুমিও আমাকে একটু অন্য নজরে দ্যাখো কিনা, তাই। সাধনাকে তো কক্ষণো বলা যাবে না। তবুও তোমাকে বলছি, কিছু মনে কোরো না তাপসদা, তোমার বউটার বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।

বৌদির কথা শুনতে শুনতে ঘেমে উঠবে তাপস। পালানোর চেষ্টা করেও পালাতে পারবে না। কারণ ট্রেন লেট থাকবে। পরিচিত কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে না কিংবা বৌদিকেও কেউ ডেকে নেবে না লেডিজ কামরার নির্দিষ্ট জায়গায় জমায়েত হওয়ার জন্যে। মনে মনে 'অন্য নজর' শব্দ দু'টো নিয়ে লোফালুফি খেলে টেনশন-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলেও পারবে না। পত্নী নিন্দা অর্থাৎ 'তোমার বউটার বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা' শব্দগুলো পারমানবিক হয়ে ধাক্কা দেবে দানবিক শক্তিতে। কথা ঘুরিয়ে প্রসঙ্গ বদলানোর চেষ্টা করবে তাপস,—ট্রেনটা রোজই লেট করে। কাল থেকে ভাবছি আগের ট্রেনটা ধরব।

পারবে না।—বেড়াল হঠিয়ে পথ কাটার মতো তাপসের ভাবনা কাটাকুটি করে দেবে বোসগিন্নি,—কি করে পারবে বলো? অমন একটা ধুম্সি রান্নার বুড়ি কি আগের ট্রেনের ভাত জোগাতে পারবে? পারবে না। তবে হ্যাঁ, সাধনা যদি তোমার অফিসের ভাতটা করে দিতে পারত—

—ওর ঠাণ্ডার ধাত। সকালে জল ঘাঁটলে সর্দি লাগে।—নিজের বউয়ের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করবে তাপস।

—সেইজন্যেই তো চাই একটা ইয়ং রাঁধুনি! আমাদের রাধামণিকে তো দেখেছ। যখন চাইবে তখনই ভাত-ডাল, মাছের ঝোল গরমা গরম নামিয়ে দেবে।—গর্বে টান টান হতে দেরি হবে না বৌদির। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। একটু পরেই আবার টবের জলহীন গাছের মতো নুইয়ে পড়বে,—অবশ্য একটা বিপদও আছে।

—বিপদ?—অবাক হতেই হবে তাপসকে।

—হ্যাঁ বিপদ। তোমার দাদা, বুঝলে, তোমার দাদা আজকাল কেমন ড্যাব্‌ডেবে চোখে রাধামণিকে মাপে। এটা-সেটার অছিলায় ঘুর-ঘুর ঘুরে বেড়ায় রান্নাঘরে। —যতটা সম্ভব খাদে নেমে যাবে বৌদির গলার স্বর,—এই ট্রেনে গেলে আমার অফিসেও লেট হয়ে যায়। কিন্তু উপায় নেই।

—কেন? উপায় নেই কেন?

—তুমি একটা হাঁদুরাম। জেনেশুনে তোমার দাদাকে কি রাধামণির জিম্মায় ছেড়ে আসা যায়? আগেভাগে খাইয়ে দাইয়ে তোমার দাদাকে বিদেয় করে তবেই না আমাকে বেরুতে হয়।—মনের পরত খুলে সন্দেহের খোলস উগরে দেবে

বোসবৌদি,—ওরা সব সাতবাড়ি চরানো মেয়ে। ওদের বিশ্বাস কি?

—শুধু শুধু কি আর কেউ চরে বেড়ায় বৌদি? পেটের তাগিদে, সংসারের প্রয়োজনে—

—দরদ দেখি উথলে পড়ছে। তুমিও কি তোমার দাদার মতো রাধামণিকে নজরে নজরে রাখতে শুরু করেছ?—তাপসের মুখের কথা কটাস্ কেড়ে নেবে বোসবৌদি,—তা রাখো ক্ষতি নেই। তাছাড়া তোমার যা বয়েস তাতে অমন ছুঁকছুকানি মানায়। তবে সাবধান, সাধনা জানতে পারলে কিন্তু খুন্তিপোড়া করে ছাড়বে।

—কি যে বলেন বৌদি!—লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে তাপসের। কিন্তু মরতে পারবে না। ট্রেনে এসে বাঁচিয়ে দেবে।

—বাড়াবাড়ি আমি করলাম?—তাপসের গাম্ভীর্যে কাজ হয়। সাধনার স্বর নরম হয় একটু। আর সেই সুযোগ বোসগিন্নিকে ভাবতে ভাবতে বাজারের পথে পালিয়ে বাঁচে তাপস। অন্তত ঘন্টা খানেকের নিস্তার তো পাওয়া যাবে।

—তাপস বুঝি বাজারে চললে?

না, শ্মশানে।—পিন্টুকাকুর মুখের ওপর বেমক্কা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করে তাপসের। কিন্তু পারে না। বয়েসের তারতম্যে আটকে যায়। সমাজ সংসারে এই মানুষগুলো ওপর ভীষণ রাগ হয়। দিব্যি সব দেখেও না দেখার ভাণ। হাতে বাজারের থলি ঝুলছে তবুও জিজ্ঞেস করার বাতিক যায় না। একে মনের ওপর চরাচরের বোঝা, তার ওপর শাকের আঁটি পিন্টুকাকুর জিজ্ঞাসা।

—তুমি তো এত সকালে বাজারে যাও না।—নাছোড় পিন্টুকাকু ছাড়তে চায় না তাপসকে।

—আজ যাচ্ছি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।—মৃদুমন্দ ঘাড় নাড়ে পিন্টুকাকু.—আজ তো শনিবার। অফিস বন্ধ। কোথাও বেড়াতে যাবে বুঝি?

—হ্যাঁ।—মিথ্যে উত্তর শোনায় তাপস।

—কোথায়? দক্ষিণেশ্বর না কালিঘাট? বেলুড় না নলবন?—কৌতূহলের কাতুকুতু খাওয়া মানুষের মতো প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় পিন্টুকাকু।

—চরতে যাব।—বিরক্তি প্রকাশ না করেও বিরক্ত হয় তাপস।

—চড়তে? পাতাল রেলে? না নাগরদোলায়?

—শূলে।

—আহা, বালাই যাট। সে ছিল রাজা-রাজড়ার কালে। যেমনি কড়া শাসন তেমনি ধারালো শূল। এখন শাসনে মরচে ধরেছে। ভোঁতা হয়ে গেছে শূল। সেসব কথা থাক,—তাপসের কাঁধের সঙ্গে প্রায় কাঁধ মিলিয়ে হাঁটা শুরু করে পিন্টুকাকু।

তারপর শুরু করে ফিস্‌ফিসানি,—তোমাকে একটা কথা বলে রাখি বাবা। ওই ই-ফাইভের বউটা তত সুবিধের নয়।

—জানি।—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনিয়ে দেয় তাপস। শোনাতে পারে। কারণ ই-ফাইভের প্রভাতবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে পিন্টুকাকিমার তেল-বেগুনের সম্পর্ক কারো অজানা নেই। সুযোগ পেলেই একটা না একটা কেচ্ছা গাইবে।

—জানো?—অবাক হয় পিন্টুকাকু,—জেনেশুনেও বৌমাকে মেলামেশা করতে দাও? আজকাল তো দেখি বৌমার দুপুর ই-ফাইভে কাটে।

—জানি।—নিস্তার পেতে চায় তাপস,—রেণুদির কাছে সফ্‌ট্‌ টয় বানানো শিখতে যায় আপনার বৌমা।

—ও!—নিরাশ হয় পিন্টুকাকু,—আজকাল উনি চরাচরে চরে বেড়ানো ছেড়ে সফ্‌ট্‌ টয় বানানো শেখাচ্ছেন? তা ভালো।

—শুনলাম বুতুনকে নাকি রেণুদি চটিপেটা করতে গেছিল?—পথ চলতে চলতে হাঁড়ি ফাটানোর ইচ্ছে হয় তাপসের।

—ভুল, ভুল শুনেছ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেয়েছিল তোমার পেয়ারের রেণুদি। বুতুন ঢাকতে দেয়নি।—তাপসের পাশ থেকে ছিট্‌কে সরে গজ্‌ গজ্‌ শুরু করে পিন্টুকাকু,—কেন দেবে বলতে পারো? অমন একটা আধবুড়ি বিধবার ঢলাঢলি বুতুন কেন সহ্য করবে? ইয়ং প্রমিসিং ছেলে। চাকরি বাকরি করে না ঠিকই, তাই বলে তো ফ্যালনা নয়। আমি চলি বাবা। পরে দেখা হবে।

সুড়ুৎ সরে পড়ে নিজেকে এবং তাপসকেও বাঁচায় পিন্টুকাকু।

হাসি পায় তাপসের। একটু আগেই সাধনা বলেছিল শাক আর মাছের গপ্পো। সংসারটাই এমন। সূঁচ আর চালুনির ছড়াছড়ি। খালি ছ্যাঁদা খোঁজার পালায় মাতামাতি। 'জনমহল' এর বাসিন্দারা কে না জানে বুতুনের খবর? তবে হ্যাঁ, সাধনাকে একটু সাবধান করে দিতে হবে। পাঁচজনের পাঁচ কথার প্যাঁচে না থাকাই ভালো। কে জানে পিন্টুকাকু কিংবা বোসবৌদি কবে হয়ত সাধনাকে নিয়েও গবেষণায় লিপ্ত হবে।

—তোর কি আক্কেল বল তো?—বাজারে ঢোকার মুখেই সমীরের হাতে পড়ে যায় তাপস। নিতাইদার চায়ের দোকান গুলজার করে গুলতানি শুরু হয়ে গেছে সকালেই। তাপসের সহপাঠী হলে কি হবে, সমীরের সহবাস হারানজেঠু, বিনয় মামা, গোপেন হালদার, অরুণকাকুদের সঙ্গে। পৌরসভার স্যানিটরি ইন্সপেক্টর সমীর। সাফাইওয়ালেদের সঙ্গে খিস্তি-খেউড়ের ঝড় বওয়াতে যেমন ওস্তাদ, তেমনি এইসব কাকা-জেঠুদের সঙ্গেও না-সংসদীয় শব্দের সুনামি তুলতে অদ্বিতীয়। 'শালা' শব্দ উচ্চারণ করতেও জিভ কাঁপে তাপসের। সহপাঠি হলেও তাপস তাই অপছন্দের তালিকায় শীর্ষে রেখেছে সমীরকে।

—কেন কি হল?—আচমকা আক্রমণে ধাতস্থ হতে দেরি হয় তাপসের।

—গত শনিবার মিটিংয়ে এলি না কেন?

—বাড়ি ছিলাম না।

—কোথায় চরতে গেছিলে চাঁদু? তুই দেখালি মাইরি। বউ-মেয়ে, সংসার-ধম্মো আমাদেরও আছে। তোর মতো শালা আঁচলের নিচে বসে বসে টাপ্‌সি খাই না।—এক নিঃশ্বাসে অভিযোগ ঢেলে যায় সমীর,—শনি-রবিবার চরতে বেরোই না।

—আঁচলের নিচে মানে?—দোকানের ভেতর থেকে সমীরের পলতে উসকে দেয় হারান জেঠু।

—টাপ্‌সি খাওয়া? বেড়ে ঝেড়েছ হে সমীর।—চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দেওয়া ভুলে যায় গোপেন হালদার।

—আয়, ভেতরে আয়। চা খাবি?—হারানজেঠু কিংবা গোপেন হালদারকে উপেক্ষা করে তাপসকে আহ্বান করে সমীর।

—না, আমার একটু তাড়া আছে।

—আর আমরা শালা অঢেল সময় বিইয়ে বেড়াচ্ছি, তাই না?—রাগে টং টং বেজে ওঠে সমীর।

—মিটিংয়ে ডিসিশন হয়েছে, আবার নাইট গার্ড চালু হবে।—সমীরকে টপকে শুনিয়ে দেয় বিনয়মামা।

—আপনারা যা ডিসিশন নেবেন—

—তাই হবে। আর তুমি ফ্লাটে থাকবে অথচ পালিয়ে বেড়াবে।—শূন্যস্থান পূরণ করে দেয় সমীর।

—না না, পালাব কেন? চাঁদা-পত্তর যা লাগে দিয়ে দেব।—মুচলেকা দেওয়ার মতো শোনায় তাপসের গলার স্বর।

—আহ! ছাড়ো না সমীরদা।—চায়ের ভাঁড় হাতে সামনে হাজির হয় নিতাই। চোখ রাখে তাপসের চোখে,—আপনাকে চা দেব?

—না।—উত্তর শুনিয়েই চোখ-কান বন্ধ করে হন্ হন্ হাঁটা দেয় তাপস। হাসির রোল আর সমীরের খেউড় তাড়া করে পেছন পেছন। তা করুক। মনে মনে গান ভাঁজে তাপস—আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে....।

কিন্তু না, গানের উঠোনেও দাঁড়াতে পারে না বেশিক্ষণ। পারবে কেন? সমাজটা কি আর সেই সোনার খাঁচার দিনগুলোর মতো সুন্দর আছে? নেই। পাল্টে একেবারে উল্টে গেছে। মুক্তি এখন আর আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত নেই। মুক্তি এখন খেউড়ে খিস্তিতে রকে আড্ডায় ধান্দাবাজিতে ঘুর ঘুর করে। চরে বেড়ায়। সাধনা কি কিছু টের পেয়েছে? গান ভেঙে ভাবনায় ফেরা তাপস এবার হোঁচট খায়। মেয়েদের মনটাই অমনি—কুচুটে। সন্দেহ বাতিকে ঘেরা। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে তাপস। তিলকে তাল বেতাল করতে ওস্তাদ। নইলে চিম্‌টির মতো

সামান্য একটা কথার পিঠে কেউ অমন 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা', 'আঁশটে গন্ধ'র মতো দুম্ দাম্ কিল মারতে পারে?

ভাবনাগুলো জাবর কাটতে কাটতে বাজারে পৌঁছে যায় তাপস।

—নিয়ে যান বাবু। পালং শাক। একেবারে টাটকা।—মাখনের হাঁকে নিজের ভেতর থেকে বাইরে ফেরে তাপস।

—না ভাই, পালং শাক ফর্দে নেই।

—অসময়ের তরকারি। থলিতে পেলে বৌদি খুশি হবে। নিয়ে যান।—প্রায় ব্যাগ টেনে ধরে নাছোড় মাখন,—বড়ি, মুলো, কাঁচালঙ্কা দিয়ে রান্না করতে পারলে মাছ ঢেকেই শাক চেটে তুলবেন।

আবার সেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কিস্‌সা। সকাল থেকে এক কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ঘরে বাইরে সবাই শুধু মাছ ঢাকতে ব্যস্ত।

—কেন? কার পাকা ধানে মই দিয়েছি যে ঢাকতে হবে?—আচমকা খেঁকিয়ে ওঠে অন্যমনস্ক তাপস।

—আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না বাবু।

—থাক, আর বুঝে কাজ নেই। চাইছ যখন, পাঁচশ গ্রাম দিয়েই দাও। সঙ্গে আড়াইশ মুলো।—নিজের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে মাখনকে খুশি করার চেষ্টা করে তাপস। একে একে আলু, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, পটল, লাউ, বেগুনে থলি বোঝাই করে মনে মনে শান্ত হয়। অনেকদিন পরে এমন পকেট-খোলা বাজার দেখলে সাধনা নিশ্চয়ই খুশি হবে।

—অ্যাই! রোক্‌খে!

এবার আর নিতাইদার দোকানের সামনে দিয়ে ফিরবে না। ডানহাতে বাজারের ব্যাগ থাকায় বাঁহাত তুলে রিক্সা দাঁড় করায় তাপস।

—কোথায় যাবেন?

—জনমহল ফ্ল্যাটে। এফ ব্লক।—রিকশার পাদানিতে বাজারের ব্যাগ রাখতে চায় তাপস।

—না, যাব না।—সাফ জানায় রিক্সা-চালক।

—কেন? যাবেন না কেন?—হৈ হৈ করে ওঠে তাপস।

—আপনি আমার বউ না পাড়ার দাদা, যে আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে যাব? আমি ভাড়া খাটব না। খালি রিক্সা চালিয়ে ঘুরে বেড়াব। চরে বেড়াব এ রাস্তায় ও রাস্তায়।—বলতে বলতে প্যাডেল ঘুরিয়ে শন্ শন্ এগিয়ে যায় রিক্সা-চালক।

তাপসের মেজাজ খিঁচড়ে একেবারে বর্ষাকালের খিচুড়ি হয়। ঘরে বাইরে সবাই যেন তাতাল-তাতা তেতে আছে। ছোঁওয়া লাগলেই ছ্যাঁক। ছ্যাঁকা লেগে যাবে। ফোস্কা পড়বে। বাজারের ব্যাগ হাতে বিরস তাপস দাঁড়িয়ে থাকে পথের

পাশে। ভাবতে থাকে প্রতিকারের উপায়। একটা প্রতিবাদ করা দরকার। সংগঠন, মিটিং-মিছিল, চলবে না চলবে না, কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও—বলতে বলতে পথে নামতে হবে। পথ থেকে মিছিল চালিয়ে চলে যেতে হবে ঘরে। স্ত্রীদের স্বৈরতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক, হিটলারি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে—দুনিয়ার স্বামী এক হও! এক হও!

—না, কিছু হবে না তোমাদের দ্বারা।—প্রতিবাদের পরিকল্পনায় টগবগ ফুটন্ত তাপসের পিঠে হাত রাখেন মদনমোহনবাবু। জনমহল ফ্ল্যাটের নাগরিক বাহিনীর সভাপতি।

—অ্যাঁ!— চমকে ওঠে তাপস। বিড় বিড় করে,—ম্না, কিছু একটা বিহিত করতেই হবে। দলিত, পদদলিত, বাক্য-দলিত হয়ে বেঁচেবর্তে থাকার চেয়ে শহীদের মরণ অনেক সম্মানজনক।

—ঠিক, ঠিক ধরেছি। তখন থেকেই একা একা বিড় বিড় করা দেখেই বুঝেছি রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সকালে পাকস্থলী পরিষ্কার না হলে গ্যাস-অম্বল হয়। গ্যাস চিরকাল ঊর্ধ্বমুখী। মাথায় গ্যাস চেপে বসলে বিপ্লবী হতে ইচ্ছে করে। রাতে শোওয়ার আগে দু'শ মাত্রার কার্বো ভেজ শুরু করতে পারো।—পেশায় হোমিওপ্যাথ মদনমোহনবাবু দাওয়াই বাৎলে দেন।

—তেমন কিছু নয়। একটা রিক্সা পেলে—

—সব বিপ্লব শেষ হয়ে যাবে, তাই তো? তা বাপু এইটুকু তো বাজার। কতই বা ওজন হবে? পাঁচ'ছ কিলো। হেঁটে মেরে দিলেই তো পারো। শরীর ভালো থাকবে, পয়সাও বাঁচবে।—পিঠ চাপড়ে পরামর্শ দেন মদনমোহনবাবু—পরশু দিনই তো দেখলাম। অফিসপাড়ায়। ঠা ঠা রোদে ঠ্যা ঠ্যা চরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে অবশ্য একজন সুন্দরী ছিল। তা অমন ইয়াং পরস্ত্রী পাশে থাকলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘাতে পারে। বোশেখের রোদেও বসন্তের ছায়া পড়ে। তুমি ভাগ্যবান হে। ঘরে-বাইরে দু'দুটো সুন্দরী ট্যাকল করছ—

—আপনি ভুল করছেন মেসোমশাই। পরশু আমার সঙ্গে যে ভদ্রমহিলা ছিলেন—মদনমোহনবাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করে তাপস।

—সে তোমার মাসতুতো বোন ছিল। তাই বলবে তো? বয়েস তো কম হল না। জীবনে মাসতুতো সম্পর্কও কম দেখলাম না। পাশতুতো কেউ ধরা পড়লে মাসতুতো বলে চালিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে সোজা। ঘুরে বেড়ানোর চলন-বলন-ঢলন দেখলেই সব বোঝা যায়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, আঁশটে গন্ধ বের হয়, নয়ত লেজ উঁকি দেয়।—বলার ছন্দে যেন এক কড়াই রসে উথাল পাথাল ছানার গোল্লা হয়ে ফুটতে থাকেন মদনমোহনবাবু,—আমার কি দরকার? জীবনের সন্ধেবেলায় এসে বসে আছি হরির অপেক্ষায়। যে কোনোদিন পার হয়ে যাব।

নেহাৎ সাধনা মান্যি করে। তোমার মাসিমাকে 'মাসিমা মাসিমা' বলে, তাই বললাম। কত লোকেরই তো কত কিছু নজরে পড়ে। সবাইকে কি বলতে যাই?

—বলবেন না কেন? নিশ্চয়ই বলবেন। অন্যায় কিছু দেখলে হাজার বার বলবেন।—রাগে সারা শরীর নিসপিস করলেও গলার স্বরে লাগাম টানে তাপস। কুচুটে বুড়োর সঙ্গে অমায়িক খচ্চরের ব্যবহার ঢেলে দেয়।

আর ঠিক তখনই খালি একটা রিক্সা এসে থমকে দাঁড়ায় তাপসের সামনে। প্রায় লাফিয়ে চড়ে বসে তাপস। বাজারের ব্যাগ গুটিয়ে সৌজন্যমূলক আহ্বান করে মদনমোহন-বাবুকে—যাবেন নাকি? চলুন—

—না, তুমি যাও। তবে বুড়ো মানুষের কথাটা রেখো বাবা। আমরা ছা-পোষা গেরস্ত। বাইরে ছুঁক ছুঁক বেড়ানো আমাদের মানায় না।

আরো অনেক কিছু হয়ত বলতে চেয়েছিলেন মদনমোহনবাবু। কিন্তু সুযোগ দেয় না তাপস। রিক্সায় হেলান দিয়ে আদেশ দেয়,—চলো। জনমহল। এফ ব্লক।

সকাল থেকে একেবারে সাঁড়াশি আক্রমণ—রিক্সায় চলতে চলতে মনে হয় তাপসের। তবে কি রেবা মাসিমা? মানে মদনমোহনবাবুর স্ত্রী ফুসলেছে সাধনাকে? কিন্তু কেন? জ্ঞানত কোনো অন্যায় তো সে করেনি। আঁশটে গন্ধ ছড়ানোর মতো কোনো মাছের সহবতে শাকের প্রাধান্য দেয়নি। বিয়ের আগে একটাও বান্ধবী ছিল না, প্রেমিকা তো দূরের কথা। বিয়ের পরে অবশ্য সাধনাকে নিয়ে দু'একবার এদিক এদিক চরে বেড়িয়েছে, কিন্তু সেই চলনের হাঁড়িতে অশালীন চাল তো কখনো ঢালেনি। চাকরিও তাপসের মহিলা বর্জিত অফিসে। তবে? তবে মদনমোহনবাবু পরশু দুপুরে কোন সিরিয়ালের সিরিয়াস এপিসোড দেখলেন?

—বাব্বা বাব্বা! বাজারে গিয়ে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?—থলি হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ প্রগল্‌ভা সাধনার আদুরে মেদুরে আহ্বানে চমকে ওঠে তাপস। শীতকালে মেঘ কেটে যাওয়ার পর রোদ উঠলে যেমন হাড়ে হাড় ঠকাঠক ঠোক্কর শুরু করে তেমনি পা কাঁপতে থাকে। নতুন কোনো বিপদের সঙ্কেত নয় তো?

—জামাইবাবুর যা স্বভাব, অবাক হওয়ার কিছু নেই।—সাধনাকে ছাপিয়ে পর্দার আড়াল থেকে গেয়ে ওঠে রঞ্জনা। সাধনার নিজের বোন। মাসতুতো পিসতুতো নয়, একেবারে নিজের মায়ের পেটের বোন।

—গন্ধ, আঁশটে গন্ধ—

—কোথায়?—উদারার শেষ খাদে উচ্চারণ করা তাপসের শব্দগুলো কান এড়ায় না সাধনার,—এই তো, এইমাত্র ঘর মুছে গেল রূপা। আঁশটে গন্ধ কোথায় পাচ্ছ?

—না, মানে সকালে, মানে একটু আগেই তো তুমি বলছিলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কথা।—স্বর জড়িয়ে যায় তাপসের গলায়।

—তোমার শুধু ক্যাঁচালে স্বভাব। প্যাঁচালো মনটা একটু সোজা-সরল করো

তো দেখি!—তাপসের হাত থেকে বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে তুলে নেয় সাধনা।

—ডাক্তার ব্যানার্জীর সঙ্গে আর কথা হয়েছিল?—আসরে অবতীর্ণ হয় রঞ্জনা, — বাপীর তো কাল স্কুল নেই। যদি সম্ভব হয়, একবার দেখিয়ে আসতাম।

রঞ্জনার কথার উত্তর দেয় না তাপস। পরশুদিন দুপুরের ঠা ঠা রোদে ঠ্যা ঠ্যা চরে বেড়ানোর ছায়াছবি উঁকি দেয় মনের ভেতরে। এক লাফে রঞ্জনাকে সরিয়ে সাধনাকে ঠেলে নিজের শরীরটা এলিয়ে দেয় চেয়ারে। গন্ধ। বড্ড গন্ধ।

—শরীর খারাপ টারাপ হয়নি তো?—বাজারের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে আসে সাধনা। হাত রাখে তাপসের কপালে,—কই না তো। গা তো গরম নেই। তবে অমন ভুলভাল বকছ কেন? গন্ধ গন্ধ চিৎকার করছ কেন?

—রঞ্জনা জানে—

—ওঃ।....বুঝতে অসুবিধে হয় না সাধনার,....জানিস রঞ্জু, বুড়ো হলে মানুষের ভীমরতি হয়। আমি কি করব বল। মদনমোহনবাবু এসে রেবা মাসিমাকে বলেছে। রেবা মাসিমাকে তো তুই জানিস। সাতকাণ্ড রামায়ণ বানানোর একেবারে ওস্তাদ।

—কি? কি বলেছে?—খলবল করে রঞ্জনা।

—তোর জামাইবাবু নাকি পরশু দুপুরে একটা বউকে হাত ধরে রাস্তা পার করাচ্ছিল। তুইই বল, অমন অলুক্ষুণে কথা শুনলে কার মেজাজ ঠিক থাকে? তা ছাড়া পুরুষমানুষের ছুঁক্‌ছুকে স্বভাবকে কি বিশ্বাস করা যায়?

—তারপর? তারপর?—উৎসাহিত হয় রঞ্জনা।

—এখন তোর মুখে শুনলাম। জানলাম। বুঝলাম।

—কি?—গান নয়, প্রশ্নের কোরাস ঝরে তাপস আর রঞ্জনার স্বরে।

—ভাগ্যিস মামনের বাবা তোর হাতটা ধরেছিল, নইলে কলার খোসায় যেভাবে পিছলে গেছিলি, হাড়গোড় ভেঙে একেবারে দ হয়ে থাকতে হত। একে ছেলেটা ভোগাচ্ছে, তার ওপর....

—গন্ধ! আঁশটে গন্ধ!—গঞ্জিকা সেবন শেষে সাধু-মোহান্তদের ব্যোম ব্যোম উচ্চারণের ভঙ্গীতে শব্দ করে তাপস।

—হোক গন্ধ। নিজের শালীকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গন্ধ ছড়ায় তো ছড়াক। তাতে তোমারই বা কি আর রেবা মাসিমারই বা কি?—গলার স্বরে নিজের অবস্থানে অবস্থিত হওয়ার চেষ্টা করে সাধনা।

—মা তুমি এবার হেরে গেলে?—ফোঁড়ন দিতে এসে দাঁড়ায় মামন।

—তোমাকে আর বড়দের মাঝখানে পাকামো করতে হবে না। আঁকার ক্লাসে যাও।—মেয়েকে শাসন করে রান্নাঘর-মুখো হয় সাধনা,—তোমাকে কি এক কাপ চা দেব?

চাঁন্দুর মা চাঁন্দুর বাপ

শুনছ নি! ও চাঁন্দুর মা?

কইয়া যাও, অহনও কালা হই নাই!

চাঁন্দু তোমার লায়েক হইছে।

হওনই উচিৎ! দুই বচ্ছর পর ম্যাট্রিক দিবো।

তাই বইল্যা—

তাই বইল্যা কী? কী করছে চাঁন্দু?

বিড়ি, বিড়ি ধরছে। চাঁন্দুর মা, পোলায় তোমার লায়েক হইছে! ধূমপান শেখছে—

ফালতু কথা কইয়ো না তো! চাঁন্দুর মতোন পোলা গা গেরামে কয়ডা আছে হুনি?

হক কথা কইছো! অমন লায়েক পোলা—

চাঁন্দুরে তুমি দুই চক্ষে দ্যাখতে পারো না। ক্যান নিজের পোলা, তোমার কোন পাকা ধানে মই দিছে হুনি?

পুত্র স্নেহে এক্কেবারে অন্ধ হইয়া আছো। ধেতরাষ্ট্রের মতো। শাজাহানের মতো। ধুস! কারে কি কই? প্যাটে বিদ্যা আছে যে বোঝবে?

আমার প্যাটে তো বিদ্যা নাই। বুদ্ধিও নাই ঘটে! তা এট্টা মাষ্টারনি লইয়্যা আইলা না ক্যান?

ভুল যা হওনের তা তো হইয়াই গ্যাছে—

বুঝতা ঠ্যালা! পিছার বাড়ি মাইর‍্যা কোমর ভাইঙা ছাড়তো। মহাভারতের ধেতরাষ্ট্র আর ওরঙ্গজেবের বাবা শাজাহানরে চিনাইয়া ছাড়তো!

কও কি চাঁন্দুর মা? এতো সব তুমি শিখলা কোথ্ থিক্যা?

ক্যান? আমি বুঝি পড়ি নাই? দোপেড়ের ইস্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা দিই নাই?

থুড়ি! ঘাট মানতাছি! ভুল আমারই হইছে!

যা কুচুটে মন তোমার—ঘাটে গিয়াও ঘাট মাইন্যা কূল পাইবা না। রাইত অনেক হইলো অখন বাতি নিভাইয়া—

চাঁন্দুরে নিয়া কতো স্বপ্নই না আছিলো। ভিটে মাটি ছাইড়্যা রিফ্যুজি হইলাম। বিশ্বেসবাবুর দৌলতে—

রাতভর বইয়া বইয়া কি কাসুন্দি ঘাটবা নাকি? এতক্ষণে সত্যি সত্যি বিরক্তি হয় মোক্ষদাবালা। সারাদিন সংসারের খাটনি কি কম? নিজের সংসার সামলে

বিশ্বাসবাবুর হেঁসেল। ন'জনের দশপদ রান্নার হ্যাপা পোহাতে হয়। চাঁন্দুর বাবার কি? সবে চশমা নাকে ঝুলিয়ে বসেছে। বিশ্বাসবাবুদের মুখস্থ করা বাসি খবরের কাগজের অতগুলো পাতা না পড়ে কি বিছানায় যাবে? খবরের কাগজ পড়বে, ফুক ফুক বিড়ি টানবে, আর বগবগ করবে। না বাপু, শরীরে অতো কুলোয় না মোক্ষদাবালার। চাঁন্দুর মায়ের।

শুনছ নি, ও চাঁন্দুর মা?

কও! কান খুইল্যা রাখছি।

চোক্ষু তো বন্ধ দ্যাখতাছি। ঘুমাইতেও পারো—ঘুমাবে না কেন? শরীর তো! মানুষের শরীরে কতো আর ধকল সয়—মনে মনে সব ঝোঝে হারানিধি—চাঁন্দু আর টেপির বাবা। সেই যে সেবার নদীর পাড় ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে গেল, সেইবারই তো দেশ গ্রাম ছেড়ে চলে এলো ওরা। শহরে। ঠাঁই নিলো বিশ্বাসবাবুর ধানকলে। চাঁন্দুর বয়েস তখন দেড় কি দুই। আর টেপি? তখন তো সে মোক্ষদার পেটে। সাতমাসের সাধও হয়নি। ঠাঁই দিলো বিশ্বাসবাবু—দু'কামরার টালিবেড়ার ঘর মাগনা দিলো। গদিতে চাকরি দিলো হারানিধিকে। নিজের বউটা রুগ্ন—হেঁসেল ঠেলতে পারে না। তাই মোক্ষদাকে দিলো হেঁসেলের দায়িত্ব। ভগবান, ভগবান না হলে কি আর মানুষ মানুষের জন্য এতো করতে পারে?

তয় কি তোমার মতো রাতচরা হইয়্যা বইয়্যা থাকুম? চোখ বন্ধ করেই জবাব দেয় মোক্ষদাবালা, রাইতে কারা জাইগ্যা থাকে জানো?

কারা?

ভূত প্রেত চোর ডাকাইত—

মুখে তোমার লাগাম নাই চাঁন্দুর মা। ভূত প্রেত চোর ডাকাইতের সঙ্গে সোয়ামির তুলনা করো?

মেলা প্যাচাল পাইরো না তো—

নিজে তো শ্যাওড়া গাছ থিক্যা আইছো। পেত্নী না হইল্যে কি আর ভূত চেনতে পারে? যেমন হালার মায় তেমনি তার ব্যাটা, খবরের কাগজের বুকে মুখ রেখেই গুঁজ গুঁজ করে হারানিধি, আমি তায় ভাবি, রোজ রোজ বিড়ি কইম্যা যায় কুথায়?

খাইছে তো খাইছে!

তোমার আহ্লাদে আদরে ডাকাত হইবো।

তুমি তো বাপ, শাসন করো না ক্যান? চোখ বন্ধ রেখেই মুখে মোক্ষম চকর বকর করে মোক্ষদা।

চাঁন্দুরে শাসন করবো আমি? তুমি বাইচ্যা থাকতে?

হায় হায় রে! রাইত দুপুরে তুমি আমারে মইর‍্যা যাইতে কও? তড়াক করে

উঠে বসে মোক্ষদা। কপাল চাপড়ায়, নিজের বুকে নিজে থাবা দেয়, কি ভাগ্যিই না করছিলাম। তোমার হাতে পইড়্যা হাড় মাস কালি হইয়া গেল। গতর শুকাইয়া কাঠ হইয়্যা গেল—তবুও মন পাইলাম না।

পুরুষ মাইনষ্যের মন পাওন কি অতই সোজা চাঁন্দুর মা? ক্যাচাল না কইর‍্যা শুইয়্যা আছো, শুইয়্যা থাকো—দাঁত কিড় মিড় করে পরামর্শ দেয় হারানিধি।

কাল থিক্যা তাই করুম। চাঁন্দু আর টেপির লগে থাকুম, চোখ ঘুরিয়ে স্বামীকে ভূতের ভয় দেখানোর মতো শুনিয়ে দেয় মোক্ষদাবালা।

হঃ! আমারে ভয় দেখাইতাছো? ভালই হইবো! এই টুকুন তো খাট। হাত পা মেইল্যা ঘুমাইয়্যা বাঁচুম।

হুউম! বাঁচন মরণ সব আমার বোঝা আছে। একযুগ চার সাল হইয়্যা গেল—তোমার লগে ঘর করতাছি। রাত দুফারে হাঁক পাড়ন, ও চাঁন্দুর মা, পা টা টিইপ্যা দিয়া যাও—আইতে দেরী করলে নিজেই উইঠ্যা গিয়া ঠেইল্যা জাগাও। পোলা মাইয়ার ঘুম ভাইঙা যায়। লজ্জায় আমার মাথা কাডে—ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে ছাড়ে মোক্ষদাবালা।

তোমার আজ কি হইছে কও তো?

কি আবার হইবো? হইছে আমার কপাল—

একখান ভাল কথা কইতে গ্যালাম—

ভাল কথা তুমি কইয়্যা থাকো?

কমু কারে? ভাল কথা শোননের কান চাই। কালা মাইনষ্যেরে কেত্তনের লীলা গান শুনাইয়া লাভ কি?

কী? তুমি আমারে কালা কও? অন্ধ কও? রাতা পোহাইতে দাও—বিশ্বেস গিন্নিরে গিয়া সব কইয়া তবেই ছাড়ুম, তর্জনী উঁচিয়ে ভয় দেখায় মোক্ষদাবালা। মোক্ষম ভয়। জুজুর ভয়।

তা তুমি পারো। কুটরামির স্বভাব যে, বিশ্বাসগিন্নীর নাম শুনে জোঁকের গায়ে লবণ পড়ে। একটু মিইয়ে যায় হারানিধি। সত্যিই ক্ষমতা আছে বিশ্বাসগিন্নীর। খারাপ শরীরে সারাদিন শুয়ে থাকে বিছানায়। তবুও সংসারের সব নখদর্পণে। কাউকে একটা চড়া কথাও বলে না। বকাবকি তো দূরের কথা। তবুও সবাই তটস্থ। বিশ্বাসমশাই থেকে শুরু করে ঠিকে ঝি পর্যন্ত। হারানিধিও পৃথিবীতে যদি কাউকে ডরায় তো সে বিশ্বাসগিন্নীকে।

আমি কুটরামি করি?

করো না আবার? কইয়্যা দিও, বিশ্বেস গিন্নিরে কইয়্যা দিও তোমার গুণধর পোলার কথা। কইয়্যা দিও চাঁন্দু বিড়ি ধরছে।

না, কমু না! ক্যান কমু? আমি তো নিজের চক্ষে চাঁন্দুরে বিড়ি ফুঁকতে দেখি

নাই। কওনের হইল্যে তুমি কইয়ো। দেখি মুরোদ কতো?

মুরোদ লইয়্যা খোঁটা দিও না চাঁন্দুর মা।

না, দিম্যু না আবার! সব আমার জানা আছে—বলতে বলতে আবার বিছানায় চিৎ হয় মোক্ষদাবালা।

জাইন্যা জাইন্যা তো জানোয়ার হইয়্যা আছো? যতীন সেন ঠিক ছড়াই কাটছিলো—

যতীন সেন? সে আবার কেডা? নতুন কোনও তাসের সাঙাৎ বুঝি? ঘুমে চোখ কড় কড় করলেও বন্ধ করার উপায় নেই মোক্ষদার। কানের কাছে এমন গজর গজর করলে কি কারো ঘুম আসে?

সবই যদি তুমি জানবা, তবে আর মেয়েমানুষ কইছে ক্যান। দোপেড়ের ইস্কুলে বিত্তির গব্যে মাটিতে পা পড়ে না, বঙ্কিম চাটুজ্যে, যতীন সেনের খবর তুমি জানবা কোত্থেকে?

কাল চাঁন্দুরে জিগাইলেই জানতে পারুম। চাঁন্দু আমার গা গেরামের হক্কলের খবর জানে। তোমার মতো ঘর কুনো বিটকেল বুড়ো নয়।

হঃ! তালেই হইছে। চাঁন্দু দিবে যতীন সেনের খবর। যতীন সেন হইল্যো যতীন্দ্রকুমার সেন। আর্টিস। ছবি আঁকতো। একখান ছড়া যা কাটছিলো না—এক্কেবারে সত্যি। তুমাগোর লগে মানান সই—

কুচুটে—

ছড়াখান শোন তাইলে, খবরের কাগজ জলচৌকির উপর ছুঁড়ে ফেলে হারানিধি। শুয়ে থাকা মোক্ষদাবালা চাদর টেনে জড়িয়ে নেয় শরীর। শীত না পড়লেও হিম হিম ভাব। মাঝরাতের পরে শরীরে চাদরের ওম খারাপ লাগে না।

ছড়া ছাইড়্যা মশারি খান খাটাও—

তা তো খাটাইতেই হইব। নবাব কন্যে নিদ্রে যাবেন যে! মশার কামড়ে অঙ্গে বড়ো ব্যথা লাগবো—

ধুস! ধুস! জ্বালা হইছে। মহা জ্বালা। কাল থিক্যা কোন হালায় তোমার ঘরে থাকে—গায়ের চাদর ছুঁড়ে উঠে বসে মোক্ষদা। খাট ছেড়ে মেঝেতে নামে। খ্যাঁচ শব্দে খাটের নিচের টিনের তোরঙ্গ টেনে বের করে। নড়বড়ে কব্জাভাঙা ডালা খুলে হাতে তুলে নেয় তেলচিটে আদ্যিকালের মশারী।

"পত্নী ও পেত্নী শুধু 'এ' কারেতে ভিন্ন।/তবে পেত্নী কিছু রসিকা, পত্নী সদা খিন্ন!/দুয়ের স্বভাব এক—ঐ নাকে কথা কয়,/কৌশলেতে পেলে মোদের দেখায় বড় ভয়/সুযোগ পেলেই দুজনাই কাঁধে করেন ভর,/প্রাণনাথই জানেন কিবা ঘটে অতঃপর!"

নেচে নেচে সুর ছড়িয়ে ছড়া শোনায় হারানিধি। টু শব্দটিও না করে বিছানায়

চড়ে মশারী গোঁজায় ব্যস্ত থাকে মোক্ষদা। বউয়ের সে থমথমে মুখের উপর মশারিতে ঢেকে দেওয়া চল্লিশ ওয়াটের আলোর ফাঁক দিয়ে নজর বুলিয়ে নেয় হারানিধি। পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেওয়ালে ঝোলানো কাঠের কুলুঙ্গী থেকে তুলে নেয় বিড়ির কৌটো —কি গো চাঁন্দুর মা! যতীন সেনের ছড়াটা ভাল না? মতামত জেনে নিতে উদগ্রীব হারানিধি ঠোঁটের উপর বিড়ি চেপে ধরে, পরের লাইনগুলো শুনবা? জিজ্ঞেস করলেও মোক্ষদার উত্তর কানে আসার আগেই শুরু করে আবৃত্তি—"সোহাগ সমান দুজনার কোথাও নাহি খুঁত,/পত্নী বলে—'প্রাণনাথ', পেত্নী—'প্রাণের ভূত।'/দুয়ের মাঝে একটুখানি প্রভেদ কেহ পায়,/বলতে বড় লজ্জা আসে সবার কাছে তায়—/ পেত্নী কাঁধে ভর করিলে 'রামের' নামে যায়,/পত্নী পেলে প্রাণনাথে ছাড়ানো বিষম দায়।" ছড়া পড়া শেষ করে ফস শব্দে দেশলাই জ্বালায় হারানিধি।

রঙ্গ দেইখ্যা আর বাঁচি না। আরও কতো রঙ্গ দেখুম তুলসী তলায় শুইয়্যা, মুখ বেঁকিয়ে পাল্টা উত্তর শুনিয়ে দেয় মোক্ষদাবালা। বিছানা গোঁজা শেষ করে আশ্রয় নেয় চাদরের আড়ালে—বুড়া মাইনষ্যের ভীমরতি। পাশের ঘরে পোলা মাইয়্যারা হয়তো জাইগ্যা গেছে। বাপের কেলোপানা রঙ্গ শুনতাছে আর হাসতাছে—

আকাট মুখ্যু কারে কয়? বিড়িতে লম্বা টান দেয় হারানিধি, বেনা-বনে মুক্তো ছড়ায়ে লাভ কি?

অহন কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই উইঠ্যা যামু, আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা শরীরটার ভেতর থেকে হুমকি দেয় মোক্ষদা।

আমি তো আর ধইর্যা রাখি নাই—

হ্যাঁ দা। রাখবেন নাকি? রেতের জিরেন রস? বাইরে গলির রাস্তায় ছাড়া ত্রিনাথ মুনসীর হাঁক এসে আছড়ে পরে ঘবের ভিতর। কথা বন্ধ হয়ে যায় হারানিধির।

ওই! আইছে! বুড়া ভাম! রেতের জিরেন রস বিকাইতে আইছে। চুর কোথাকার। চুরি কইর্যা রস লইয়া আইছে। রসের নাগর। খবরদার কইতাছি—ডাকবা না। এই আমার মাথার দিব্যি দিলাম। জিরেন রস? হালায় তাড়ি মিশাইয়া লইয়্যা আসে। নেশ করায়। দিমু একদিন আঁশ বটি দিয়া গলা নামাইয়া—মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ফোঁস ফোঁস করে মোক্ষদাবালা।

ক্ষেত মজুরের কাজ করে ত্রিনাথ মুনসি। একটু হাত টানারও স্বভাব আছে শোনা যায়। রাত পড়তে না পড়তেই ক্রোশ দু'য়েক দূরের মাঠে চলে যায় মাটির কলসি কাঁধে। সারি সারি খেঁজুর গাছ উজার করে রস পেড়ে আনে। তারপর হাঁক দেয় বাড়ি বাড়ি—

রাখবেন নাকি গো দাদা? রেতের রস? জিরেন কাটা? এবার একেবারে মোক্ষদা হারানিধির ঘরের জানলার কাছে এসে হাঁক পাড়ে ত্রিনাথ। মোক্ষদা শুনেছে রসের হাড়ির সঙ্গে নাকি মালের বোতলও থাকে ত্রিনাথের ঝোলায়।

গেলাস খানেক চাইখ্যা দ্যাখলে হতো না, চাঁন্দুর মা? গলা নামিয়ে অনুরোধ ঢালে হারানিধি—দিব্যি কাটানোর দিব্যি অনুমতি চাওয়ার ঢঙে।

যা কওনের কইয়্যা দিছি, আবার চাদরে মুখ ঢাকে মোক্ষদা। শীতের নাম গন্ধ নাই, উনি লইয়্যা আইছেন জিরেন রস। আমাগেরও গাছ আছিলো। তিন কুড়ি নয় খান গাছ—

তা কথাটা মিথ্যে বলেনি মোক্ষদা—মনে মনে ভাবে হারানিধি। শ্বশুর তার ধানিপানি গেরস্থ ছিলো। মাঠ ভরা ধান ছিলো। ধান ক্ষেতের আলে আলে ছিলো খেঁজুর গাছ। শীতকালে হাড়ি হাড়ি গুড় তৈরি হতো। ঝোলা গুড়। পাটালি।

ও হারাদা! খাইবা নাকি জিরেন রস? হারাদা ও হারাদা? নাছোড় ত্রিনাথ জানালায় দাঁড়িয়ে নাম ধরে হাঁক দেয়।

না গো ত্রিনাথ। শুইয়্যা পড়ছি। শরীলটা ভালো নাই, জানালার কপাট বন্ধ রেখেই চাঁন্দুর মায়ের কথা মতো অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের মত জানিয়ে দেয় হারানিধি।

ক্যান তোমার হইলো টা কি? ত্রিনাথের মনপুতঃ হয় না হারানিধির উত্তর। পাল্টা প্রশ্ন করে জেনে নিতে চায় খদ্দেরের শরীর গতিকের অবস্থা।

একটু সর্দি হইছে—

তা তোমার পোলা মাইয়্যা বউ যদি খায়—

না, খাইবো না। হক্কলে ঘুমাইয়া পড়ছে, শেষ উত্তর শুনিয়ে ক্ষান্ত হতে চায় হারানিধি।

তবে বাতি জ্বলতাছে ক্যান? সকলের ঘুমিয়ে পড়ার সংবাদও বিশ্বাস হয় না ত্রিনাথ মুনসীর।

রঙ্গ হইতাছে। বাতি জ্বলতাছে ক্যান—দিবো হালার মুখে নুড়ি জ্বাইল্যা, গুঁজ গুঁজ চাপা শব্দে গুমরে ওঠে মোক্ষদা।

মালিশ করতাছি, তাই—দিনেরবেলার তাস খেলার সঙ্গী ত্রিনাথকে বউয়ের পরামর্শে চটাতে চায় না হারানিধি। মোলায়েম স্বরে মিথ্যে করে জানিয়ে দেয় বাতি জ্বলার কারণ।

ওঃ! হারানিধির জানালা ছেড়ে আবার রাস্তায় পড়ে ত্রিনাথ। হাঁক দেয়—রাখবেন নাকি? জিরেন রস—

চুর! বাইন্দর কোথাকার—রাগ তখনও পড়েনি মোক্ষদার, হইলো তো? নাও অখন বাতি নিভাইয়া দাও দয়া কইর‍্যা।

মাইনষ্যেরে অমন কড়া কথা কইতে নাই, বাতি নিভিয়ে মশারীর ভিতর ঢোকে হারানিধি। চিৎ হয়ে শুয়ে খোলা চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। চুপচাপ সুন সান ঘরে। মাঝে মধ্যে শোনা যায় কচর মচর ঘূণ পোকার কাঠ খাওয়ার শব্দ। চাঁন্দুর মা কি জেগে আছে, না ঘুমিয়ে পড়েছে—বুঝতে পারে না। বউটা তার বড্ডো অন্ধ।

পুত্র স্নেহে অন্ধ। চাঁন্দুর হাজার দোষও চোখে পড়ে না। চাঁন্দু যে বিড়ি খাওয়া শিখেছে—বিশ্বাস করে না। হারানিধিও অবশ্য নিজের চোখে বিড়ি খেতে দেখেনি চাঁন্দুকে। কৌটোয় বিড়ি কম হওয়ায় শুধু অনুমান করেছে মাত্র। কিন্তু চাঁন্দুর মা? চাঁন্দুর মায়ের তো বিশ্বাস করা উচিৎ। স্বামীর কথা শুনে খবর অনুসন্ধান করা উচিৎ। শাসন করা উচিৎ ছেলেকে।

চাঁন্দুর মা? ঝি ঝি-র ডাক ছাপিয়ে গলা নামিয়ে মোক্ষদাকে ডাকে হারানিধি। না, কোনও জবাব দেয় না মোক্ষদা। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। যা ঘুম কাতর মেয়েছেলে—বিছানায় পড়লো কি ঘুম।

ঘুমুলে নাকি, ও চাঁন্দুর মা? মোক্ষদার শরীর আস্তে ঠেলে দেয় হারানিধি।

কি হইলো আবার—ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে যায় মোক্ষদার।

ঘুমাইয়া পড়ছো?

না, ঘুমাবু ক্যান? রাইতে কি কেউ ঘুমায়? শুইয়্যা শুইয়্যা হা ডু ডু খেলতাছি, বিরক্তি ঝরিয়ে পাশ ফিরে শোয় মোক্ষদা।

কথার বান্ধনে তোমার লগে পাইর‍্যা ওটা দায়, ডানদিকে ফিরে শোওয়া মোক্ষদার গায়ের উপর বাঁ হাত তুলে দেয় হারানিধি।

রাতদুপুরে বিরক্ত কইরো না। সইর‍্যা শোও—

রাইত তো হয় বিরক্ত করার জন্যি, সরে নয়, মোক্ষদার আরও কাছে ফিরে আসে হারানিধি—তুমি অমন কথায় কথায় রাইগ্যা যাও ক্যান বউ?

উহ! সোহাগে আর বাঁচি নে। অকথা কুকথা কওনের সময় খেয়াল থাকে না? গায়ের চাদর সরিয়ে স্বামীর দিকে ফেরে মোক্ষদা।

তুমিও তো কম কও না—

মুখ সরাও! বিড়ির বাসে ভুর ভুর করতাছে—

তুমি যে কও বিড়ির গন্ধ তোমার ভাল্লাগে?

না, কই না? কখন কইছি, চাঁন্দুর বাবার কোলের কাছে নিবিড় হয় চাঁন্দুর মা। এক যুগ তিন চার বছরের পুরোনো বউকে শক্ত হাতের ফাঁসে আঁকড়ে নতুন করার চেষ্টা করে হারানিধি। কিন্তু বাদ সাধে পুরোনো নড়বড়ে খাটটা—

আহ! নড়নে চড়নে লাগাম দাও চাঁন্দুর বাপ, ফিসফিস শব্দে স্বামীকে সাবধান করে চাঁন্দুর মা, খাটের শব্দে পোলা মাইয়ার ঘুম ভাইঙা যাইবো—

কদমফুলের কদম ছাঁট

বাদলদিনে প্রথম কদম ফুল সেদিনই ফুটেছিল রাজনাথের জীবনে। ঠিক সেইদিন। রবিবারের কাগজে 'পাত্র চাই' কলমের বিজ্ঞাপন দেখে ননীবালা যেদিন যোগাযোগ করেছিলেন, ঠিক সেইদিনই। বিজ্ঞাপনের ভাষা আজও ভাসা ভাসা মনে আছে রাজনাথের—পাত্রী (২৬) পূবকা আগো সুসু হাসে প্রাচা (৩৫০০)। উপযুক্ত পাত্র চাই, কেস রাস অগ্রগণ্য। তারপরেই বাক্সের নম্বর।

বিজ্ঞাপনের বয়ান পড়ে বৃদ্ধা ননীবালা একবর্ণও বোঝেননি, পাত্রীপক্ষ কি জানাতে চাইছেন। 'ধুস!' শব্দে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রাজনাথ। আর তখনই ঘরে ঢুকেছিলেন দিদি জামাইবাবুই। মেঝেয় ছোঁড়া কাগজটা বুব্লির পায়ে লাগতে আঁৎকে উঠেছিল,—ওমা! সরস্বতীকে কি কেউ এমনি লাথ্ মারে? কর, শিগ্গির নমস্কার কর। কানে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নে সরস্বতী মায়ের কাছে!

না, দিদির কথা অমান্য করেনি রাজনাথ। মেঝের কাগজ হাতে তুলে মাথায় ঠেকিয়ে গুছিয়ে রেখেছিল টি-টেবিলের ওপর। আঝোর বৃষ্টির ধারা তখন আছড়ে পড়ছিল ওদের পুরোনো আমলের বাড়ির ফাটলে। কদমফুলের গল্প রাজনাথের জীবনে হয়ত সেখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু গেল না। সেন্টার টেবিলের সামনে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পাতায় নজর ছুঁড়ে দিল বুবলি। ভাইয়ের জন্যে না হোক, নিজের জন্যে পাত্র বাছাইয়ের কাজটা আজও ছেড়ে উঠতে পারেনি। স্বামী ব্রজেনের তা অজানা নয়। এক্ষুণি ঝুঁকে পড়বে। হো হো হেসে বলবে—দাওনা গো একটা পোস্টকার্ড লিখে। সেই বুবলির নজরেই পড়লো বিজ্ঞাপনটা—

—কই,দেখি দেখি!—বুব্লির কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের পাতা প্রায় কেড়ে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরেছিল ব্রজেন,—তুমি বুঝি এই বক্স বিজ্ঞাপনটার কথা বলছ?
—হ্যাঁ, পাত্রী(২৬) পূবকা আগো সুসু....। আমার তো মনে হয় কোনো উপজাতি আদিবাসী বা জনজাতীর ভাষা।

—আদিবাসীরা বেশ ডব্‌কা হয়। ভর্-ভরন্ত....।

—কথার কি ছিরি! ওইটুকু একটা পুঁচকে ছেলে আর মায়ের সামনে, ঝলসে উঠেছিলে বুবলি—মানুষের পরিচয় তার কথাবার্তায়। ছিঃ!

—বিজ্ঞাপনেও পরিচয় পাওয়া যায়!—ঠ্যা ঠ্যা হাসি ছড়িয়েছিল ব্রজেন। আর

তারপরই দুপুরের লাঞ্চ সেরে কোন ফাঁকে যে পোস্টকার্ড লিখেছিল, এখনো জানে না রাজনাথ।

উত্তর আসতেও বিলম্বে হয়নি। টানা টানা বনেদী হাতের লেখায় পাত্রীর বিবরণ। বিবরণের ভাষা বিবর্ণ করেছিল সঙ্গে আসা চম্পাকলির রঙিন ছবি। কুচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুল। লেখাপড়ার ডিগ্রীতে একটু খামতি থাকলেও চাকরি তো করে। সাড়ে তিন হাজার মাস-মাইনে। নিমরাজি হয়েও তেতো নিম শেষপর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছিলো রাজনাথ। পাত্রীপক্ষের উত্তরের উত্তরে দল বেঁধে ব্রজেন-বুবলি-রাজনাথ-ননীবালা এক গোধূলিবেলায় হাজির হয়েছিল বেলঘরিয়ায়।

তবে হ্যাঁ! কথাবার্তা পাকা করার আগে বিমলেন্দুবাবুর মুখে বিজ্ঞাপন রহস্য শুনে নিয়েছিল ব্রজেন। বুক টান করে হিসেবি মানুষটা কলম সেন্টিমিটারে অর্থের বহর কমানোর কসরৎ খোলসা করেছিলেন বয়ান ধরে ধরে— 'পূবকা' মানে পূর্ববঙ্গ কায়স্থ। 'আগো' অর্থাৎ আলিম্বান গোত্র। 'সুসুর' অর্থ সুশ্রী সুন্দরী। 'হাসে' মানে দাঁতের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যে—হায়ার সেকেন্ডারি। 'প্রাচা' অর্থ প্রাইভেট চাকরি। পাত্রীর অ্যাব্‌রিভিয়েশন ছেড়ে পাত্রের অগ্রগণ্যতাও গণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বিমলেন্দুবাবু—'কেস' মানে মাথার কেশ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারী আর 'রাস' শান্তিপুরের লীলার বদলে রাজ্য সরকারী।

—আপনি তো খুব রসিক বেয়াই মশাই।—চোখে খুসির ঝিলিক মিলিক উঁকি ছড়িয়ে হেসে ফেলেছিলেন ননীবালা।

—সাধে রসিক হইনি। বাধ্য হয়ে রসটম্বুর হতে হয়েছে।—নিজের পক্ষে ঝোল টেনেছিলেন বিমলেন্দুবাবু,—বিজ্ঞাপনে অযথা খরচ না করে সেই টাকায় জামাইকে একটা গরদের পাঞ্জাবি দিলে সার্থক হবে। তাছাড়া চম্পাকলি তো আর একা নয়—

—আমার কিন্তু পছন্দ হয়েছে। ভারি সুন্দর, লক্ষ্মী মেয়ে। আঙুল তো নয়—ঠিক চাঁপার কলি।—গলে একেবারে বিগলিত হয়েছিল বুব্‌লি।

—কি রে রাজু, বেয়াইমশাইকে কথা দিয়ে দেব? একঘর অচেনা মানুষ, তার ওপর লাজুক-লাজুক চম্পাকলি। মায়ের প্রশ্নের কী জবাব দেবে রাজনাথ? চাহিদা অবশ্য ছিল—চাকরি। 'সচার' বদলে 'প্রাচা'। সরকারী চাকরির বদলে প্রাইভেট। 'হাসের' বদলে রাজনাথের ইচ্ছে ছিল 'স্নামা'। স্নাতক মান। কিন্তু হল না।

—কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ড।—রাজনাথের মনের কথা হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন বিমলেন্দুবাবু।—তবে হ্যাঁ, স্টেনোগ্রাফিটা শেখাতে হয়েছে। নইলে চাকরি বাকরির যা বাজার, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ফ্যা ফ্যা ঘুরছে—চম্পাকলি কোন ছার! ওদের অফিসটা বড় ভালো বুঝলে বাবা, এক্কেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। একদিন গিয়ে দেখে আসতে পারো। ওই তো ডালহৌসি পাড়ায়। তোমার অফিসের কাছেই।

—কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ড মানে?—চম্পাকলির জলজ্যান্ত মা-বাবাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে আঁৎকে উঠেছিল ব্রজেন।

—সবই বড় সাহেবের কেরামতি। মাধবীলতা, মানে চম্পাকলির মায়ের নামের একজন স্টেনো টাইপিস্ট ছিলেন। আহা বেচারা, রিটায়ার করার আগেই বেবাগী হয়ে হরিদ্বার চলে গেলেন।—দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিলেন বিমলেন্দুবাবু।

—তুমি থামো তো ব্রজ। আম খেতে বসে গাছের ইতিহাস পড়া তোমাদের স্বভাব হয়ে গেছে!—জামাইকে বকে দিয়েছিলেন ননীবালা।

পাকাপাকি কথাবার্তার পাকাপোক্ত পাক দিয়ে ফিরেছিলেন ওঁরা। শুধু রাজনাথের মনে হয়েছিল নামটা বড্ড বড়—চম্পাকলি।

তা হোক, কদমফুল সেদিন ফুটেছিল রাজনাথের জীবনে।

শুধু কি ফোটা! আস্তে আস্তে জীবনটাই হয়ে উঠেছে কদমছাঁট। কদমছাঁট মনে নেই? সেই যে সেই, সেই ছোটবেলায় ইটপাতা ইটালিয়ান সেলুনে বসে চুল ছাঁটা। পাশে দাঁড়ানো গম্ভীর বাবা,—হারু, একেবারে কদম ছেঁটে দাও। চুল দেখলে যেন মনে হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর চলছে। ফুটুনির ফু-ও যেন না থাকে।

গত দশ বছরে রাজনাথের জীবনেও মন্বন্তর ছেয়ে গেছে।

ফুলের বিছানায় শুয়ে প্রথমে রাতেই বেড়াল তাড়িয়েছিল রাজনাথ। চম্পাকলির চম্পা-কলি আঙুলে আঙুল লেপেছিল,—বুব্‌লির নজর আছে। এমন কলি থাকতে চম্পার কি দরকার। তোমাকে আমি 'কলি' ডাকব। শুধুই কলি। কেমন?

—আর আমি?—রফা করতে চোখে চোখ রেখেছিল চম্পাকলি,—হ্যাঁগো, ওগো, শুনছ—বলতে পারব না। রাজু নামটাও ভালো না। রক রক গন্ধ। নাথ?—খিল খিল ফুটেছিল কলি,—বড্ড তেল্‌তেলে। ঠাক্‌মার আমলের নাম। সাতবছরের বালিকার ত্রিশ বছরের প্রাণনাথ! ধুস! ধুস! ধুস!

—তাহলে?—বড্ড চিন্তায় পড়েছিল রাজনাথ। নামটা কি তার সত্যিই বিশ্রী? প্রথম রাতের প্রেম একেবারে মচ্‌মচে ম্‌টকে গেছিল।

—অ্যাই!

—বলো!

—তোমাকে না আমি একটা নতুন নাম দেব—ঢলে পড়েছিল কলি।

—বেশ তো! দাও না। কিন্তু.....

—কিন্তু কি?

—মা, দিদি কিংবা জামাইবাবু যেন টের না পায়।—কনে নয়, বরের লজ্জায় চুপসে গেছিল রাজনাথ।

—যাব্‌-বাবা! আমার সাধের লাউকে সোহাগ করে ডাকতে পারব না?—চড়কগাছে চম্পাকলির চোখ উঠেছিল সেদিন গভীর রাতে।

—না, না, তা নয়। আসলে, ওরা তো আমাকে রাজু কিংবা রাজনাথ নামে

ডাকে তো, তাই বলছিলাম!

—শ্রীকৃষ্ণের ক'টা নাম ছিল বলো তো?—উত্তরের তোয়াক্কা না করেই উত্তর শুনিয়েছিল চম্পাকলি,—আমি তোমাকে রাজেন বলে ডাকব।

সেই থেকে কলি আর রাজেন। রাজেন আর কলি।

কদমছাঁট জীবনের শুরু নামের ছাঁট ধরে। রাজনাথের সঙ্গে রাজেনের কী সম্পর্ক? কে রাজেন? ফুলেল বিছানার রাতে প্রশ্নটা উঁকি না দিলেও কয়েকদিন পরে ভাবতে হয়েছে রাজনাথকে। রাজেন ডাকের গুঁতোয় নিজের নাম ভোলার আগেই একদিন খোল খুলতে চেয়েছিল। রমেন নয়, রতন নয়. রাতুল নয়, রাহুল নয়,—রাজেন কেন?

—পাড়ার ছেলে।—খ্যা খ্যা চম্পা-হাসি ছড়িয়েছিল কলি,—এইট-নাইনে পড়ার সময় একটু ইন্টু পিন্টু ছিল আরকি। পরে দেখলাম ভূষিমাল। এক টুস্‌কিতে দিলাম ফুটিয়ে।

—আহ! কলি, মুখের ভাষায় একটু লাগাম দাও। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। —বিরক্ত হয়েছিল রাজনাথ।

—কি বললে? ভদ্রলোকের বাড়ি? আমি ছোটলোক?—কাক তাড়ানোর সুরে হুশ্‌ হাশ করেছিল চম্পাকলি।

—দ্যাখো, দু'দিন পরে ছেলেপুলে হবে। তারা এইসব ভাষা শিখবে। তাছাড়া পাড়ার লোকের কানে গেলে....বোঝানোর চেষ্টা করেছিল রাজনাথ।

—পাড়া দেখাবে না।—টকাস্‌ টকাস্‌ টুস্‌কি ছাড়িয়ে তর্জনী তুলেছিল চম্পাকলি, —সব তো বাঙাল। পূর্ব বাংলার লাথ-খাওয়া মাল—

—আর তোমরা? তোমার বাবা বিজ্ঞাপনে ফলাও করে লিখেছিলেন—পূবকা। মনে নেই? কেলেঙ্কারি চাপতে, গর্জে না উঠলেও, গুড় গুড় আওয়াজ ঢেলেছিল রাজনাথ। মোক্ষম আওয়াজ। চম্পার কলি একেবারে কাৎ করার আওয়াজ।

এই ক'টা বছরের কদমছাঁট জীবনের দিকে ফিরে তাকালে এমনি সব ছায়াছবির অন্ত থাকে না রাজনাথের চোখে। চম্পার ভাষা-কলি নিয়ে শান্তি অশান্তিও কম হয়নি। লুকিয়ে চুরিয়ে ব্রজেনের কাছেও প্রকাশ করেছে রাজনাথ। চুক্‌ চুক্‌ শব্দে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া পথ পায়নি ব্রজেন। শালার বউকে তো আর শাঁসালো শাসন করা যায় না।

ননীবালা বিধবা গেরস্ত। আঁশ-নিরামিষ মানেন। কিন্তু চম্পাকলি মানে না।—ওসব ভ্যান্‌তাড়া ছাড়ুন তো। মাছের বাটির ছোঁয়ায় ডালের বাটি অশুদ্ধ হয়ে যায় জন্মেও শুনিনি।

তা, একটাই ছেলের বউ। নাও শুনতে পারে। সংসারে তো ওদের আর বিধবা কেউ ছিল না। মাফ্‌ করে দিয়েছেন ননীবালা। পেনশনের পাশবই নিয়ে

গিয়ে উঠেছেন বুবলির বাড়ি। জামাই-আদরে আছেন। বেঁচেবর্তে মেলা-গোলা হয়েছে চম্পাকলি। রাজনাথের মন অবশ্য খারাপ হয় মাঝে মধ্যে। মায়ের জন্যে কষ্ট হয় কিন্তু কলির 'রাজেন রাজেন' ছায়ায় লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় সব কষ্ট।

তবুও কদমছাঁট পিছু ছাড়ে না। বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল হাজারে কাতারে ভরে দেয় জীবনের গাছ। মেয়েটাও হয়েছে মায়ের মত। ভাষাও শিখেছে টর্‌টরে। গত বছর থেকে অবশ্য হস্টেলে আছে! ওয়ান ছাড়িয়ে ক্লাশ টু-য়ে উঠবে এবার।

—আজ একেবারে ফাইল বানিয়ে দিতাম।—অফিস ফেরৎ ঘরে ঢুকেই রাজনাথের সামনে হুমুড়ি খেয়ে পড়ে কলি। হাতের ব্যাগ ছুঁড়ে দেয় বিছানায়। ঝনাৎ ঝন্ শব্দে ব্যাগের ভেতর বেজে ওঠে খালি টিফিন-কৌটো। মোবাইল ফোনটা রাখে ড্রেসিং টেবিলে।

—আবার কি হল?—উৎকণ্ঠায় সোফার ওপর ঠেলে বসে রাজনাথ। আজ অফিস ছুটি। শনিবার। রাজনাথের ছুটি থাকলেও কলির থাকে না। কলি শুধু রবিবারের বিবি। 'প্রাচা' কিনা, তাই।

—চাঁদুর মতো হাঁটু মুড়ে বসে না থেকে চায়ের জলটা একটু চড়িয়ে দাও।—হুকুম শোনায় কলি,—চেঞ্জ করে এসে বলছি।

রাজনাথের প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে নাইটি হতে চম্পাকলি ঢুকে পড়ে চানঘরে। রান্নাঘরে ওভেনে লাইটার ঠুকতে ঠুকতে রাজনাথের কানে আছড়ে পড়ে চম্পার গানের কলি—দিল তো পাগল হ্যায়...

কাপ মেপে কেট্‌লিতে চায়ের জল ঢালে রাজনাথ। ফ্রিজ খুলে উঁকি দেয় দুধের সন্ধানে। আর তখনি বাথরুম থেকে শুরু হয় চম্পাকলির হাঁক,—রাজেন, আমার একটা ইয়ে দাও তো। আনতে ভুলে গেছি।

—কি দেব?—জেনে বুঝে নিতে চায় রাজনাথ।

—ন্যাকা? বলছি ইয়েটা দাও!—উত্তর ফিরিয়ে দেয় চম্পাকলি।

—ইয়েটা কি, বলবে তো?

—ব্লাউজের নিচেরটা! সত্যি মাইরি, তোমার মতো আবোধা বেটাছেলে আমি জন্মেও দেখিনি।—চানঘরের দরজা ফাঁক করে মুখ দেখায় চম্পা।

—আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। তুমি নিজে এসে নিয়ে যাও।—হন্ হন্ পায়ে চানঘর আর ডাইনিং স্পেসের জায়গা ছেড়ে রান্নাঘরে পালায় রাজনাথ। ফুটন্ত জলে চায়ের পাতা ফেলে দেয়। তারপর চিনি এবং সবশেষে দুধ। ওভেনের আঁচ নিভিয়ে ঢাকা দেয় কেটলির মুখ।

মেয়ের বাড়ি কেটে পড়ে নিস্তার পেয়েছেন ননীবালা, মনে মনে ভাবে রাজনাথ। দোয়েলকেও দাঁড় টপকে উড়িয়ে দেওয়া গেছে হস্টেলে। চম্পাকলির সংসারে এখন সারহীন সঙ বসে আছে রাজনাথ ওরফে রাজেন। প্লেটের ওপর

কাপ সাজাতে সাজাতে মনে পড়ে লক্ষ্মণ মল্লিকের মুখটা। একগাল কাঁচা-পাকা কদমছাঁট দাড়ির ফাঁকে দিব্যি নিশ্চিন্ত হাসির প্রলেপ। কবিতা লিখত লক্ষ্মণ মল্লিক। প্রেমের কবিতা। প্রেম-যন্ত্রণার কবিতা। প্রেমের পাঠশালা থেকে পালানোর কবিতা। নিজের পয়সায় সমরের প্রেস থেকে বই ছাপাত—কবিতার বই। বিক্রি করত না। উড়ো খই কিংবা হরির লুটের মতো বিলিয়ে দিত চেনা অচেনা মানুষের কাছে। রাজনাথ জানে, লক্ষ্মণ মল্লিকের সেইসব কবিতার বই কেউ পড়ত না। দু-একবার পড়ার চেষ্টা করেছিল রাজনাথ, কিন্তু পারেনি। কেড়ে নিয়েছে কলি, চম্পাকলি। শুধু চম্পাকলিই নয়, পরিচিত অনেকেই খবরের কাগজ বিক্রির সময় ওজন বাড়িয়েছে। সেসব কথা লক্ষ্মণ মল্লিক জানত। তবুও কবিতা লিখত। বই ছাপাত। বিলি করত। বউদি নাকি দজ্জাল ছিল। নিজমুখে বহুজনকে বহুবার বুক ফুলিয়ে সেসব কথা জাহির করেছে লক্ষ্মণ মল্লিক। তবু ফি বছর একটা করে সন্তানের মা হত বউদি। হাসাহাসি করত সমবয়সী কলিগরা। অফিসে বড়বাবু কখনো বোঝাত। কখনো ধমকাত—ভেসেকটমি কিংবা লাইগেশন করাতে পারো না? জিজ্ঞেস করত লক্ষ্মণ মল্লিককে। আর লক্ষ্মণ মল্লিক? দিব্যি হাসি ছড়িয়ে দিত,—উৎপাদন ব্যবস্থায় কবিরা কি অত হিসেব নিকেশ করে চলতে পারে?

—এই যে বলো দজ্জাল বউ তোমার?—ধমকে জিজ্ঞেস করত বড়বাবু। পাশের টেবিলে থেকে টিপ্পনী ছুঁড়ত শান্তিনাথ বসু,—দিনে দজ্জাল, রাতে লক্ষ্মীমণি—তাই না লক্ষ্মণ?

—কি করব বলো, স্ত্রী সহবাস তো সামাজিক দায়।—বলতে বলতে নিজের টেবিলে ফিরে যেত লক্ষ্মণ মল্লিক। ফাইলের বদলে খুলে বসত ডাইরি। খচাং ঘ্যাচাং লিখে ফেলত নতুন একটা প্রেমের কবিতা।

চম্পাকলির সঙ্গে সংসারের দোলনায় দোলাটাও একটা সামাজিক দায়। মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় রাজনাথ। হাজার হোক পরের মেয়ে। বিয়ে যখন করেছে তখন মানাতে তো হবেই।

কিন্তু....।

রাজনাথের কি কোনো দায় নেই? কোনো দায়িত্ব নেই?

কেটলির ঢাকনা খুলে ভিজে যাওয়া চায়ের বাস নাক ভরে নিতে নিতে ঘাড় নাড়ে রাজনাথ। সে নিজেই তো চেয়েছিল চম্পাকলি একটা স্মার্ট মেয়ে হয়ে তাকে জুড়ে থাক। আলুভাতে মেয়েদের চেয়ে চিলি চিকেন মেয়েরা পথে ঘাটে অনেকে অনেক বেশি নিরাপদ। হ্যাংলা পুরুষ জাতেরা চোখে গিলতেও ভয় পাবে।

তাই বলে রকের স্মার্টনেস? মেয়ে রকবাজ? অন্তত ভাষার ছিরি-ছাঁদে তো সেরকমই মনে হয় রাজনাথের।

—একদম কিপ্টেমি করবে না বলছি।—সন্ধের স্নান সেরে নাইটি পরা ঝরঝরে

কলি রান্নাঘরে তার নিজস্ব রাজেনের পাশে দাঁড়িয়ে আঙুলে টুসকি তোলে,—ডবল হাফ, মানে আধ কাপ চায়ে কিন্তু আমার পোষাবে না। মাথাটা শালা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। শরীরটাও কেমন কেৎরে আছে।

ডাবল হাফে যে ফুল হয় না সে সংবাদটা রাজনাথের জানা ছিল কলেজ জীবন থেকেই। চম্পাকলির চায়ের স্বভাবও অজানা নয়। আগ বাড়িয়ে আদেশটা না দিলেও পুরো কাপ চা-ই বরাদ্দ হত চম্পার। আদেশ শুনিয়ে ঝিম্‌ঝিম্ মাথায় কেৎরে থাকা শরীর টানতে টানতে সোজা বেডরুমে চলে যায় চম্পা। রাজনাথের কানে শুধু ভেসে আসে আসে গানের কলি—আঁখিয়োঁ সে গোলি মারে....

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত রাজনাথ এখন ভুলেই গেছে 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না'-র সুর। ভুল করেও এখন আর টেপ চালায় না রাজনাথ। চম্পাকলির ডোন্ট কেয়ার ভাব তো প্রথমদিন থেকেই ছিল। তার ওপর স্মার্টনেসের প্রলেপে প্রশ্রয় দিতে দিতে যে বুমেরাং তৈরি হয়েছে তার জন্য নিজেকেই দায়ী করে রাজনাথ। ক'দিন হল নতুন শখ শুনিয়েছে চম্পা—রবিবার থেকে নাকি রকে বসবে। পাড়ার দু'একটা মেয়ে বউকেও ভজাতে পেরেছে। বোঝাতে পেরেছে, ছেলেরা যদি রকবাজি করতে পারে মেয়েরা পারবে না কেন? ছেলেরা যদি মেয়েদের দেখে সিটি দিতে পারে মেয়েরাই বা ছেলেদের চোখে এক চোখ রাখবে না কেন? দু'টো রবিবার পার হয়ে গেছে, শখ পূরণের বিভীষিকা এখনো গ্রাস করেনি—এই যা ভরসা।

—বিস্কুট আনোনি?—রাজনাথের হাতে খালি প্লেট দেখে বিরক্ত হয় কলি, —খিদেয় পেট ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

—মুড়ি খাবে? চানাচুর বাদামভাজা দিয়ে?—কলির সামনে চায়ের দু'টো কাপ-প্লেট নামিয়ে জানতে চায় রাজনাথ।

—ঘরে বসে বসে সিগ্রেট না ফুঁকে ক'টা বেগুনিও তো এনে রাখতে পারতে। চানাচুর-মুড়ি? রাবিশ।—নিজের কাপ কোলের কাছে টেনে রিমোটে চ্যানেল ঘোরাতে ব্যস্ত হয় চম্পাকলি।

বাধ্য স্বামীর কর্তব্য পালন করতে আবার রান্নাঘরে ফেরে রাজনাথ। বিস্কুটের কৌটো খুলে গলা চড়ায়,—ক'টা আনব?

—যা টাক্‌রা মট্‌কানো বিস্কুট, দু'টো নিয়ে এসো।—হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে জবাব শোনায় চম্পাকলি।

থিন অ্যারারুট। সত্যিই টাক্‌রা মট্‌কে দেয়—ভাবে রাজনাথ। বড্ড বেশি আটা। আগামী মাস থেকে অন্য কোনো মুচ্‌মুচে বিস্কুট আনতে হবে।

—কিঙ্করদা আজ ব্যাটারি টেস্ট করতে মেল করেছিল।—বিস্কুটের কামড় মুখে আর টিভির পর্দায় চোখ রেখে অফিসের গল্প শুরু করে চম্পা।

—কোন ব্যাটারি?—চায়ে চুমুক দেয় রাজনাথ।

—মোবাইলের ব্যাটারি। আর কোন ব্যাটারি অফিসে থাকে শুনি? তোমার প্রশ্নগুলো বড্ড ট্যারা। কিঙ্করদার যা বয়েস তাতে আর ব্যাটারি টেস্ট করার দরকার নেই।—বলতে বলতে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে চম্পাকলি—আমিও বললাম, দাদা, আমারটা একটু মেল করে দেবেন। কিঙ্করদা বলল—নম্বর বলো। মোবাইল অফ করে ব্যাটারি খোলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। বললাম—কিঙ্করদা খুলতে পারছি না যে। উত্তরে বলে কিনা, এখনো খুলতে শিখলে না। ভালগার! শুকুন। কথা শুনে আমার খুউব রাগ হয়ে গেছিল। ইচ্ছে করেছিল বড় সাহেবের কানে তুলে ব্যাটাকে একেবারে ফাইল করে দিই। কিন্তু চেপে গেলাম। শুকুন কোথাকার। খালি ভাগাড়ের দিকে নজর।

—তোমরা তাহলে ভাগাড়, কি বলো?—রাগ ক্ষোভ বিরক্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় হাল্কা রসিকতা করে রাজনাথ।

—ভাগাড় না হলে তোমাদের মতো সব শকুনরা কোথায় ঠ্যাং ছড়াবে শুনি? তুমি একটা হিংসুটের ডিম। দাও, কাপ দাও।—চা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় চম্পাকলি, —সন্দেহ করা ছেলেদের স্বভাব। দশ বছর তো হয়ে গেল। কোনো শালা ডিঙা ভেড়াতে সাহস পেয়েছে? হিম্মত থাকে তো আয়—রদ্দার ঘা খেয়ে ঘা।

টিভির পর্দায় চোখ রাখে রাজনাথ। সিরিয়াল চলছে। কৃষ্ণলীলা। কদমগাছের মগডালে শুয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। ঠোঁটে বাঁশি। গাছের নিচে ললিতা বিশাখারা জ্ঞান দিচ্ছেন শ্রীরাধাকে ঘিরে। শ্রীরাধার চোখে প্রেমাকুতির ধারা। সেই ধারায় বিগলিত শ্রীকৃষ্ণ মজা করার জন্যে টুক্ করে একটা কদমফুল ছুঁড়ে দেন শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে।

আবার কদমফুল। রিমোটের নব চেপে চ্যানেল ঘুরিয়ে দেয় রাজনাথ। বাদল দিনে প্রথম কদমফুলের মোহ এখন কদমছাঁটে ছাঁটা হয়ে আছে। শুধু ঝাঁটার মাথায় চড়ে বসতে বাকি।

—অ্যাই, জানো,—মুখের ভেতর একরাশ মৌরি ঠুসে খাটে বসা রাজনাথের পাশে এসে দাঁড়ায় চম্পাকলি।

—কি?

—পরশু রবিবার, মা আসছে।

—কার মা?

—কেন, তোমার মা, আবার কার? তোমার মা বুঝি আমার কেউ নয়? লেব্-বাব্বা!

—কোন দুঃখে?—উদাস গলায় বাউল হতে ইচ্ছে করে রাজনাথের।

—কথার কি ছিরি! ছেলে-বউয়ের সংসারে মা কী দুঃখে আসে? তুমি ওস্তাদ একটা আস্ত লুডুস।—রাজনাথের পাশে নিবিড় হওয়ার চেষ্টা করে চম্পাকলি।

—না না। ওসব ঝামেলায় দরকার নেই। আমি বরং ফোনে বারণ করে

দিচ্ছি।—শিউরে ওঠে রাজনাথ। ঝগড়া-ঝাঁটি অশান্তি আর ভালো লাগে না।

—তা তো করবে! গরম তেলে বেগুন ছাড়ার ঝাঁঝে ছিট্‌কে যায় চম্পাকলি, —আমাকে অপমান অপদস্থ না করলে কি তোমার ঘুম হবে? কত কাণ্ড করে মাকে আসতে রাজি করালাম। এখন তোমার বেগড়বাঁই শুরু হল? কেন? আমি কি তোমার মায়ের গায়ে গরম তেলের ছ্যাঁকা দিয়েছি, না বাড়া ভাতে ছাই ঢেলেছি? যার জন্যে চুরি করি সেই কি না চোর বলে?

—আহ্ কলি—

—থাক, আর আদিখ্যেতা করে কলি কলি গাইতে হবে না। আমি কি কিছু বুঝি না ভাবছ? সব বুঝি। মেয়েটাকে কায়দা করে হস্টেলে পাঠালে। মাকে পাঠালে দিদির বাড়ি ঘর-শাশুড়ি থাকতে। কুচুটে ল্যাবোডুম্পুস। আবার প্রেম উথলে ডাক পাড়ছে—কলি! কিসের কলি? কোনো কলি চলবে না। আমার নাম চম্পাকলি, ডাক নাম বুড়ি। ব্যস।

—মা আসা মানেই ঝামেলা। তোমার বাক্যি মা'র কানে সইবে না। অযথা অশান্তি হবে। আমার একদম ভাল লাগে না এসব।—গলার স্বর যতটা সম্ভব মোলায়েম করার চেষ্টা করে রাজনাথ।

—ভালো লাগে না? ভালো লাগবে কেন? বউ মানে তো তোমাদের কাছে ঝি-চাকর রাঁধুনি আর রাতেরবেলায় হাড়কাটা গলির কি যেন সেই কর্মী? তোমার ভালো লাগবে কেন? আমি যে সব নেড়ে ঘেঁটে একসা করে দিই। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলি। উচিত কথা উচিত শব্দে ঝাড়ব। রঙ চড়িয়ে গীতার বচনে ঝাড়তে পারব না।—দপ্‌দপিয়ে জ্বলে ওঠে চম্পাকলি।

—বলো না, যত পারো উচিত বলো। ভদ্র ভাষায় বলো।—বিরক্ত রাজনাথ এবার সত্যি সত্যি রেগে যায়।

—বেশি ভাংটামি কোরো না। তোমরা শালা খিস্তির ঝড় তুললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। আর মেয়েদের বেলায় যত ভাংটামি। পারব না, এর চেয়ে শুদ্ধ ভাষা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।—সাফ জানিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায় চম্পাকলি। ফ্রিজের খাবার গরম করতে হবে। খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে গজর গজ্ আপন মনে বকে যায় চম্পা,—মুডটাই অফ্ হয়ে গেল। ভালো ভালো খবর শোনাতে গেলাম, তো ভাষার বিন্যাস করতে বসল। ইচ্ছে করে একটা বোম্ টপ্‌কে শালার সংসার ছারখার করে দিই। তোমারই তো মা আসছে। একটু পনির আনতে পাঠাব ভাবলাম, তা বাবার মাথা সব গুলিয়ে দিল। ফাইল করে দিল পনির আনার কথা।

চম্পার গজ্‌গজানি ঢাকতে টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দেয় রাজনাথ।

—কানের মাথাও কি ফাইল হয়ে গেছে? না লাটে উঠেছে? টিভি চলছে না ছোটকাদের রকে পিকনিক হচ্ছে?—রান্নাঘর থেকে চিৎকার করে চম্পাকলি।

চম্পাকলির সে চিৎকার টিভির আওয়াজ উপচে আছড়ে পড়ে রাজনাথের কানে। রিমোটের লাল নবে রাগের লাল আঙুল চেপে বন্ধ করে দেয় টিভি। নজর ছুঁড়ে দেওয়াল ঘড়িতে সময় পড়ে নিয়ে টাওয়েল হাতে ঢুকে যায় চানঘরে।

আবার কদমফুল। জীবন-ঘর উপড়ে এখন চানঘরে? চানঘরে বালতিতে ভেজানো একরাশ কদম ফুল দেখে চমকে ওঠে রাজনাথ। নিশ্চয়ই অফিস-ফেরতা বেলঘরিয়ায় গেছিল চম্পা। বাপের বাড়ি থেকে কদমফুলের কুঁড়ি নিয়ে এসেছে। জলে ভিজিয়ে ফোটাতে হবে। গোলাপ রজনীগন্ধা যুঁই চামেলি নয়—কদমফুল! কদমফুল ছাড়া কি আর কদমছাঁট জীবন বানানো যায়? দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চানঘরের কাজ সারে রাজনাথ।

—অতগুলো কদমফুল দিয়ে কি হবে?—ডাইনিং স্পেসের করিডরে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে জানতে চায় রাজনাথ।

—আমার বড়িতে দেব। সাদা কাপড় মুড়ে শুয়ে থাকা বড়িতে গোল গোল কদমফুলের মালা।

—তোমার বড়িতে দিতে যাবে কোন দুঃখে? দিও আমার বড়িতে। বেঁচে থাকতে তো জীবনটাকে কদমছাঁট করে ছেড়েছ। মরে গেলে বরং কদমের মালা পরিয়ে ষোলো কলা পূর্ণ কোরো।—উত্তর দেবে না ভেবেও শেষপর্যন্ত নিজেকে সামলাতে পারে না রাজনাথ।

—দ্যাখো, বেশি উস্‌তাড়া করলে আমি কিন্তু এখনই ফোন করে মাকে জানিয়ে দেব।--খুন্তি হাতে অসুর বধের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় চম্পা।

—কী? কী জানাবে তুমি?

--জানিয়ে দেব,—দোহাই আপনার, ছেলের বাড়ি আসার কথা ভুলে যান। আপনার ছেলে পছন্দ করে না, আপনি এখানে আসুন।

—আমি পছন্দ করি না? না তোমার জন্যে মা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে? বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথাটা বলো দেখি।—খুন্তির ভয় উড়িয়ে রান্নাঘরের দরজায় চম্পাকলির মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায় রাজনাথ।

আর ঠিক তখনই বেডরুমে বেজে ওঠে ঝনঝন্ টেলিফোন।

--কে মা? কেমন আছ?—দৌড়ে এসে রিসিভার কানে তোলে রাজনাথ—হ্যাঁ শুনলাম। তোমার বউমা বলছিল। পরশু না কাল? কাল? কিন্তু কাল তো শনিবার। না, আমার অফিস নেই। তোমার বউমা তো অফিস যাবে— । পাঁচুর মা কি আমিষ নিরামিষ আলাদা করতে পারবে?

—আপনার ছেলের তিক্‌রম-বাজি কথা ছাড়ুন তো। যত্তসব ভাক্‌কা কপচানি। আপনি কালই চলে আসুন মা। আমি সি. এল. নিয়ে নেব।—রাজনাথের হাত থেকে এক ঝটকায় টেলিফোন কেড়ে ননীবালাকে আমন্ত্রণ করে চম্পাকলি। কথা শেষ

করে রিসিভার ক্রেডেলে রেখে রাজনাথের চোখে চোখ ছোঁড়ে,—এমন ভ্যাদকা মারা ছেলে জন্মেও দেখিনি।

—একটা কথা বলবে?

—কি?

—মাকে এখানে আসতে প্রভোকেট করল কে?

—কি কেট?

—প্রভোকেট। মানে উস্কানি।

—প্রভোকেট, উস্কানি বুঝি না। তবে ফুসলানি দিয়েছি আমি। অফিস ফেরতা গিয়ে গিয়ে ফুসলে রাজি করিয়েছি। রোজ বলেছি—মা আপনি চলে আসুন। আপনার ছেলের জীবন দিন দিন কদমছাঁট হয়ে যাচ্ছে। আপনি এসে চাঁপা ফোটান।—তারিয়ে তারিয়ে নাটকের ডায়লগ বলার মতো বলে চম্পাকলি।

—হচ্ছেই তো। মা এলে আরো হবে। সেই কারণেই তো একরাশ কদমফুল আগেভাগে এনে জড়ো করেছ।—মায়ের ফিরে আসার খুশিতে ভেতরে ভেতরে ডগোমগো হয়ে উঠলেও মুখে প্রকাশ করে না রাজনাথ। তাছাড়া চম্পাকলির যা ভাষা, কদ্দিন যে মাকে তিষ্ঠোতে দেবে কে জানে।

—আই।—ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ানো রাজনাথের পাশে নিবিড় হয় চম্পাকলি।

—কি?

—আমি বুঝি খুউব খারাপ মেয়ে? বিশ্বাস করো, কথাবার্তা ফাইল করে দেওয়ার কত চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। রাজনাথের সদ্যস্নাত পিঠে মুখ লুকোয় চম্পাকলি, —মাকে ফিরিয়ে আনছি বলে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ রাজেন?

—অনেক রাত হল। খেতে দেবে না কলি?—ঘুরে দাঁড়িয়ে চম্পার সেই প্রথম বাদল দিনের চোখে চোখ রাখে রাজনাথ।

বই-বাহকের বই-তরণী

ঠিকই বলতেন অমরদা, মনে মনে আউড়ে নেয় তাপস। অমরদা বলতেন, বই আর বউ—একবার বাইরে বের করেছ কি রক্ষে নেই। ঘরে ফেরাতে পারবে না। দেওয়াল চেপে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকিটা তাপসের নিজের মনে মনে বলা মনের কথা বুঝে নিয়ে টিকটিকে আওয়াজে অমরদাকেই সমর্থন করে। তাপস শুধু ঘাড় নাড়ে—ঠিক! ঠিক!

সেই কবে, কতো বছর আগে কলেজ পড়ুয়ার বয়সে অমরদাই ছিলেন আদর্শ বন্ধু। বয়সে দ্বিগুণ হলেও চাল চলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তায় ছিলেন একেবারে অমায়িক। বৌদির তো তুলনাই ছিলো না। মায়ের স্নেহে শাসন করতেন। দিদির ভালোবাসায় রাখী পরাতেন, ভাইফোঁটা দিতেন। বৌদির প্রগলভতায় ঠাট্টা তামাসাও করতেন। সেই বয়সে অমরদা আর বৌদির আকর্ষণ তাই অমোঘ ছিলো তাপসের কাছে।

আলাদা লাইব্রেরী ঘর না থাকলেও বইয়ের একটা আলাদা ঘর ছিলো অমরদার। র‍্যাকে র‍্যাকে বই। খাট সোফা চেয়ার টেবিলে থাক থাক থই থই বই। অমরদার সেই থই থই বই ঘরে দাঁড়িয়ে বুক ভরে প্রশ্বাস নিতো তাপস। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোষে কোষে কষে ভরে নিতো বইয়ের সোঁদা গন্ধ। কখনও কখনও নেড়ে চেড়ে পড়ে ফেলতো দু'চার লাইন। সাহিত্য থেকে শুরু করে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সব বিষয়ের বই-ই থিক থিক করতো অমরদার ঘরে।

বইগুলো একটু সাজিয়ে রাখতে পারেন না অমরদা? অভিযোগ করতো তাপস।

না, পারি না—চোখ বন্ধ করে অন্ধ উত্তর শোনাতেন অমরদা।

কেন?

কারণ ওটাই বিউটি। আমার সংসারে বই আর বউয়ের ওই একটাই বিউটি। অগোছালো রাখা এবং থাকা। কেয়ারলেস্। বৌদিকে দেখো না, কেয়ারের কোনও ধার না ধেরে কেমন বিউটিফুল হয়ে আছেন—এঁকগাল কদম-খোঁচা দাড়ি চুলকে বুঝিয়ে দিতেন অমরদা।

মানে? তাপসের সারল্য ঠাঁই পেতো না অমরদার উগরে দেওয়া উপমার অর্থ উদ্ধার করতে।

এটাও বুঝলি না? এই দ্যাখ—একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন অমরদা।

রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের পাশে শুয়ে থাকা 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন কেয়ারলেস বিউটি-র মানে। বলতেন, এটাই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। তারপরই অঙ্গুলী হেলন করতেন বৌদির দিকে—বই তো দেখলি। এবার বউ দ্যাখ। এই বয়সেও আঁচল একপেশে করে কেমন সুন্দর বিজ্ঞাপনের পট সেজে তোদের মতো দেবরদের নিজের দেবোত্তর সম্পত্তিতে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এটাও একটা বিউটি। কেয়ারফুলি কেয়ারলেস থাকার বিউটি।

অমরদার কথা শুনে লজ্জায় লাল টোপাফুলের মুখ হতো তাপসের। আঁচল সামলে রে রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বৌদি,—বুড়ো বয়সে এই সঙ্গ অসভ্যতার আদিখ্যেতা করে ছেলেগুলোর মাথা না খেয়ে দু'চারটে ভালো কথাও তো বলতে পারো!

কথার আবার ভালো-মন্দ। ভালো-মন্দ যা কিছু সব তো মনে। মনের ভিতরের অচিন পাখিই তো কথা হয়ে মুখ ফস্কে উড়ে যায়—বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়তেন অমরদা।

—তাই বলে যা ইচ্ছে তাই বলবে? ওরা আমাদের চেয়ে বয়সে কত ছোট বলো তো? —প্রতিবাদ করতেন বৌদি।

—না দেখলে, না শুনলে ছোটরা বড়ো হবে কেমন করে? ছোটরা যতো দেখবে ততো জানবে। যতো জানবে ততো তাড়াতাড়ি বড়ো হবার ইচ্ছা হবে। আঁচলের পেছনের পৃথিবীকে দেখার আগ্রহ নিয়েই তো বড়ো হওয়ার ব্যগ্রতায় মেতে উঠবে—বৌদির চোখে চোখ রেখে পাল্টা বলতেন অমরদা। তারপর নিজের ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিতে দিতে বৌদিকে খুশি করার জন্যে বকে দিতেন তাপসকে —খবরদার বলছি, বৌদির চেহারার ক্যানভাসে ভুল করেও চোখ দিবি না।

—মা জিজ্ঞেস করছে তুমি কি ব্যাঙ্কে যাবে? মামনের প্রশ্নে অবস্থানে ফিরে আসে তাপস। অমরদা আর বৌদিকে ঘিরে এতোক্ষণের স্মৃতির ডুবজল ছেড়ে উঠে আসে ডাঙায়।

—মাকে জানিয়ে দাও আজ গুরু নানকের জন্মদিন। ব্যাঙ্ক বন্ধ। মেয়ের মাধ্যমে উত্তর ঠেলে দেয় তাপস।

—তোমার বাবাকে বলে দাও আমি কচি খুকি নই। ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও এ টি এম-এর দুয়ারে তালা ঝোলেনি। —রান্নাঘরে কড়াইয়ের গরম তেলের পিঠে মাছের পেটি ছাড়তে ছাড়তে মামনের মাধ্যমেই তাপসের অজুহাত উড়িয়ে দেয় সাধনা।

—শুনলে তো! মা বললো, এ টি এম খোলা আছে,—কোমরে হাত চেপে রান্নাঘর আর ডাইনিং স্পেস, সাধনা আর তাপসের—মা ও বাবার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দোভাষীর ভূমিকা পালন করে মামন।

—শুনলাম। খোলা থাকলেও এ টি এম থেকে টাকা তুলবো না। খারাপ এ

টি এম-এর খেসারত এখনও সাত হাজার টাকার ডেবিট আমার অ্যাকাউন্টে ঝুলছে—থুতু গিলে শ্বাস নেয় তাপস।

—যন্ত্রপাতি এক আধবার ফেল করতেই পারে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করো আজ মাসের কতো তারিখ? এক তাল, এক লয়, এক সুরেই মেয়েকে পরামর্শ দেয় সাধনা।

—আমি কি ক্যালেন্ডার না পঞ্জিকা? কোন মাসে, কতো তারিখ সব রিলে করতে হবে?—মামনের চোখে চোখ রেখে স্ত্রীর উদ্দেশে ধমক ঝাড়ে তাপস। বেড়াল মেরে ঝি শাসন করার ভঙ্গীতে।

—কথার কি ছিরি! ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা হলে তবুও একটা কাজে লাগতো। মানুষের উপকার হতো।—গজগজে জবাব শোনায় সাধনা। তারপর নিজেই নিজের বক্তব্য পৌঁছে দেয় উপসংহারে,—হিংসুটে কুচুটে লোকেরা কখনও কারও ভাল করতে পারে না। আমার কি! হাবুলদা, পেপারওয়ালা, দুগ্‌গি, ছবি, রূপা সবাইকে বলে দেবো মাস পয়লায় আমাকে যেন বিরক্ত না করে। যার সংসার, যার টাকা—তার কাছেই যেন তাগাদা দেয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ! এ মাস থেকে তাই করবো। কমিশন খাওয়া একদম বন্ধ করে দেবো,—ডাইনিং টেবিলের উপর খবরের কাগজ ছুঁড়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায় তাপস।

—কী! আমি কমিশন খাই? ক'টাকা তোর বাবা এক্সট্রা দেয় যে কমিশন খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছে?—খুন্তি হাতে মামনের সামনে অসুর-বিনাশিনীর ভঙ্গীতে আবির্ভূতা হয় সাধনা।

—দ্যাখো মা, তোমরা আমাকে টানবে না। সকাল থেকে সেই যে শুরু করেছ! —এন সি সি প্যারেডের 'পিছে মুড়' হওয়ার চেষ্টা করে মামন।

কিন্তু পারে না। তাপসকে টপকে সরাসরি মেয়ের মুখোমুখি হয় সাধনা,—আমি শুরু করেছি? হ্যাঁ, তা তো বলবিই। যেমন বাপ তেমনি তার বেটি না হলে চলবে? আমড়া গাছে কখনও আম হয় না। আমি চেষ্টা করলে কি হবে, আমড়া গাছে আমড়াই হবে।—মামনের উপর একরাশ বিরক্তি প্রকাশ করে আবার রান্না ঘরে ফিরে যায় সাধনা,—যে কটা টাকা এক্সট্রা থাকে তাই দিয়ে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্তর তো কম কিনি না...।

—সেই টাকায় তোর মাসিকে তো একসেট রবীন্দ্ররচনাবলী কিনে দিতে পারে, —ডাইনিং স্পেস ছেড়ে বেডরুমের চৌকাঠে পা দিতে দিতে ফোঁড়ন দেয় তাপস।

—একটা কথা বলবো বাবা?—নরম আদুরে সুরে জানতে চায় মামন।

—বল না, বল। কি বলবি বল,—ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের চোখে চোখ রাখে তাপস।

—মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো?

—কি?

—তোমাকে একজন চিনে-ম্যান আর মাকে একজন জাপানী ও-ম্যান মনে হয়। —শান্ত, ধীর, স্থির গলায় এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝানোর চেষ্টা করে মামন, —তোমাদের দু'জনের দেশ আলাদা। ভাষা আলাদা। হঠাৎ এক অচেনা অজানা জায়গায় তোমাদের দেখা হয়েছে একে অপরের সঙ্গে। একজন চাইনিজ আর একজন জাপানি ভাষায় মনের ভাব বিনিময় করছো। আমি ইন্টারপ্রেটর অর্থাৎ দোভাষী। তোমার চাইনিজ ভাষা বোঝাচ্ছি মা'কে আর মায়ের জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে। কিন্তু না, পারবো না। আমি আর দোভাষী মাকু হয়ে তোমাদের মাঝে ঠকাঠক তাঁত বুনতে পারবো না, ব্যস!—দুমদাম পা ফেলে নিজের ঘরে চলে যায় মামন।

—ইয়া! ভেরি গুড! ভেরি গুড! দারুণ দিয়েছিস মামন।—আহ্লাদে প্রায় আটখানা হয়ে পঞ্চমুখে মেয়ের প্রশংসা ছড়ায় তাপস।

—দেবে না! কুচুটেপনায় বাপকেও যে ছাড়িয়ে যেতে হবে,—অখুশি সাধনা নিজের কাছেই নিজের নালিশ শোনায়,—সিরিয়াল দেখে দেখে একেবারে সিরিয়ালি ভাবভঙ্গী শিখেছে। বলে কি না আমি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছি!

কোনও উত্তর দেয় না তাপস।

আসলে প্রশ্ন উত্তর, কথাবার্তা সব গতকাল রাত থেকেই বন্ধ। থাকবে না কেন? অফিসের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আবৃত্তি করতে হবে তাপসকে। 'কচ ও দেবযানী' পাঠ করতে হবে নীলিমাদির সঙ্গে। আগামীকাল থেকে শুরু হবে রিহার্সাল। ভেবেছিলো অফিস ফেরৎ রবীন্দ্র রচনাবলী দেখে আগে ভাগে একটু ঝালিয়ে রাখবে। নীলিমাদির সঙ্গ বলে কথা! তাই অফিস ফেরৎ হামলে পড়েছিলো বুকসেল্ফের উপর। না নেই। তৃতীয় খণ্ডের জায়গা খণ্ডিত করে শুধু পড়ে আছে অন্ধকার ফাঁকা হাওয়া।

—কি গো! জামা-প্যান্ট ছাড়বে না? চায়ের কাপ হাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো সাধনা।

—থার্ড পার্ট, রবীন্দ্র রচনাবলীর থার্ড পার্টটা কোথায় গেল? বুকসেল্ফের ভিতর উলুক-ঝুলুক দৃষ্টি ছড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলো তাপস।

—অফিস থেকে ফিরেছ, জামা-প্যান্ট ছাড়ো। চা খাও। টিফিন করো। তারপর...। নাও, ধরো তো। আগে চা-টা ধরো,—আস্তে আস্তে কেটে কেটে আবৃত্তি শোনানোর ভঙ্গীতে প্রগলভা হতে চেষ্টা করেছিলো সাধনা। প্রসঙ্গ বদলে গুছিয়ে ঢেলে দিতে চেষ্টা করেছিলো সংসারের খবরা-খবর,—আজ দুপুরে মানি ফোন করেছিলো। ওরা আগামী তেইশ তারিখ হালিশহর যাবে। সেখান থেকে ফেরার পথে এখানে একরাত কাটিয়ে যাবে বলছিলো...

—মানি? কোন মানি?—মুখে জানতে চাইলেও তাপসের চোখ আর হাত বুক সেল্ফের ভিতর রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড খোঁজায় ব্যস্ত ছিল।

—ওমা! সে কি কথা? মানি গো, মানি। আমাদের মানিকে ভুলে গেলে? বড়কাকার ছোট মেয়ে। ক'দিন আগেও তো ওর সঙ্গে টেলিফোনে ফস্টিনস্টি কতো কথা বললে,—একগাল হাসি ছড়িয়ে তাপসের আরও কাছে নিবিড় হওয়ার চেষ্টা করেছিলো সাধনা, চা-টা ধরবে না কি? জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে গেল।

—টেবিলে রাখো নিচ্ছি।

—মানিকে কিন্তু একটা ভাল গিফ্‌ট দিতে হবে।

—কোন দুঃখে?

—কথার কি ছিরি! দুঃখে কি কেউ কাউকে গিফ্‌ট দেয়?—চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিলো সাধনা, —বিয়ের পর মানি এই প্রথম আমাদের বাড়ি আসবে। ভালো কিছু না দিলে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কি মনে করবে বলো তো?

—মামন কোথায়? —সাধনার উপহার-প্রস্তাবের উত্তর নয়, মেয়ের খোঁজ করে তাপস।

—আজ তোমার কি হয়েছে বলো তো? এতক্ষণ পরে হাসি খুশি সব উপড়ে গম্ভীর হয় সাধনা।

—কি আবার হবে? দরকারের সময় হাতের কাছে কোনও কিছু পাওয়া যাবে না, বিরক্তি প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি তাপস।

—সকালেই তো শুনলে। ছোট পিশেমশাইয়ের সঙ্গে মহাজাতি সদনে পি সি সরকার জুনিয়রের ম্যাজিক দেখতে যাবে। ফিরতে রাত ন'টা হবে। তবুও জানতে চাইছো মামন কোথায়—বলতে বলতে পড়ার ঘর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলো সাধনা।

—ও!

—মামনের বই পত্তর ঘাটছো কেন? বাড়ি ফিরেই চিৎকার শুরু করে দেবে। মামন কি বাংলা বই পড়ে যে তোমার রবীন্দ্র রচনাবলী নেবে?—চায়ের কাপ প্লেট হাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো সাধনা।

—সেল্ফ থেকে বইটা কি তবে ডানা মেলে উড়ে গেলো।

—চন্দনা নিয়ে গেছে—সাধনার জবাব তো নয়, ঘরের ভিতর যেন ট্রেড সেন্টারের বিস্ফোরণ ঘটেছিলো।

—নিয়ে গেছে? কবে?

—এই তো লাস্ট যে বার এসেছিলো, মার্চ মাসে।

—আমাকে বলোনি কেন?

—বলার কি আছে। বই পড়ার জিনিষ। পড়া হয়ে গেলে ফেরৎ দিয়ে যাবে। তাছাড়া তুমি তো জানো—

—কী?

—চন্দনা রবীন্দ্র কবিতার উপর কাজ করছে। ওর গাইড বলেছে...

—কাজ? না আমার পিণ্ডি চটকাচ্ছে—গায়ের খোলা জামা সাধনার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলেছিলো তাপস,—হাজারদিন নিষেধ করেছি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে আমার বইপত্তর কাউকে দেবে না। এই তো সেবার, ভুটো এসে সুকান্ত সমগ্র নিয়ে গেল। বছর ঘুরতে চললো। ফেরৎ দেবার নাম গন্ধ আছে?

—ভাগ্নে মামার বই নেবে না তো কি রাস্তার লোকের বই নেবে?—রুখে দাঁড়িয়েছিলো সাধনা, ভুটোর কোনও দোষ নেই। ফেরৎ দিতে এসেছিলো, আমিই নিষেধ করেছি। সুকান্তের কবিতা পড়তে ভালোবাসে—

—বাকি বইগুলো কি দোষ করলো? সেগুলোও দানছত্তর করে দিতে পারতে, ভেংচি কেটে সাধনার স্বর নকল করার চেষ্টা করেছিলো তাপস।

—বেশি তেজ দেখাবে না। লোকে বই কেনে পড়ার জন্যে। পড়ানোর জন্যে, —ফণা তোলা সাপের ঘাড় তুলেছিলো সাধনা,—গুচ্ছের বই কিনে তো পয়সা আর জায়গা নষ্ট করো। ক'টা বই পড়ো শুনি?

—তোমার খিদ্‌মতগারি করে সময় পেলে তবে তো বই পড়বো।

—নিজের শালী একটা বই নিয়েছে। কাজ হয়ে গেলে ফেরতও দিয়ে দেবে, তার জন্য একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে বসলো, তাপসের জবাব পাত্তা না দিয়ে নিজের স্টাইলে গজগজ করেছিলো সাধনা,—লোকে শ্বশুরবাড়ির জন্যে কতো কি করে। আর তুমি? চন্দনা যখনই বলেছে দাদাভাই এই বইটা একটু নেবো। অমনি ঘাড় টেরিয়ে বলেছো—না। একটা কিছু কোনওদিন হাতে তুলে দিয়েছ? খালি ফাজলামি আর অসভ্যতা করেছো—'কামশাস্ত্র' নিয়ে যা। কেন, একটা পুচকে অবিবাহিত মেয়ে তোমার কাছ থেকে 'কামশাস্ত্র' নিতে যাবে?

—চন্দনাকে আমি কোনও বই দিইনি? সাধনার উদ্ধত ফণার সামনে একটু নরম হতে বাধ্য হয়েছিলো তাপস।

—হ্যাঁ দিয়েছো, জন্মের মধ্যে কম্মো—দু'টো বই। 'প্রাপ্তবয়স্কের গল্প' আর 'স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু'—দু'টোই রাবিশ বই।—উচিত কথা যথোচিত ভঙ্গীতে শুনিয়েছিলো সাধনা।

—রাবিশ বই! বইয়ের বোঝটা কি? বছরে একবার বইমেলায় তো যাও ফুচকা আর চাউমিন গিলতে।

—পেটে খেলে তাও অঙ্গে মিশে সঙ্গে যাবে। উই-আরশোলার বংশ বৃদ্ধি করার জন্যে বই কিনে কোনও লাভ নেই। তাও যদি দেখতাম পড়ছো পড়াচ্ছো,

—হাত উল্টে চোখ ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলো সাধনা।

—পড়বো না। পড়াবোও না। আমার বই আমি উই-আরশোলায় খাওয়াবো। তাতে তোমার কি? এক্ষুনি বোনকে ফোন করে দাও, কাল আমার বই ফেরৎ দিয়ে যাবে,—কঠোর আদেশ শুনিয়েছিলো তাপস।

—পারবো না। তোমার দরকার, তুমি চেয়ে নাও।

—অমরদা ঠিকই বলতো। বই আর বউ বাইরে বেরুলে আর ঘরে ঢোকে না। একেবারে বারোয়ারি হয়ে যায়—চশমা খুলে চোখ পাকিয়েছিলো তাপস।

—কী! আমি বারোয়ারি? যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা? গলার আওয়াজ তুঙ্গে তুলেছিলো সাধনা।

—ধান শুনতে কান শোনার ভান করে তুলকালাম করার স্বভাব তোমার নতুন নয়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না,—বলতে বলতে বিরক্ত তাপস স্নানঘরে পৌঁছে গেছিলো।

—আমি এখুনি চন্দনাকে ফোন করছি। বলে দিচ্ছি, পয়সা খরচ করে বই কিনতে না পারলে থিসিস লেখার বিলাসিতা করতে হবে না। আমার হয়েছে যতো জ্বালা। একজন থিসিস লিখে লাটে তুলবে, আর একজন যা মুখে আসে তাই বলবে! নিকুচি করেছে সংসারের। সব ছেড়ে ছুঁড়ে এবার যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো—চোখে জলের ধারা বইয়ে খাটের উপর বসে পড়েছিলো সাধনা।

গতকালের ঘটনার সঙ্গে আজকের ঘটনায় পাক খেতে খেতে আবার পুরোনো স্মৃতি পাকিয়ে ওঠে তাপসের মনে। সেদিন অমরদার বুক সেল্ফ থেকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হাতে তুলে নিয়েছিলো। অমনি হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন অমরদা—রসময় দাসের পদাবলী পড়েছিস? "কুবলয় পীড় সঙ্গে সংগ্রামের স্থলে/তার কুম্ভস্থল পীন-পায়োধর ভালে/সেই মত্ত গজকুম্ভ সদৃশ দর্শনে/রাধা পীন-পয়োধর হইল স্মরণে।"

—বইটা আমি একদিনের জন্যে নিয়ে যাবো অমরদা? মিনতি করেছিলো তাপস।

—মাথা খারাপ! তুই বরং দশ-বিশটা টাকা নিয়ে যা। বই আর বউ, ও আমি হাতে ধরে কাউকে দিই না। দিতেও পারবো না। তুইও দিবি না। সমাজে সংসারে বই আর বউয়ের প্রতি লালায়িত অনেক বন্ধু পাবি। কিন্তু ভুল করেও বই কিংবা বউ কখনও হাতছাড়া করবি না। আর একটা হলো পেন। দিতে পারিস, কিন্তু আঁচল হাতে রেখে।

পেন, মানে কলম। কলমের আবার আঁচল এলো কোত্থেকে—অবাক তাপস নির্বাক চোখে চোখ রেখেছিলো অমরদার চোখে।

—বুঝলি না তো! হুম হুম মাথা দুলিয়েছিলো অমরদা। বুঝিয়ে দিয়েছিলো,

—ব্যাঙ্কে, পোষ্ট অফিসে দু'একজন মানুষ পাবি। তাদের স্বভাব পেন ঝাড়ার। তোর কাছে হাত পেতে চাইবে—দাদা, একটু পেনটা দেবেন। তুই না দিলে গোঁসাই ব্যাজার হবে। আর দিলে ফেরৎ পাওয়ার গ্যারান্টি থাকবে না। তোর ভুলে যাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। তাই পেন যদি কাউকে কখনও দিস, আঁচল মানে পেনের ঢাকনা নিজের মুঠোয় রেখে তবেই দিবি।

সেইদিনই অমরদার ঘরে দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো তাপস—জীবনে কিছু না কিনুক বই কিনবে। অনেক বই। ঘরময় বইয়ের এক পাহাড়ে বাস করবে। অমরদাকে নিমন্ত্রণ করে দেখাবে। অফার করবে অমরদাকে—যান না, নিয়ে যান যে বইটা খুশি।

বইয়ের পাহাড় তৈরি করা সম্ভব না হলেও বেশ কিছু বই সংগ্রহ করেছে তাপস। কিন্তু অমরদা নেই। বেঁচে নেই বৌদিও। তাদের একমাত্র ছেলে থাকে ব্যাঙ্গালোরে। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর একদিন এসে বইপত্তর সব দাঁড়ি পাল্লায় তুলে মুক্তকচ্ছ হয়ে কলকাতার পাট গুটিয়ে ফিরে গেছে ব্যাঙ্গালোর।

—জাপানী নয়, বাংলা ভাষায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি মাসকাবারের জিনিষপত্র আজই আনতে হবে,—বাঁ হাতে এ টি এম কার্ড আর ডান হাতে জলখাবারের থালা ঠকাস শব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে 'পুরানো সেই দিনের কথা'-য় ডুবে থাকা তাপসকে আজকের দিনে ফিরিয়ে আনে সাধনা। সঙ্গে বাজারের ফর্দ।

না, পরাজয় স্বীকার করে কম্প্রেমাইজ করার একটুও ইচ্ছে নেই তাপসের। তবুও সাতসকালে জীবনের সবচেয়ে বড়ো টান, পেটের টানে জল খাবারের থালা তুলে নেয়। আর ঠিক তখনই 'কোয়েলিয়া গান থামা এবার...' রিংটোন ছড়িয়ে বেজে ওঠে মোবাইল ফোন। কোনও চেনা নম্বর ধরা দেয় না সি এল আই তে।

—হ্যালো...।

—চন্দনা বলছি, দাদাভাই—

—বলো, —রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ডের শোক নতুন আঙ্গিকে উথলে ওঠে তাপসের মনে।

—আমার গাইড, প্রফেসর মালাকর মানে ডক্টর পঞ্চানন মালাকরকে আপনার কথা বলেছি। আপনার কালেকশন উনি একদিন দেখতে চান। আগামী রবিবার সময় হবে?

—সময় হলেও আমার আপত্তি আছে।

—কেন দাদাভাই?

—বই তো আর চিড়িয়াখানার পোষা বেবুন নয় যে লোক ডেকে ডেকে দেখাতে হবে,—কেটে কেটে কাটা কাটা কাঁটা ফোটানো জবাব শুনিয়ে দেয় তাপস।

—প্লীজ দাদাভাই! আমি স্যারকে কথা দিয়েছি। বুঝতেই তো পারছেন এখন

গাইডকে চটালে...

—আমাকে জিজ্ঞাসা করে কথা দিয়েছিলে?

—দিদিকে বলেছিলাম...

—বাকিটুকু দিদির মর্জিমতো করে ফেলো। আমার মত-অমতের কি দরকার? চন্দনার কথা শুনে রক্তের চাপ দ্বিগুণ বেড়ে যায় তাপসের। রাগ গরগর বেড়ালের মতো ঘাড় ফুলে ঢোল হয়। তারপরেই মনের চোখে ভেসে ওঠে সেই ছবি—একটা মিউসিয়ামের ছবি। তাপসের এই ফ্ল্যাটটা একটা মিউসিয়ামে পরিণত হয়েছে। সিঁড়িতে স্টল পেতে টিকিট বিক্রি করছে সাধনা। আধটানা কোলাপসিব্‌ল গেটে দাঁড়িয়ে সেই টিকিট পরীক্ষা করে দর্শকদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছে তাপস। প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডের দোনলা বন্দুক কাঁধে ঘরে ঘরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে মামন। আর তার মায়ের আপন বোন চন্দনা গাইডের ভূমিকায় দর্শকদের দেখিয়ে দিচ্ছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে—বইয়ের মানে। বইয়ের কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। বই-ভবের অর্থে বই-বাহকের কাঁধে চেপে বই-বাহিত হয়ে, বই-কল্প মালিকের বই-তরুণীতে (আপাতত বুক সেল্ফ) জমা থাকলেও বইয়ের বউধিকার (বইয়ের প্রতি বউয়ের অধিকার)-ই বই (বৈ)-ধ। তাপসের হাড়ে হাড়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে কে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে—বই কেনে বোকা, দান গ্রহণ করে শালী-ভগ্নিপতি-ভাগ্নে-ভাগ্নি-বন্ধু-স্বজন। চুরি করে চালক। বুক ফুলিয়ে দেখায় হামবাগ। মাগনায় পড়ে বিদ্বান আর...

—কি হলো দাদাভাই? উত্তর দিচ্ছেন না যে!—মোবাইলের ও প্রান্ত থেকে তাগিদ দেয় চন্দনা।

সুইচ অফ করে উত্তর হাতড়ায় তাপস।

তুষের আগুন

রবিবার ভারি বার। তুলোর বস্তা পিঠে নদীতে পড়া গঙ্গার ভার টানার জেরবার এক বার। সোম থেকে শনি খনিতে অন্ধের মণি খোঁজার দশা হলেও রবিবারের মতো অমন ভারী তো নয়। নিয়মে বাঁধা অনিয়মের জোয়াল কাঁধে চালিয়ে দেওয়া যায় পুরো ছ'-ছ'টা দিন। সংসার আর অফিস কাছারির কারগিল লড়াইয়ে হাড়গিলে সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে করতে সময় পালিয়ে যায় নাগালের বাইরে।

রবিবার—সে এক বিভীষিকার ভার।

বাবুবিলাসের কাউন্ট ডাউন শুরু হয় সোমবার থেকেই। কবে আসবে রবির ভোর। একটু বেশিক্ষণ বিছানায় পড়ে আধো-ঘুম আধো-জাগরণে আকাশ-কুসুম চয়ন করা যাবে। ন'টা বত্রিশের গাড়ি ধরার তাড়া থাকবে না। দাড়ি কাটতে গিয়ে গালের চামড়া ছিঁড়বে না। স্নানের সময় সাবানের বিলাস অসহনীয় হবে না। উনুন থেকে সরাসরি আধসেদ্ধ ডাল ধপাস্ এসে পাতে পড়বে না। বড়বাবুর কলমের লাল রিফিল দেখতে হবে না। ফাইলে কেন অফিস-কপি গাঁথা হয়নি, সেই খিঁচুনি শুনতে হবে না। ফেরার পথে শিয়ালদার পাতি লেবু তিন টাকায় পাঁচটা কিনে পকেটে রাখতে ভুলে বাড়ি ঢুকলে সাধনার বেদ-গীতা-উপনিষদের বাণী শুনতে হবে না। সহযাত্রীর দেহ-নির্গত পচা ঘামের গন্ধ শুকতে হবে না।

সুতরাং রবিবারের আগমনী কেরাণী তাপসের মনে সোমবার সকাল থেকেই সুর ভাঁজা শুরু করে। হোক না রবিবার ভারি বার, গাধার পিঠে তুলো আর নুনের ফারাক। শিকে ছিঁড়ে নুনের বস্তা জলে পড়লে ভালো। না পড়লেই বা ক্ষতি কি? বোঝার রকমফের মাত্র। তবু রবিবারে ভারে ভারে আক্রান্ত হলেও, নিজেকে একটু স্বাধীন স্বাধীন মনে হয় তাপসের। সেই ছোটবেলায় স্বাধীনতা দিবসের দিন স্কুলে গিয়ে চকোলেট পেলে যেমন মনে হত, রবিবার দিনটিকে ঠিক তেমনই মনে হয় তাপসের। সারাবছর যে মাস্টারমশাইরা কারণে-অকারণে কান টেনে লম্বা করে দিতেন, সেই মাস্টারমশাইরাই স্বাধীনতার দিন ল্যাবেঞ্চুস হাতে গুঁজে দিতেন। অরেঞ্জ ভিমটো। বলতেন—খা। তখন নিজেকে কি যে ফুরফুরে মনে হত তাপসের, সে কথা আজ আর বলে বোঝানো যাবে না।

স্কুল ছেড়ে কলেজ জীবন। কলেজ জীবনের রবিবারগুলো ছিল অন্য স্বাদের।

ঘুম থেকে ওঠার বেলায় দেরি হলে মা একটু ডাকাডাকি করতেন ঠিকই, কিন্তু বাবা বলতেন—ঘুমোক। সবে তো সাড়ে সাতটা বাজে। সারা সপ্তাই তো ছেলেটা সকাল-সকাল উঠে পড়ে। একটা দিন না হয় ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাক। বাবার প্রশ্রয়ে, ন'টা না বাজলেও, আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকত। তারপর কোনমতে জলখাবার গিলে হাজির হত অনিলদার বাড়ির রকে। সেখানে ততক্ষণে ভিড় করত নারু, তারক, কালু, জিষ্ণুরা। পকেটে থাকত পেঁয়াজ। ছোট এলাচ। সিজার্স, পাসিং-শো, কুল সিগারেটের সঙ্গে দেশলাই। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তাপস দু'একদিন নিয়ে যেত ক্যাপস্টেন। সেদিন তো একেবারে উৎসবের মেজাজে জমাটি হয়ে উঠত রক। নারু বলত,—আজ আমরা কিন্তু স্টুডেন্ট নই। এক একটা রকফেলার।

রকফেলারের কী মানে? বুঝত না তাপস। ভাবত, যারা রকে আড্ডা মারে, তারাই রকফেলার। বুঝুক না বুঝুক, শব্দটা কানে ঢুকলেই একটা শিহরণ হত শরীরে। রকফেলার কি চাট্টিখানি ব্যাপার? অ্যাম্বাস্যাডার, রাষ্ট্রদূত-রাষ্ট্রদূত ভাব।

অনিলদার রকে রবিবার দিন জুড়ে হুল্লোড়ের অভাব ছিল না। সাহিত্য, খেলা, রাজনীতি থেকে শুরু করে নারী-শরীর, নানান আলোচনায় লোচিত অলঙ্কৃত থাকত রবিবার। সপ্তাশেষে সিগারেট ফুঁকে, মুখের গন্ধ তাড়ানোর ফিকিরে পেঁয়াজ কিংবা এলাচ চিবুতে চিবুতে বাড়ি ফেরার স্বাদই ছিল আলাদা।

চাকরি পাওয়ার পর তাপসের অবিবাহিত জীবনের রবিবারগুলো ছিল একটু অন্যরকম। ঢিলে-ঢালা। অন্য সিনেমা, অন্য নাটক দেখার রবিবার। নিজেকে আঁতেল ভাবার রবিবার। কখনো কখনো স্কুল কলেজের পুরনো বন্ধুদের বাড়ি হুট্-হাট্ চলে গিয়ে হো-হো করার রবিবার।

বিয়ের পর, অর্থাৎ তাপসের জীবনের সঙ্গে সাধনা জুড়ে যাওয়ার পর থেকে, রবিবারের ভূগোলটাই কেমন যেন পাল্টে গেল। প্রথম দিকে নববধূকে সঙ্গে নিয়ে নতুন শাড়ির মাড়-ম্যাড়-ম্যাড়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তালুর সঙ্গে তালু গুঁজে বসে থাকতে ভারি ভালো লাগত। তখনো ছিল একই কাউন্টডাউন। সোমবার থেকে শুরু হওয়া। শনিবারের শনিদশা পার করে রবিবারের প্রতীক্ষা। প্যাঁক দিত বন্ধুরা। বলত,—কী রে শালা, একেবারে আঁচলের তলায় সেঁধিয়ে গেলি?

আত্মীয় স্বজনরা আলোচনা করত ঠারে-ঠোরে—তাপসটার মাথা একেবারে চিবিয়ে মেরেছে বউটা। বাবা অনেক স্ত্রৈণ দেখেছি, এমন বউ-ন্যাওটা বেটাছেলে জন্মেও দেখিনি।

শত্রুরা বলত,—ডাইনি। বুঝলে না, তাপস ডাইনির খপ্পরে পড়েছে। নইলে রবিবারের ভরদুপুরে কোনো ইয়ং ছেলে ঘরের খিল বন্ধ করে বউয়ের সঙ্গে গুজ্‌গুজ্ ফিস্‌ফাস করে?

আর সাধনা বলত,—সপ্তায় একটা মোটে রবিবার। ওটা আমার আর তোমার।

আজ তেমনিই একটি রবিবার। সবে পুবের ডিম ফুটে সকাল-ছানা হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করেছে। জানলার পর্দা ভেদ করে তাপসের সাড়ে তিন বাই সাড়ে ছয় খাটে লাফিয়ে পড়েছে রোদ। বড় ঘরের ডবল বেড থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর রোদের স্পর্শেই ঘুম ভাঙে তাপসের। মামনের জন্মের আগে ঘুম ভাঙাত ভিজে বিছানা পরিষ্কার করার স্বার্থে। তার কিছুদিন পর মেয়েটা যখন বেণী দুলিয়ে স্কুলে যাওয়া শিখল তখন মেয়ের ঘুম ভাঙানোর জন্যে নিজের ঘুম ভেঙে ফেলতে হত। বাবার বুকে চেপে তার তখন গল্প শোনার নেশা ছিল। রূপকথার গল্প। ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর গল্প, হাসি-মজার গল্প। বাবার মুখে আবোল-তাবোল গল্প না শুনলে স্কুলে যেতে চাইত না মামন। এখন লায়েক মামন একটা এম. এ. পাশ করে আর একটার পাঠে মনোনিবেশ করেছে। গল্প শোনার সময় কিংবা মন কি আর ওর আছে?

যার সাধনা নেই, মামন নেই, তার রোদ আছে। সোম থেকে শনি, রোদ একবার ছুঁয়ে দিলেই আর বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারে না। আলস্যের আড়মোড়া ভেঙে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। চা বানায়। কাপে ঢালে। ছাদের গাছ পরিচর্যা সেরে ততক্ষণে নেমে আসে সাধনা। খোঁপায় টুথব্রাশ গুঁজে সিঁড়িতে বসেই চুমুক দেয় কাপে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিত্য পদ্ধতির মন্ত্রপাঠ শোনায় তাপসকে,—এটা কি চা? গুচ্ছের চিনি আর দুধের সরবত।

উত্তর দেবার ফুরসৎ পায় না তাপস। তার কাছে তখন বাথরুমের চেয়ে প্রয়োজনীয় আর কিছুই নয়।

আজকের রবিবারটা একটু আয়েসে কাটানোর ইচ্ছে ছিল তাপসের। গতকালের কাগজে সবে পে-কমিশন গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত জানা গেছে। তারপর সারাদিন অফিসের টেবিলে টেবিলে হিসেব নিকেশ জল্পনা করে কেটেছে। কেউ কেউ লাভের গুড়ের পরিমাণটা বুঝেছে। কেউ বোঝেনি। তাদের চোখে নেচে বেড়িয়েছে ঝাঁক ঝাঁক পিঁপড়ে। তাপস সেই পিঁপড়ের নাচে ভয় পাওয়া বাবুদের একজন।

অতএব রবিবার ভোরের শেষে লগ্নে রোদ ছুঁয়ে ঘুম ভাঙা তাপস মনে মনে হিসেবটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল। কত বেসিকে কত গ্রেড পে। ডি. এ. কত শতাংশ। কুল মিলিয়ে বিলকুল বাড়ার পরিমাণের সঙ্গে বকেয়ার ঝন্ ঝন্ কতটা সুর তুলবে। কি করবে এ বছরের চল্লিশ শতাংশ বকেয়ার টাকায়? সাধনা না মামন—কার গয়না? নাকি শোধ করবে হাউসিং লোনের খানিকটা অংশ? ছাদের ঘরটা কি জানলা-দরজা লাগিয়ে পড়ার ঘর বানাবে? বিছানায় শুয়ে আধেক ঘুমে নয়ন চুমে এমনি স্বপন বপনে ব্যস্ত ছিল তাপস।

হঠাৎ হা-রে-রে-রে। ছাদ-ফেরৎ সাধনার হাতে খুরপি। কপালে, নাকে মুখে স্ফটিক। ঘুম ফোলা চোখের লালচে ধমক,—এখনো শুয়ে আছ? চা-টাও হয়নি

দেখছি। কাল অতবার পাখিপড়া পড়ালাম, সব হজম করে বসে আছ?

স্বপন চটকে তপনের কিরণ এক ঝট্‌কায় ঠেলে বিছানায় বাধ্য ছেলেটি হয়ে উঠে বসে তাপস। ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকে সাধনার মুখের ক্যানভাসে।

—জানতাম ভুলে মারবে!—হাতের খুরপি দিয়ে খুঁচিয়ে ভুল ভাঙাবার ভঙ্গী করে সাধনা,—খাটালে যেতে হবে বলেছিলাম। দুধ আনতে। কী সব্বোনাশ! সাড়ে ছ'টা বাজে!

—ওঃ।—খাট ছেড়ে মেঝেতে পা রাখে তাপস,—এই এক্ষুণি যাচ্ছি।

—আর গিয়ে লাভ নেই। কারবার যা করবার করে ফেলেছে।

—কী কারবার?—মুখ ফসকে শিশুর মতো প্রশ্ন ঝাড়ে তাপস।

—জলের কারবার। ছ'টায় জল এসে গেছে। বালতি ভর্তি করতে আর বাকি নেই। গেলেও এখন দুধ পাবে না। পাবে দুধজল। আমারই ভুল হয়েছে তোমার উপর ভরসা করে। নিজে চলে গেলে এতক্ষণ একেবারে গরম গরম খাঁটি দুধ নিয়ে ফিরে চলে আসতাম। এই মানুষটার দৌলতে একটা কাজও কোনোদিন সুষ্ঠুভাবে করা গেল না!

—দুধ দিয়ে কী যেন করবে বলছিলে?—কমন প্যাসেজে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জলের ঝাপটা দেয় তাপস।

—কী আর করব, মাথায় মাখব!

এতক্ষণে মনে পড়ে তাপসের। আজ ন্যাগির জন্মদিন। সেকেন্ড বার্থ-ডে। গতবছরও দিনটি হৈ-হুল্লোড়ে পালন করেছিল সাধনা। দু'কিলো দুধের পায়েস রান্না করে খাইয়েছিল রাস্তার সব পাড়া খেদানোদের। ওরা সব ন্যাগির বন্ধু। তিনশ পঁয়ষট্টি দিন রাস্তায় পটি করতে যাওয়ার সময় ওদের বন্ধুত্ব পাকাপাকি হয়। ওরা সব গলায় গুড় গুড় আওয়াজ করে ন্যাগিকে উইশ করে। স্মরণ করিয়ে দেয়, গলায় বেল্ট বাধা থাকলেও জাতে-জাতে একাকার ঘর আর রাস্তার সারমেয়দের সারমর্ম এক। গতবছর ন্যাগির জন্মদিনটা ছিলো শুক্রবারে। সব ঝক্কি তাই সামলাতে হয়েছিলো সাধনাকে। এবছর কপালগুণে জন্মদিনটা রবিবার হওয়ায় সামান্য কিছু ঝক্কি শেয়ার করতে হবে তাপসকে। এক সপ্তা আগেই সে কড়ার করিয়ে রেখেছে সাধনা। মামনেরও নাকি দু-একজন বন্ধু আসবে।

—ন্যাগি! ন্যাগি—!!—সাধনাকে খুশি করার লক্ষে ন্যাগির উদ্দেশে ডাক ছাড়ে তাপস। ডাক শুনে চারপায়ে টুই টুই নাচতে নাচতে হাজির হয় ন্যাগি। লেজ দোলাতে দোলাতে চোখ রাখে তাপসের চোখে।

—হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।—উইশ করে তাপস।

কুঁই কুঁই শব্দে তাপসের উইশের যোগ্য জবাব ছুঁড়ে সাধনার কোল ঘেঁষে দাঁড়ায় ন্যাগি।

—আহা। সোনা মনা! রাগ হয়েছে? হবেই তো। এত বেলায় বার্থ-ডে উইশ করলে কার না রাগ হয়? একদম কথা বলবে না। যাও, মামনকে জাগিয়ে দাও। সোনা-মনা ন্যাগি আমার!....

সাধনার আদরের ভঙ্গী দেখে মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে প্রকাশ করার সাহস হয় না তাপসের। তা ছাড়া কুত্তা-বিলাসিতায় প্রথম থেকেই তার আপত্তি ছিল। কিন্তু মা আর মেয়ের বায়না আর জেদে সে আপত্তি ধোপে টেকাতে পারেনি। এখন অবশ্য ন্যাগির প্রতি একটু দুর্বলতাও জন্মে গেছে। তবুও জন্মদিনের নামে একরাশ টাকা খরচ করার খচ্‌খচানির সঙ্গে আপোস করতে কষ্ট হয়।

—আমি বলছিলাম কি, কয়েক প্যাকেট লেড়ো বিস্কুট কিনে রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলোকে খাইয়ে ন্যাগির জন্মদিন পালন করলে কেমন হয়? পয়সাও বাঁচে, তোমারও হ্যাপা কমে।—দাঁতে ব্রাশ চালানোর আগে প্রস্তাবটা চালিয়ে পাশ করিয়ে নিতে চায় তাপস।

—কী বললে? ন্যাগির জন্মদিনে লেড়ো বিস্কুট খাওয়াব নেড়ি কুকুরকে? —রণং দেহি ভঙ্গীতে টান টান হয় সাধনা।

—আমরাও খাব।—মিন্ মিন্ করে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে তাপস, —ছোটবেলায় চায়ে ভিজিয়ে কত লেড়ো বিস্কুট খেয়েছি আর এখন পারব না?

—বুঝেছি। আর একটু আগে বুঝতে পারলে অনেক আগেই খাটাল ঘুরে দুধ নিয়ে এতক্ষণে চলে আসতে পারতাম।—বলতে বলতে রান্নাঘরে ঢুকে দুধের ক্যান হাতে তুলে নেয় সাধনা। তারপর সোজা তাপসের ঘরে ঢুকে ড্রয়ার টেনে বের করে আনে মানিব্যাগ।

—আহা, আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি পায়েসের সঙ্গে লেড়ো বিস্কুট মন্দ হত না।—সাধনাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টায় কেড়ে নেয় দুধের ক্যান।

মনে পড়ে, শরৎ পণ্ডিত, মানে দাদাঠাকুরের কবিতার চার লাইন—"বিনি তুফানে না ডুবায়/সেই বা কেমন নেয়ে?/একদিনও করেনি ঝগড়া/সেই বা কেমন মেয়ে?"

মনে পড়লেও মুখে মুখে আওড়ানোর সাহস করে না তাপস। বরং পরিস্থিতি মোলায়েম করার চেষ্টা করে,—খাটালে যদি দুধ না পাই, মাদার ডেয়ারি আনব?

জবাব দেয় না সাধনা। পাল্টা জানতে চায়,—বাজার? বাজার কখন হবে শুনি? মেয়েটাও হয়েছে তেমন কুঁড়ে। সকাল সকাল ঘরটা সাজিয়ে ফেলতে পারে। মালাচন্দনের ব্যবস্থা করতে পারে। কেক ওভেনটা পরিস্কার করে কেক বানাতে পারে। তা নয়, এখনো বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। থাকবে না! বাপকা বেটি যে।.....ন্যাগি! মামনদিদিকে ডেকে দাও সোনা।

—দুধ আর বাজার কি একসঙ্গে করা যায়?—ব্যাজার মুখে গজ্ গজ্ করে

তাপস। তারপরেই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—ঘরের কুত্তার জন্মদিনে রাস্তার কুত্তার ভোজ.....

—একটু জীবে দয়া করতে শেখো।—তাপসের চিন্তা কেড়ে নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ে সাধনা,—নেতাজি বলেছিলেন, জীবে দয়া করে যেই জন—

নেতাজি নয়, বলেছিলেন স্বামীজি। বিবেকানন্দ।

—ওই হল! নেতাজির বদলে স্বামীজি। মহাপুরুষরা সবাই সমান। সবাই একই কথা বলেন, বুঝলে? মাস্টারি না করে এখন নিজের কাজটুকু করোগে যাও।—ভুল শোধরানোর বদলে নিজের দাপট বজায় রাখে সাধনা।

—আমি কি কোনো জীব নই? আমাকে কে দয়া করছে? রবিবার সকাল থেকে শুরু হল ঘানিটানা।—ঠিক প্রতিবাদ নয়, আক্ষেপের সুর ঝরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখে তাপস।

—জীব তো বটেই; তবে নির্জীব। ঘুমকাতুরে আর কুঁড়ে। তোমার চেয়েও কম মাইনের চাকরি করে পই পই সব বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি, গাড়ি, কী নেই তাদের? আর তুমি? কোনোমতে একটা লোনের বাড়ি করে হাঁপিয়ে গেছ। এর পরেও জীবের বড়াই!—সাধনার শেষ কথাগুলো আস্তে আস্তে ফেড্-আউট হয়ে যায় তাপসের কানে।

সিঁড়ির নিচ থেকে সাইকেল নিয়ে হ্যান্ডেলে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে খাটালের উদ্দেশে রওনা হয় তাপস। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে সত্যিই নিজেকে নির্জীব মনে হয়। শেষ কবে নিজের জন্মদিনের পায়েসের বাটি চেটেপুটে খেয়েছিল, মনে করার চেষ্টা করে। মামনের জন্মদিন ছাড়া বাড়িতে যে পায়েস রান্না হয় তা গোবিন্দভোগ চালের নয়, সিমুই কিংবা নুডুল্‌সের। সে পায়েসে স্বাদ থাকলেও, মৌলিকতা থাকে না। মনে পড়ে দিদিমার কথা। দিদিমার হাতে তৈরি ঘরের দুধ, খেঁজুরের গুড়, তেজপাতা আর ছোট এলাচ-দানায় মাখামাখি সে পায়েসের স্বাদ আজও ভোলেনি তাপস। চেটে চেটে পায়েসের তেজপাতা ঝক্‌ঝকে করে ফেলত। মা বলতেন,—আর হ্যাংলামি করতে হবে না। পাতাটা এবার ফেলে দে।.....

—এই যে দাদা, কোথায় যাচ্ছেন?

পাড়ার গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় উঠতেই কর্কশ প্রশ্নে থম্‌কে দাঁড়ায় তাপস। ঘ্যাচ্ শব্দে ব্রেক কষে সাইকেল দাঁড় করায়। আর তখনই ওকে ঘিরে ধরে চার-পাঁচটা যুবক। ওদের একজন ট্যারা পাঁচু। থাকে তাপসদেরই পাড়ায়।

—খাটালে।—সংক্ষিপ্ত জবাব শোনায় তাপস।

—কেন?—সামনে এসে দাঁড়ায় পাঁচু।

—দুধ আনতে।—জানিয়ে দেয় তাপস।

—না, আজকে যেতে পারবেন না। রাস্তা বন্‌ধ্—চাক্কা বন্‌ধ্।

—রাস্তা বন্ধ? কিন্তু কেন?—এতক্ষণে হুঁশ ফিরে আসে তাপসের। বড়রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সার সার লরি, গাড়ির ওপর নজর পড়ে।

—কারণটা খবরের কাগজেই লেখা আছে। বাড়ি ফিরে পড়ে নিন।—পরামর্শ দেয় পাঁচুর সাগরেদ।

—আমি তো আর গাড়ি নিয়ে আসিনি। আমার সাইকেল—

—শোন কেলো, শোন। দাদার কথা শোন।—কেলোকে সাক্ষী ডাকে পাঁচু। তারপরই যেন সাধনার কথার প্রতিফলন ঝরে পড়ে পাঁচুর গলায়—গাড়ি থাকলে তো আনবেন।

—এ দু'টো কি?—সাইকেলের চাকা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে কেলো।

—কেন, চাকা!

—বিল্টুর কথা কানে যায়নি? ও যে বলে দিল, চাক্কা বন্ধ্। শোনেননি? —জেরা করে কেলো।

—তাই বলে সাইকেল চলবে না?—অবাক হয় তাপস।

—না, চলবে না। সাইকেল, রিক্সা—কিচ্ছু চলবে না। ভালোয় ভালোয় ফিরে যান। নইলে চাক্কা ফুস্ করে দেব।—মুখে বিচিত্র শব্দ করে শেষ পরিণতি শুনিয়ে দেয় ট্যারা পাঁচু।

—কিন্তু দুধ? দুধ তো বন্ধের আওতার বাইরে থাকে!—দুধ ছাড়া বাড়ি ফেরার সম্ভাব্য ঝুঁকি উপলব্ধি করে শেষ চেষ্টা করে তাপস।

—একদিন দুধ না খেলে কোনো মহাভারত অসুদ্ধ হবে না।—একান্ত নিজের ভঙ্গীতে জানিয়ে দেয় বিল্টু।

—না না, ঠিক খাওয়ার জন্যে নয়। আসলে আজ জন্মদিন কিনা, তাই.... —নিজের মনে বিড় বিড় করে বলতে চায় তাপস।

—জন্মদিন? কার জন্মদিন দাদা?—পাড়ার পাঁচু আবার বুক চিতিয়ে তাপসের সামনে চিত্তির হয়।

—ন্যাগির।

—আপনার মেয়ে?—চোখ ছানাবড়া করে কেলো।

—ন্যাগি না ম্যাগি? কেলোকে অনুসবণ করে বিল্টু।

—এরপরে ছেলে মেয়েদের নাম হবে বিস্কুট, চানাচুর, নোন্‌তা, লাড্ডু, জিবেগজা....।—বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ে পাঁচু।

—চাউমিন, ভেলপুরীও হতে পারে গুরু।—পোঁ ধরে কেলো।

—হবে না? পয়দার রেট দিন দিন যা বাড়ছে, তাতে নাম খুঁজে পাওয়াই দায়। রাম-শ্যাম-যদু-মধু এখন আর চলে না।—বলতে বলতেই তাপসের চোখে চোখ রাখে ট্যারা পাঁচু। আসলে নজর তখন বিল্টুর দিকে। কলেজ জীবনে ভবেশের

চোখটাও পাঁচুর মতো ছিল। ওরা ভবেশকে ক্ষ্যাপাত এল. এল. টি. টি. নামে। বলত, লুকিং লন্ডন টকিং টোকিও।

—দাদা, আপনার মেয়ের নামটা কিন্তু ক্লাসিক।—তাপসের কাঁধে ইয়া বড় এক ইয়ারী থাপ্পড় মারে কেলো।

—আমার মেয়ের নাম মোটেও ন্যাগি নয়। আমার মেয়ের নাম মামন। ভালো নাম তণিমা, বুঝলে?—মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে ওঠে তাপস,—দুধ আমার দরকার। এই সাইকেল এখানে থাকল; হারালে বা কোনো ক্ষতি হলে—

—ক্ষতিপূরণ চাইবেন?—আঙুল তুলে জানতে চায় বিল্টু।

—দরকার হলে চাইব।—বলেই সাইকেল ছেড়ে হন্ হন্ হাঁটতে শুরু করে তাপস। এতক্ষণ পরে নিজেকে একটা জীব বলে মনে হয়।

—ঠিক আছে দাদা, নিয়ে যান। তবে চালিয়ে যাবেন না, হেঁটে হেঁটে যান।—পিছন থেকে ডাক দেয় পাঁচু।

ফিরে দাঁড়ায় গম্ভীর তাপস। ডান পায়ের লাথিতে সাইকেলের স্ট্যান্ড তুলে হারিয়ে যাওয়া জীবনের গতিতে তর তর পার হয়ে যায় বড়রাস্তা। রাস্তাপার হয়ে সূর্যসেন নগর। তারপর খাটাল।

না, দুধ পাওয়া যায় না। রাজেশ ইয়াদব থেকে শুরু করে ধানিলাল মাহাতো। দুধ নেই কারো কাছে। চাক্কা বন্‌ধের কারণে সব গরু-মোষের দুধ ভোর তিনটের আগেই নিঙড়ে নিয়ে ম্যাটাডোরে তুলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই সন্ধ্যের আগে দুধ পাওয়া যাবে না কোনোমতেই।

এখন উপায়?

উপায় বেচু। খাটাল ছাড়তেই নতুন বাজার। বাজারে ঢোকার মুখেই পলিথিনের ঠোঙায় দুধের সাগর। মাদার থেকে শুরু করে ডটার ডেয়ারী।—কী চাই। গরুর দুধ? টোন্‌ড্ মিল্ক? ফ্যাট-ফ্রী?

—পায়েসের দুধ।—চাহিদা শুনিয়ে দেয় তাপস।

—খুব ভালো—প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে কোনো ঝুকি না নেওয়ার পরামর্শ দেয় বেচু,—কোনো চয়েস আছে? না থাকলে বিজ্ঞাপনের ভাষায় ভরসা করে 'তাজা দুধের রাজা' এই ব্র্যান্ডটা নিতে পারেন। শুধু পায়েস কেন, দই-সন্দেশ, মণ্ডা-মেঠাই যা খুশি বানাতে পারবেন।

—আজ কি বাজার বন্‌ধ্?—সার সার ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের দিকে এতক্ষণে নজর পড়ে তাপসের।

—অঘোষিত।—টাকার খুচরো ফেরৎ দেয় বেচু।

—মানে?—আবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা হয় তাপসের।

—আসলে পৃথিবীটা কিসের ওপর চলে বলুন তো?—প্রশ্ন করে নিজেই জবাব শুনিয়ে দেয় বেচু,—চাকার উপর। চাকা না চললে চাক ঘোরে না। চাক না ঘুরলে তেল হয় না। তেল না থাকলে প্রদীপ জ্বলে না। প্রদীপ না জ্বললে রাধাও নাচে না। সুতরাং.....

যতসব পাগলের প্রলাপ।

সময় নষ্ট না করে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেয় তাপস।

—আমি তখনই জানতাম খাটালের দুধ পাওয়া যাবে না।—ক্যানের ঢাকনা খুলে পলিথিন প্যাকেট দেখেই ঝাঁ চিৎকারে রান্নাঘর মাথায় তোলে সাধনা,—ঠিক এইজন্যেই আমি কোনো আচার-অনুষ্ঠান করতে চাই না। করবও না আর কোনোদিন।

—কারণ না শুনেই চিৎকার শুরু করে দিলে?

—ওসব কারণ-অকারণ হাত-অজুহাত শুনতে শুনতে আমার চুল পেকে গেল। মিথ্যে কথা বলার স্বভাব কি তোমার আজকের? আসলে তা নয়। আসল হল হিংসে। ন্যাগির জন্মদিনে ন্যাগির বন্ধুদের পায়েস খাওয়ানো হবে, সেই হিংসে। তোমার পরামর্শ মতো যদি লেড়ো বিস্কুটে রাজি হতাম তাহলে আর—

—আহঃ! সবকিছুর একটা সীমা আছে। ন্যাগিকে হিংসে করব আমি? কেন, ন্যাগি কি আমার দোসর না কম্পিটিটির?—সাধনাকে ছাপিয়ে চিৎকার করে ওঠে তাপস।

প্রতিবাদ, প্রতিবাদ করা দরকার। প্রতিবাদ না করে করে সমাজ-সংসার একেবারে কেলো-পাঁচু-বিল্টুদের আখড়ায় চলে যাচ্ছে।

—আজ চাক্কা বন্‌ধ্। গাড়ি-ঘোড়া সব বন্‌ধ্। বাজারেও কোনো দোকান খোলেনি। বুঝলে? বাইরের কোনো খবর রাখো? স্কিমে তো দু'দুটো খবরের কাগজ আসে, হেডলাইন উল্টে দেখেছ কোনোদিন?

—ভালো। খুব ভালো। বন্‌ধ্ মানে তো তোমারই পোয়া বারো। খাও দাও আর ভুস্ ভুস্ ঘুমিয়ে কাটাও। আমার হয়েছে যত জ্বালা। ন্যাগি! ন্যাগি!!.....

ডাকতে ডাকতে রান্নাঘর ছেড়ে মামনের ঘরের উদ্দেশে রওনা হয় সাধনা। হয়ত বুঝতে পারে, তাপসকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না। তুষের আগুনে বেশি হাওয়া না দেওয়াই ভালো। বাকিটুকু বরং মামনকে দিয়েই ম্যানেজ করিয়ে নেওয়া যবে। ন্যাগির জন্মদিন তো আর হেলাফেলায় পালন করলে চলবে না!

ঘর পর জঙ্গল

অফিসে অফিসে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে....

না, মৈত্রমশাই সাগর সঙ্গমে যাবেন না। যাওয়ার বাসনাও নেই। যাবেনই বা কেন? মোটে তো পঞ্চান্ন বছর বয়স। ধম্মো-কম্মো করার আস্ত সব দিন পড়ে আছে। অবসরের পর বরং ভবসাগর পার হাওয়ার ভাবনা ভাবা যাবে। এখন এই কচি বয়েসে ওসব ভড়ং-এর দরকার কি?

তবু বার্তা রটে গেল। রটবে না কেন? গুজব আর বার্তা ছড়াতে সময় লাগে না। আগুনে ঘৃতাহুতির মতো হু হু জ্বলে। লক্ লক্ করে লেলিহান! সুতরাং সারা অফিস জুড়ে বার্তা ছড়াতে দেরি হয় না একটুও।

বার্তাটা কি?

বেশ কয়েকজন শ্বাপদ আর আপদদের পেছনে ফেলে সামনে এগিয়েছেন মৈত্রমশাই। পদের উন্নতি হয়েছে। মানে পদোন্নতি হয়েছে মৈত্রমশাইয়ের। অতএব বার্তার গুরুত্ব কি কম? পরশ্রীকাতর কিংবা নিন্দুকেরা যাই বলুন না কেন, ওজন ভারী হাওয়ায় ভারি খুশি হয়েছেন মৈত্রমশাই। একেই বলে নিষ্ঠার সাফল্য।

দিল্লীর অফিস থেকে ফ্যাক্স-এ বার্তাটা এসে পৌঁছতেই আনন্দে আত্মহারা মৈত্রসাহেবের চোখের পর্দায় যে মুখগুলো ভেসে উঠেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে ছিল পরমার মুখ। জ্বলে জ্বলে উজ্জ্বল না হোক, খাক হওয়া চোখে সে মুখ বেশ কয়েকবার দেখে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছিলেন মৈত্রমশাই। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল অমরেশপুরীর হাসি। মোগাম্বো নয়, মৈত্রমশাই খুশি হয়েছিলেন। কল্পনায় কথোপকথন সেরেছিলেন পরমার সঙ্গে।

—কি হে! হল তো! খুব তো বলেছিলে, তোমার মতো মিন্‌মিনে মিন্‌সের কিছুই হবে না। হল তো! তিল থেকে একেবারে তাল!

পরমার সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে বলতেই বেল বাজান মৈত্রসাহেব। স্যালুট ঠুকে এসে দাঁড়ায় লছমন,—জি হুজুর।

—নো ভিজিটর। রেড, লাল বাতি জ্বালা দেও।

—জি হুজুর, লালবাত্তি কা বাল্ব কাট্ গিয়া।—মৈত্রসাহেবকে বুঝিয়ে দেয় লছমন।

—কাট গিয়া? তো নো বাত্তি লাগা দাও। কই বাত্তি নেহি জ্বলেগা। আভি আমি বাতচিত্ করেঙ্গে। কনফিডেন্সিয়াল।

—জি হুজুর।

লছমন পিছে মুড়তেই মোবাইল ফোনটা তালুর ওপর মেলে নেন মৈত্রসাহেব। টকাটক্ রিং করেন সরাসরি পরমার নম্বরে। প্রথমবার নো রিপ্লাই। দ্বিতীয়বার নো রিপ্লাই। হোক। কতবার নো রিপ্লাই হবে? নেগেটিভ হতে হতেই তো পজেটিভ হয়। 'মরা মরা' ধ্বনির ভেতরেই তো লুকিয়ে থাকে রামনাম। তা ছাড়া চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার কসুর করলে চলবে না। চেষ্টাতেই কেষ্টা মেলে। ফেলিওর ইজ দা পিলার....। সেই অঙ্কটাও মনে পড়ে মৈত্রসাহেবের। যতই তেল মাখানো থাক না কেন, বানরটা একবার না একবার পিলারের মাথায় পৌঁছবেই।

বানর? ইস্! উপমাটা বড্ড গোলমেলে। টুকুস করে জিভ কেটে নেন মৈত্রসাহেব। পরমা জানতে পারলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

—কি হল? অ্যাক্সিডেন্ট না স্ট্রোক? দুপুরবেলা একটু তিষ্টোতে দেবে না? সাতসকাল থেকে সংসারে জোয়াল ঠেলে দু'টো পিণ্ডি গিলে সবে একটু মেঝেতে কাৎ হয়েছি, অমনি শুরু করেছ গুঁতোনি? ফোনের গুঁতোয় একেবারে অস্থির করে তুললে? আরে বাবা, নো রিপ্লাই হচ্ছে দেখেও তো একটু ক্ষান্ত হতে পারতে?—ও প্রান্ত থেকে পরমার ছুঁড়ে দেওয়া দমহীন দাওয়াই আছড়ে পড়ে মৈত্রসাহেবের কানে।

—শোনো, খবরটা তোমাকে এক্ষুণি দেওয়া দরকার তাই....

—শত্তুরটা মরেছে তাহলে?

—কোন শত্রু?—অবাক হন মৈত্রসাহেব। তাঁর অফিসে কয়েকজন পরশ্রীকাতর বন্ধু আছে বটে! কিন্তু মরবার মতো কোনো শত্রু তো নেই!

—তা আমি কি করে জানব? যেমন বেগে ফোন করলে, তাই ভাবলাম হয়ত—

—আমার স্ত্রীকে আমি ফোন করতে পারব না?

—আদিখ্যেতা শুনে আর বাঁচিনে। দিন মাস বাদ দাও। বছরে কটা ফোন করো আমি গুণে বলে দিতে পারি। তাও সেই একটাই কথা—অফিস থেকে হঠাৎ আমাকে দিল্লী যেতে হচ্ছে। পরশুদিন ফিরব। কেন, নিজের ছোটভাইকে দ্যাখো না? সারাদিন বৌয়ের সঙ্গে মোবাইলে গুজুর ফুসুর আর হ্যা হ্যা হাসির ধুম!

—ওদের উঠ্‌তি বয়েসে।—গলার স্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে দেন মৈত্রসাহেব।

—আর আমার বুঝি পড়্‌তি বয়েস ছিল? কুড়ি বছর বয়েসে সব শখ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার হাড়িকাঠে মাথা রেখেছিলাম।

—বৃহস্পতি সহায় ছিল।

—কি? কি বললে? আমার নয়, বৃহস্পতি সহায় ছিল তোমার। নইলে আমার মতো মেয়ে সাতজন্ম তপস্যা করেও পেতে কিনা সন্দেহ। আমার ছিল শনির দশা।

রাহুর দশা, বুঝলে?

—পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি লাভ? তখন কি মোবাইল ছিল?

—সব ছিল। ছিল না তোমার মুরোদ। কোনোদিন একটা সিনেমা-থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গেছ? খাইয়েছ কোনো হোটেল-রেস্টুরেন্টে?

মোবাইলের ও প্রান্ত থেকে একের পর এক ধানিলঙ্কার ঝাঁঝ ঝরে পড়ে মৈত্রসাহেবের কানে।

—তোমার ওই এক রোগ। ভুলো রোগ।

—মানে? দিনরাত খালি রোগ নিয়ে খোঁচা দেবে না বলছি। রোগ আমি বাপের বাড়ি থেকে যৌতুকের বাক্সে ভরে নিয়ে আসিনি। রোগ যা হওয়ার হয়েছে তোমার সংসারের ঘানি ঘোরাতে গিয়ে।

—আমি তোমার বাত, সর্দি, কাশি, হাঁপানি রোগের কথা একবারও বলিনি। আমি বলছিলাম তুমি আজকাল বড্ড ভুলে যাচ্ছ।—চাকুতে মাখন নিয়ে টোস্টের পিঠে মাখানোর স্বরে পরমাকে বোঝাতে চান মৈত্রসাহেব।

—না, ভুলিনি। কিছুই ভুলিনি। মেয়েরা অত সহজে ভোলে না।

—ভোলোনি?

—না।

—দ্বিরাগমনের পরের দিন "ব্লু লেগুন" দেখতে কে নিয়ে গেছিল?—হারানো স্মৃতি নিজের ভেতর উস্কে তৃপ্তি পেতে চান মৈত্রসাহেব।

—জম্মের মধ্যে কম্ম। আর কোন্ সিনেমা দেখিয়েছ শুনি?

—কেন, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'? আমি. তুমি, তোমার বাবা মা—

—মুখ নেড়ে বলো না কাউকে। নতুন কাপল্, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কী সিনেমা দেখছে? না, 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'!

মৈত্রসাহেব এই মুহূর্তে পরমার ছবি দেখতে পান। বাঁ কানে মোবাইল ঠুসে, ডান হাতের তালু উল্টে, চোখ ঘুরিয়ে, কোমর দুলিয়ে (শুয়ে শুয়ে কথা বললে অবশ্য কোমরের দুলুনি থাকবে না), ঠোঁট দু'টো ভাঙা ঘুঁটের মতো চিৎ করে ভেংচি কাটছে।

—সে তো তোমার বায়নায়। "বাবা-মাকে নিয়ে চলো না" বলে বায়না জুড়েছিলে, মনে নেই? আমার তো ইচ্ছে ছিল 'আরাধনা' দেখার।

—আবার সেই আরাধনা? ওই নামটা কি তোমার ভোলার ইচ্ছে নেই?—কথা তো নয়,যেন কড়্কড়াৎ শব্দে বজ্রপাত হয় মৈত্রসাহেবের কানে।

—তিলকে তাল করার চেষ্টা কোরো না—মৃদু পরামর্শ ঢালেন মৈত্রসাহেব।

—অতই যদি আরাধনায় সাধ ছিল, তাহলে আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন? আমি কি আর কিছু বুঝিনি ভাবছ?

—কি? কি বুঝেছ?—পদের উন্নতির খবরটা পরমার কানে পৌঁছনো না গেলেও পুরোনো এক সুখের স্মৃতি নিয়ে অন্তত ঝগড়া তো জমানো যাবে। মনে মনে "আরাধনা" শব্দ পিংপিং বলের মতো লোফালুফি করতে করতে খুশি হন মৈত্রসাহেব। সত্যিই কৈশোরে সেইসব দিন ছিল.....

—বড়-লোকের জাপানি পুতুল মেয়ে তোমার মতো হাভাতের গলায় মোটেই ঝুলে পড়ত না।

—আরাধনার বৃহস্পতি বক্রী ছিল।

—বাহ্! নামটা তো বেশ যত্ন করে উচ্চারণ করলে!

—প্রথম প্রেম যে!

—কি বললে? প্রেম? নুড়ো জ্বেলে দিই অমন কাঁথায়। নুন আনতে পান্তা ফুরানো বেসরকারি সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করবে প্রেম? প্রেম করতে রেস্ত লাগে। বুঝলে?

—এখন আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেই।—ঝোঁপ বুঝে কোপ মেরে খবরটা শুনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন মৈত্রসাহেব।

—না, জেনারেল ম্যানেজার হয়েছ!

—জেনারেল না হলেও সিনিয়ার।

—থামো। আমাকে ওসব শোনাতে এসো না। কানা ছেলের নাম কখনো পদ্মলোচন হয় না। ছিলে তো ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট। এই আমি, বুঝলে? আমার কপালে—

—দ্যাখো পরমা, প্রফেশন নিয়ে কথা বলা আমি একদম পছন্দ করি না।—এবার বিরক্ত হন মৈত্রসাহেব। মনে মনে ভাবেন, ঘরে বাইরে সমাজ সংসারে কাতর মানুষের অভাব নেই।

—আমার বয়েই গেছে।—টেলিফোনে দেখতে না পেলেও মনের চোখে দেখে নেন, পরমা দুই হাতের বুড়ো আঙুল ছুঁড়ে মারছে তাঁর দিকে।

—কনগ্রাচুলেশন স্যার।

পরমাকে গুছিয়ে কোনো জবাব শোনানোর আগেই ঘরে ঢোকে সেকশন সহকর্মীরা। সহকর্মী ঠিক নয়, একটু অধস্তন। সুবীর মালো, সন্দীপ সেন, রমেশ কাশ্যপ, দ্বিজদাস পুরকায়স্থ, প্রমীলা বাগচি, অপরূপা খাস্তগীর প্রমুখ। অপরূপা রজনীগন্ধার স্টিক তুলে দেয় মৈত্রসাহেবের হাতে—কনগ্রাচুলেশন।

—থ্যাঙ্ক ইউ।—বাঁ হাতে কানে চাপা মোবাইল। ডানহাতে রজনীগন্ধার স্টিক। ঘাড় ঝুঁকিয়ে অপরূপার অভিবাদন গ্রহণ করেন মৈত্রসাহেব।

—থ্যাঙ্ক ইউ ছাড়া আর কোনো শব্দ আছে তোমার ঝুলিতে যে বলবে? —মোবাইলের ও প্রান্ত থেকে ঠন্‌ঠন্ নিরেট বুলির গুলি ছোঁড়ে পরমা।

—তোমাকে বলিনি, বলেছি অপরূপাকে।—মুখের ফ্যাকাশে ক্যানভাসে যথাসম্ভব খুশি-খুশি ভাব ফোটাতে চেষ্টা করেন মৈত্রসাহেব।

—অপরূপা? বুঝেছি, সেই চুল কাটা ছেলে-ছেলে গায়ে ঢলে-পড়া মেয়েটা? ছি! ছি! তোমার রুচি দেখলে আমার বমি পায়। যে বাপের মেয়ে এম. এ পড়ছে, সেই বাপ কিনা ভরদুপুরে অপুরূপায় মেতে আছে!—ও প্রান্ত থেকে শ্লেষ ছুঁড়ে দেয় পরমা।

রাগে দুঃখে লজ্জায় দাঁত কিড়্‌মিড়্ করে মৈত্রসাহেবের। কিন্তু না, এতগুলো অধস্তন সহকর্মীর সামনে চিড়্‌বিড়ে কোনো জবাব ছুঁড়তে পারেন না। শুধু বলেন, —রাখছি। পরে কথা বলব।

—ম্যাডামের ফোন ছিল বুঝি?—বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনার মতো উছলে পড়ে প্রমীলা।

—হ্যাঁ শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বমি-বমি ভাব। তাই খবর নিচ্ছিলাম। —নির্বিকার জবাব দেন মৈত্র সাহেব।

—বমি-বমি ভাব? আর একটা কনগ্রাচুলেশন দেব নাকি?—সামনে এগিয়ে আসে সন্দীপ সেন। মৈত্র সাহেবের সঙ্গে একই দিনে, একই পদে, একই স্কেলে এই অফিসে যোগ দিয়েছিল সন্দীপ। এখন দু'জনের পদে বিস্তর ফারাক হলেও মাঝে মাঝে নিজের পদাবস্থান ভুলে যায়।

—বসুন। চা খাবেন?—সন্দীপের বক্তব্য অবজ্ঞার ঝুলিতে ছুঁড়ে অন্যদের অনুরোধ করেন মৈত্রসাহেব।

—ওনলি টি? সরি স্যার। আমরা কব্জি ডুবিয়ে খাব।—কাজল নিকানো চোখে 'সখী ভালবাসা কারে কয়' ভঙ্গীতে চন্‌মন্ করে ওঠে প্রমীলা বাগচী।

—ব্লাউজ খারাপ হয়ে যাবে।—ফোঁড়ন ছোড়ে রমেশ কাশ্যপ।

—মুখে খেয়ে পেটে পুরবে, তার সঙ্গে ব্লাউজের কি সম্পর্ক?—চেয়ার টেনে বসতে বসতে অবাক হয় সুবীর।

—দেখছ না, প্রমীলাদির থ্রী কোয়ার্টার হাতায় কব্জি-ঢাকা!—খোলসা করে ব্লাউজ খারাপ হওয়ার খোলসা ছড়ায় রমেশ।

—কবে খাওয়াবেন, বলুন আমি স্লিভলেস পরে আসব।—রমেশ নয়, মৈত্র সাহেবের চোখে চোখ রাখে প্রমীলা।

—আর অপরূপা, তুমি? তুমি কি করবে?—রমেশ, সুবীরকে টপকে সরাসরি আক্রমণ করে সন্দীপ।

—আমি আবার কি করলাম? আমাকে কোনোদিন অত লম্বা হাতায় দেখেছেন কেউ?—ঠোঁট ফোলায় অপরূপা।

—তোর ওই ক্যান্টা-কাঠি হাতে লম্বা হাতা মানায় না। হাতে মাংস আছে,

যে হাতায় সাজাবি?—মাস্‌ল্‌ ওম্যানের মতো নিজের হাত নিজেই ঠুকে দেখায় প্রমীলা।

আমি অপরূপার লিপের কথা ভাবছি।—উদাস স্বরে ভাবনা ছুঁড়ে দেয় সন্দীপ।

—আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার ব্যাগে সব সময় লিপস্টিক থাকে। আপনি লাগিয়ে দেবেন!—একগাল হাসিতে ঝরণার জল হয় অপরূপা।

—ঠিক হয়েছে। যেমন ওল তেমনি তেঁতুল।—তালি বাজায় প্রমীলা।

—আপনার চেম্বারে নো লাইট, তাই এতক্ষণ আসতে পারিনি।—সব প্রসঙ্গ ওলট-পালট করে আসল প্রসঙ্গে ফেরেন দ্বিজদাসবাবু,—আপনি কি এই চেম্বারেই বসবেন, না সিনিয়র ম্যানেজারের চেম্বারে যাবেন?

—এখনো কিছু ভাবিনি। চেম্বার নয়, আসলে কাজ। কাজই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।—'টাকা মাটি, মাটি টাকা'-র মতো নির্বিকার উত্তর শোনান মৈত্রসাহেব। —দেখি, জি. এম. সাহেব যা বলবেন, তাই করব।

—ঠিক আছে স্যার, আপনার আর সময় নষ্ট করব না। পার্টি না দিয়ে আপনি কিন্তু চেম্বার চেঞ্জ করবেন না।—ঘুরে দাঁড়ায় অপরূপা। তাকে অনুসরণ করে অন্যেরা।

সহকর্মিরা চলে যেতেই রজনীগন্ধার স্টিক হাতে তুলে নেন মৈত্রসাহেব। তারপর আধফোটা ফুলগুলো নাকের কাছে এনে লম্বা লম্বা শ্বাস নেন। মনটা ভরে যায় গন্ধে। রজনীগন্ধার গন্ধ বুকের ভেতর ঢুকলেই হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। এই গন্ধের মাদকতায় যেন ফুলশয্যা-ফুলশয্যা পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই কবে পরমাকে নিয়ে এমন গন্ধের ফুলেল বিছানায় রাতের সামান্য একটু মুহূর্তে কেটেছিল, আজ আর তেমন মনে পড়ে না। জীবনের সবচেয়ে ছোট রাতটাই বোধহয় ফুলশয্যার রাত, তাই।

টেবিলের ওপর রাখা মোবাইল ফোনটার ওপর আবার নজর পড়ে। এমন একটা আনন্দ সংবাদ আত্মীয়-স্বজন কাউকেই জানানো হল না। পরমাকে জানাতে গিয়ে তো আনন্দের মাটি একেবারে পাঁক হয়ে গেল।

ফোন বুক সার্চ করতে করতে 'মা'-তে এসে আঙুল থামান মৈত্রসাহেব। 'মা' শব্দটায় যেন আলাদা শিহরণ। কতদিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। কথাও না। মা যখন তাঁর কাছে থাকতেন তখন সব খবর আগে মাকেই শোনাতেন। পরমা কখনো অশান্তি করত, কখনো মুখ গোম্‌ড়া করে এড়িয়ে যেত। মৈত্রসাহেবের ফ্ল্যাটে জায়গার অভাব। মা এখন থাকেন মেজভাইয়ের বাড়িতে। মৈত্রসাহেবের খুব ইচ্ছে করে মাকে কাছে রাখতে, কিন্তু পারেন না নানান কারণে।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই নম্বরটায় চোখ বুলিয়ে নেন একবার। মাকে মোবাইল ফোন আর সিমটা মৈত্র সাহেবই দিয়েছিলেন, মা যেবার হরিদ্বার গেলেন ছোট জামাইয়ের সঙ্গে, সেবার।

—হ্যালো, কে বুড়ো?—ভাবতে ভাবতে কখন যে মাকে রিং করেছেন বুঝতে পারেননি মৈত্র সাহেব। মায়ের স্বরে 'বুড়ো' ডাক শুনেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। নিজের ডাকনামটা কতদিন বাদে কানে শুনলেন কে জানে। পদোন্নতির খবরে যতটা না খুশি হয়েছিলেন তার চেয়েও বেশি খুশি হন এখন।

—কেমন আছ মা?—জানতে চান মৈত্রসাহেব।

—আর থাকা! আছি কোনোমতে। দেখি ভাগের মায়ের গঙ্গা জোটে কবে!—ও প্রান্ত থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন ভেসে এসে ভাসিয়ে দেয় মৈত্রসাহেবের আনন্দ-চন্‌মনে মনটাকে।

—কেন, তোমার বাতের ব্যথাটা কি বেড়েছে?

—জানি না। এই বয়েসে হেঁসেল ঠেলতে ঠেলতে—

—তোমাকে রান্না করতে হয়? কেন, নীতা কি করে? শুনেছিলাম তো একটা রান্নার লোক রেখেছে।—উদ্বিগ্ন হন মৈত্রসাহেব।

—রান্নার লোকের মাইনে দেবে, আবার আমাকেও খেতে দেবে, তাই কি কখনো হয় বাবা?

—এ মেজোর ভারি অন্যায়।—প্রতিবাদী হতে ইচ্ছে করে মৈত্রসাহেবের।

—কেন, অন্যায় কেন? বড়, সেজ, ছোটরাই বা কি ন্যায় করেছে শুনি? —মোবাইলের ও প্রান্তে পাল্টা প্রতিবাদী হন মা।

—আমাদের কাছে যতদিন ছিলে, ততদিন তো তোমাকে রান্না করে খেতে হয়নি মা।

—তা হয়নি। তবে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সঙ্গে মুখ-ঝাম্‌টার ঝোল কম খাইনি। সবই আমার ভাগ্য বাবা, নইলে কি আর যমও আমার নাম ভুলে যায়? জামাইরা এত বলে, যেতে পারিনে। জামাইবাড়ি গিয়ে থাকলে ছেলেদের সম্মান যাবে। কতবার বললাম, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দে। তাও পাঠালি না। কেন? বৌমাদের বদনাম হবে। তাহলে আমাদের মতো বুড়িরা যমের বাড়ি যাওয়ার আগের ক'দিন কোথায় থাকবে বলতে পারিস?

—দেখি নেক্সট্ উইকে একবার যাব।—তড়িঘড়ি ফোন কাটতে ব্যস্ত হন মৈত্রসাহেব।

—আসিস। আমি পথ চেয়ে থাকব।

ফোন ডিসকানেক্ট হতেই চেয়ারের ব্যাকরেস্টে হেলান দেন মৈত্রসাহেব। মাকেও খবরটা দেওয়া হল না। একদিকে ভালোই হয়েছে। পরমাকে টপকে মাকে পদোন্নতির খবর জানানোর খবর পরমার কানে পৌঁছলে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড হবে। তারচে বরং— ।

ঠিক তখনই মৈত্রসাহেবের সাত-পাঁচ ভাবনার জালে ঢিল পড়ে। ল্যান্ড ফোনের

ক্রিং ক্রিং টিল। রিসিভার তুলে নেন কানে। ওপারে গম্ভীর পরিচিত স্বর,—হ্যালো!

—গুড আফটার নুন স্যার।—ও প্রান্তে খোদ জি. এম. সাহেব। তড়াক্ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মৈত্রসাহেব। ভাবখানা যেন জি. এম. টেলিফোনে নয়, তাঁরই চেম্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কনগ্রাচ্যুলেশন!

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

—কবে চার্জ নিচ্ছেন?

—এখনো ঠিক করিনি স্যার। তাছাড়া ভাদ্রমাস। কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রবিবার দিন ভাবছি একটু চুণীলালবাবুর কাছে যাব।

—চুণীলাল কে?

—আমার ফ্যামিলি অ্যাসট্রোলজার স্যার।

— ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান হয় শুনেছি। ফ্যামিলি অ্যাসট্রোলজার—

—আজ্ঞে স্যার উনি ঠিক প্রফেশনাল নন, অথচ—

—আপনাদের, মানে প্রমোটি অফিসারদের হাজার প্রেজুডিস। আরে মশাই, এবেলা অর্ডার পেলেন, ওবেলায় চার্জ নেবেন...।

—ঠিক আছে স্যার। আমি একটু মিসেসের সঙ্গে—

—ইয়েস! দ্যাট ইস দ্যা রাইট ওয়ে। আস্ক ইওর ওয়াইভ অ্যান্ড টেক চার্জ। ব্যস!—ফোন কেটে দেন জি. এম. সাহেব।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।—বলতে বলতে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়েন মৈত্র সাহেব। কলিংবেল বাজান।

—জি হুজুর।—সটান ঢুকে টান-টান দাঁড়ায় লছমন।

—চা বানাও।

—চিনি দেকে? না বিনা চিনিকা?

—হাম ক্যা পিতা হ্যায়?—অ্যাসিস্টেন্ট নয়, সিনিয়র ম্যানেজারের মেজাজে জানতে চান মৈত্রসাহেব।

—দোনা। কভি চিনি দেকে, কভি—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। অভি বিনা চিনিকা বানাও। উমর চাল্লিস হো যানেসে বিনা চিনি সেহদ্‌কে লিয়ে ঠিক রহতা হ্যায়।—নিজের পাতা ফাঁদ থেকে কোনোমতে ফস্‌কাতে চেষ্টা করেন মৈত্রসাহেব।

—জি হুজুর!

লছমন চলে যেতেই সামনে রাখা ফাইলগুলো টেনে নেন কোলের কাছে। কিন্তু না, মন বসাতে পারেন না। ফাইলগুলো কোলের কাছে রেখেই আবার হেলান দেন চেয়ারে। চোখ বন্ধ করেন। বন্ধ চোখের দরজায় একের পর এক উঁকি মারতে

থাকে পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় মুখগুলো। উঁকি মারতে মারতে একটা মুখ এসে থমকে দাঁড়ায় বন্ধ চোখের দরজা জুড়ে। সেই মুখটা খুকির। মৈত্র সাহেবের আত্মজার। পরমার্থ আর পরমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যার ভালো নাম, প্রতিভা। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেন না মৈত্র সাহেব। মোবাইল নয়, এবার ল্যান্ড ফোন থেকেই রিং করেন খুকিকে। একবার, দু'বার, তিনবার, চারবার—না, নো রিপ্লাই। কেন যে সব মোবাইল ব্যবহার করে কে জানে! বিরক্ত হন মৈত্রসাহেব। নিজের দরকারে হাজার বার মিস্‌কল পাঠাবে, অথচ বাবার দরকারে ফোন ধরার প্রয়োজনও মনে করে না আজকালের ছেলে-মেয়েরা।

আবার রি-ডায়াল করেন মৈত্র সাহেব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন—মেয়েকে ফোন ধরিয়ে খবরটা শুনিয়ে তবেই ছাড়বেন। ফোন না ধরলে এ মাস থেকে বন্ধ করে দেবেন রিচার্জ করার টাকা।

—আহ,বাবা। কেন ডিসটার্ব করছ? আমি এ কে এম-এর ক্লাসে ডিক্‌টেশন নিচ্ছি। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে কথা বোল।—রি ডায়ালের পর রি-ডায়াল করতে করতে শেষ পর্যন্ত ফোন ধরেই কড়া কড়া কথা শুনিয়ে ডিসকানেক্ট করে দেয় খুকি। একের পর এক টেলিফোন বিভ্রাটে বিভ্রান্ত মৈত্রসাহেবের নিজেকে মনে হয় হতাশার হাসপাতালে হাঁস-ফাঁস করা এক রোগী।

—সাব! চায়।

ফাইল সরিয়ে কোলের সামনে চায়ের কাপ-প্লেট রেখে যায় লছমন। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই আরাধনাকে মনে পড়ে। চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে আরাধনার করুণা, মায়া আর ভালোবাসা মাখানো মুখের ক্যানভাস। মৈত্রসাহেব স্পষ্ট দেখতে পান হারানো সেই দিনের ছবি। আরাধনার চোখের কোণের সেই আকুতি। যৌবনের পরমার্থকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা-মাখা চোখের ইশারা। যদিও আরাধনা কখনো পরমার্থকে বলেনি—তোমাকে ভালোবাসি। পরমার্থও হাজার চেষ্টা করে উচ্চারণ করতে পারেনি তিনটে মাত্র শব্দ—আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভয়ে না লজ্জায়—আজও বুঝতে পারেন না মৈত্রসাহেব। তবুও আরাধনাকে মনে পড়লে ভালো লাগে। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। তিন-চার বছর আগে একদিন দেখা হয়েছিল অমিতের সঙ্গে। আরাধনার বড়দা অমিতই দিয়েছিল ফোন-নম্বরটা। বলেছিল—অনার সঙ্গে কথা বলিস। খুশি হবে। কিন্তু না, কথা বলা হয়নি আজ পর্যন্ত।

অ্যাটাচির পাল্লা খুলে টেলিফোন ডায়েরিটা বের করেন মৈত্রসাহেব। আজ একবার আরাধনার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? তাঁর পদোন্নতির খবর শুনলে খুব খুশি হবে আরাধনা।

· —হ্যালো?—রিং করার সঙ্গে সঙ্গেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে বাজখাঁই রুক্ষ গলার স্বর।

—আরাধনা আছেন? চানতে চান মৈত্রসাহেব।

—কে বলছেন?

—আমি পরমার্থ, পরমার্থ মৈত্র।

—আরাধনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

—আজ্ঞে উনি আমার ছোটবেলার বান্ধবী ছিলেন।

—কত ছোটবেলার?—ও প্রান্তের প্রশ্নগুলো উকিলের জেরার মতো মনে হয় মৈত্রসাহেবের। তা হোক, সাহসের সঙ্গে রিং যখন একবার করেছেন, আরাধনার সঙ্গে কথা না বলে টেলিফোন ছাড়বেন না। জেরায় জেরায় জেরবার হলেও না।

—আমরা এক পাড়াতেই বড় হয়েছি।

—ও! কি নাম বললেন যেন?

—পরমার্থ মৈত্র।

—কই, এমন কোনো নাম তো আরাধনার মুখে কোনোদিন শুনিনি।

'বড্ড চাপা মেয়ে তো', বলতে চেয়েছিলেন মৈত্রসাহেব। কিন্তু বলতে পারেননি। চুপ করে উত্তর ভাবছিলেন শুধু।

—কি হল পরমার্থবাবু, জবাব দিচ্ছেন না যে? আপনাদের কি প্রেম ভালোবাসা ছিল? ও প্রান্তের মোক্ষম প্রশ্নে কান গরম হয় মৈত্রসাহেবের।

—কি যে বলেন?—লজ্জায় গদগদ হন মৈত্রসাহেব।

—আপনারা কি হামেশাই টেলিফোনে কথা বলেন, না দেখা-সাক্ষাৎও করেন?

—প্রায় পঁচিশ বছর বাদে—

—পঁচিশ বছর বাদে ফোন করছেন? দেবদাস না মজনু? তা মশাই এতদিন বাদে ফোন নম্বর কোথায় পেলেন?

—অমিতের কাছে। তাও বছর তিনেক আগে। দাঁতে দাঁত চাপেন মৈত্রসাহেব, কিন্তু রাগেন না। রাগলে ফোন ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

—এতদিন বাদে হঠাৎ কি দরকার পড়ল, জানতে পারি কি?

—সেটা ব্যক্তিগত। আরাধনা থাকলে একটু—

—আরাধনা এখন এখানে থাকে না।—ও প্রান্তের স্বর কঠোর হয়।

—কোথায় থাকে?

—বলতে পারব না।

—কোনো কন্ট্যাক্ট নম্বর?

—না মশাই, ডিভোর্সী স্ত্রীর কন্ট্যাক্ট নম্বর রাখার মতো জায়গা আমার ফোনবুকে নেই। স্যরি।

টেলিফোন ডিসকানেক্ট হতেই বিষণ্ণতায় ভরে যায় মৈত্রসাহেবের মন। আরাধনা ডিভোর্সী? কি এমন অঘটন ঘটল? চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করেন সাহেব।

—বাক্স উঠায়া যায়?

কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন বুঝতে পারেন না মৈত্রসাহেব। লছমনের ডাকে সম্বিৎ ফিরতেই দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়ির ওপর চোখ পড়ে—ছ'টা পঁয়তাল্লিশ।

—জি. এম. সাব নিকাল গয়া?

—জি হুজুর।—অ্যাটাচি গোছাতে গোছাতে জবাব দেয় লছমন।

আনন্দ আর বিষাদে ভরা মনের খাঁচা, মানে পার্থিব দেহটাকে চেয়ার থেকে তুলে চেম্বারের বাইরে আসেন পরমার্থ মৈত্র। তারপর লছমনের হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে সোজা হাজির হন লিফ্‌টের দরজায়। নিচে নেমে অফিস করিডোর টপ্‌কে পৌঁছে যান অফিস-পাড়ার জমজমাট সান্ধ্য রাস্তায়। হাত দেখিয়ে দাঁড় করান ট্যাক্সিটাকে। আদেশ দেন ড্রাইভারকে,—চলুন। গড়িয়ায়। আজ আর বাস-ট্রাম ট্রেনে চাপতে ইচ্ছে করে না একটুও।

জ্যাম-জমাট রাস্তায় গড়িয়ে চলা ট্যাক্সিতে আধশোয়া মৈত্রসাহেব সারাদিনের ঘটনাগুলো লোফালুফি করতে থাকেন চোখ বন্ধ করে। তারপর বাড়ির প্রায় কাছে এসে দাঁড় করান ট্যাক্সি। টুক করে নেমে পড়েন 'মণ্ডা মেঠাই'—এ। পরমার জন্যে একশ টাকার ক্ষীর-চম্‌চম্‌ আর খুকির জন্যে পঞ্চাশ টাকার চিত্রকূট কিনে আবার চেপে বসেন। মা কিংবা আরাধনার সমস্যাগুলো আড়াল করে নিজের সাফল্যে কেন্দ্রীভূত করতে চান নিজেকে। মানুষ অতীতের ফসিল নয়, বর্তমানের ফুল-কাঁটাতেই জীবন কাটাতে ভালোবাসে।

রাত প্রায় আটটার সময় ঘরে ঢোকেন মৈত্রসাহেব।

ডাইনিং টেবিলের ওপর ক্ষীর-চম্‌চম্‌ আর চিত্রকূটের প্যাকেট নামিয়ে সোজা চলে যান বেডরুমে। বেডরুমের দু'পাশে দু'টো ঘর। একটা সার্বজনীন। অন্যটা খুকির পড়ার ঘর। সার্বজনীন ঘরের সোফায় আধশোয়া পরমা চোখ ঠিক্‌রে রেখেছে টিভির পর্দায়। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর বস্তু নিরোট হয়ে থাকে পরমার কাছে। কারণ তখন চলে সিরিয়াল—একের পর এক।

খুকি সিরিয়ালে ততটা মাতোয়ারা নয়। পড়ার টেবিলে বই-খাতা খোলা। চোখ বইয়ের পাতায়। কান মোবাইলে। মন গল্প-কথায়। সাড়ে ন'টার পর মায়ের ছেড়ে দেওয়া টিভির সামনে অবস্থান হবে খুকির। ওর চ্যানেলগুলোতে তখন চলবে ইয়া-হু-হু নাচের প্রতিযোগিতা।

বাড়ি জুড়ে পরমা আর খুকির এমন সিরিয়াস মগ্নতা ভেঙে নিজের পদোন্নতির সংবাদ পরিবেশন করতে সাহস হয় না মৈত্র সাহেবের। সুতরাং একের পর এক নিজের ছকে ঢালা কাজগুলো লুডো খেলতে খেলতে 'ছক্কা' ফেলার আনন্দে করে চলেন। দশটা নাগাদ খাবার টেবিলে ডাল, ভাত, রুটি, তরকারির সঙ্গে চাট্‌নির

মতো পরিবেশন করে দেবেন সারাদিন বুকের মাঝে বয়ে-বেড়ানো কৃতিত্বের সংবাদটা।

—তুমি কি কিছু খাবে? সিরিয়ালে চোখ রেখেই জানতে চায় পরমা।

—ক্ষীর-চম্‌চম্‌ আর চিত্রকূট এনেছিলাম।

—ফ্রিজে তুলে রাখো।

মৈত্রসাহেব ভেবেছিলেন পরমা হয়ত কারণ জানতে চাইবে। কিন্তু না, বরং আদেশ দিয়ে কারণটাকে 'ফ্রিজ্‌ড্‌' করে দেয়।

সারাদিনের ধকল বাথরুমের জলে ধুয়ে, গামছায় মুছে নিজের ঘরের কোণে ফিরে আসেন মৈত্রসাহেব। বিছানায় শুয়ে সকালের খবরের কাগজ মেলে ধরেন চোখের ওপর। কিন্তু না, পড়তে পারেন না।

—বাবা, খাবে চলো।

খুকির ডাকে তন্দ্রা ভেঙে যায়। বিছানা ছেড়ে এসে বসেন ডাইনিং টেবিলে। খুকির মুখোমুখি। রুটির প্লেটে তরকারি ঢালতে ঢালতে তৈরি করে নেন খুশি-ডগ্‌মগ্‌ মনটাকে। খবরটা পরিবেশনের পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টির স্বার্থে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন পরমার মুখে পরমার মনের খাতা।

—জানলি খুকি—

—বাবা তুমি দিনরাত খুকি খুকি বলবে না তো!—হঠাৎ হাতে বসা শুঁয়োপোকা তাড়ানোর স্বরে বাবার পরম স্নেহের আহ্বান ছুঁড়ে ফেলে খুকি।

—কেন, খুকিকে খুকি বলব না কেন?

—না, আমি মোটেও খুকি নই। তোমার ওই খুকি খুকি ডাকে বন্ধুদের সামনে আমার মাথা কাটা যায়। তারা টিজ্‌ করে। ভেংচি কেটে ছড়া কাটে।

—আমার খুকিকে তাহলে আমি কি নামে ডাকব?—রুটি তরকারির একটা গ্রাস মুখের ভিতর চালান করে মজা করেন মৈত্রসাহেব।

—কেন, আমার নাম প্রতিভা। প্রতিভা বলেই ডাকবে।

—শুনলে পরমা, মেয়ের কথা—

—শোনার কি আছে? ও যখন খুকি খুকি ডাক পছন্দ করে না—

—বাপ-মায়ের কাছে খুকিরা কি কখনো প্রতিভা হয়?—হাল্কা থাকার চেষ্টা করেন মৈত্রসাহেব।

—তা হলে ডাকবে না। তাই বলে খুকি খুকি বলবে না, বলে দিলাম।—সাফ জানিয়ে দেয় খুকি। তারপর চোখের বলয় কাঁপিয়ে নালিশ করে পরমাকে,—জানো মা, বিকেলে আমি এ.কে.এম.-এর ক্লাসে ডিক্‌টেশন নিচ্ছি। অমনি বাবার ফোন। ফোনের পরে ফোন। ভাগ্যিস সাইলেন্স মুডে ছিল। এ.কে.এম. স্যার শুনলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিত না! বলো মা?

—কি করব বল? অফিসে যদি কাজকর্ম থাকত তাহলে আর সময়-অসময়ে ফোন করে বিরক্ত করার ফুরসৎ পেত না। সবে একটু দুপুরবেলায় চোখটা বুঁজেছে, অমনি রিং। একবার না, দু'বার না, পর পর রিং। কি না কি এক খবর না দিলে তোর বাবার ভাত হজম হচ্ছিল না।—মেয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে পরমা।

—দেখলে তো! আসলে বাবা দিন দিন বাতিকগ্রস্থ হয়ে উঠছে।—ভাতের পাহাড় ভেঙে পাতে ডাল ঢেলে নেয় খুকি।

—বাতিকগ্রস্থ মানে?—মাছের ঝোল মাখানো রুটি গলার কাছে আটকে যায় মৈত্রসাহেবের। অতবড় অফিস ম্যানেজ করছেন অথচ তিনজনের সংসার সামলাতে এমন হিমসিম অবস্থা, ভাবতেও পারেন না।

—বাতিক নয় তো কি? সন্দেহ বাতিক। বাবার অবর্তমানে আমরা কি করছি তার খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা।—অবলীলায় অভিযোগ ঢালে খুকি।

—ঠিক বলেছিস।—নিজের কোলে ভাতের থালায় ঝোল ঢালে পরমা।

—কি আবোল-তাবোল বকছ তোমরা?—কোনোমতে হেঁচকি সামলান মৈত্র সাহেব,—নিজের মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হবে কি পাঁজি-পুঁথি দেখে?

—তাই বলে সময় অসময় মানবে না? মেয়েটাকে স্যার যদি ক্লাস থেকে বের করে দিতেন? কি হত? তুমি নোট লিখে দিতে?—সরাসরি আক্রমণ করে পরমা,—কাল থেকে তুই সুইচ অফ করে রাখবি।

মোক্ষম উত্তর দিতে পারতেন মৈত্রসাহেব, কিন্তু দেন না। বোবা হয়ে যান। বোবার তো কোনো শত্রু নেই। বোবাকে ঝগড়াও করতে হয় না। খাবার শেষ করে বেসিনে হাত ধুয়ে চলে যান নিজের ঘরে।

হস্টেল জীবনের অভ্যেসটা আজও ভোলেননি তাই রক্ষে। পরিপাটি বিছানা পেতে মশারি বেঁধে নিজের বড় শরীরটা চালান করে দেন সিঙ্গেল খাটের বুকে। তারপর আলো নিভিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন শবাসনে। ঠিক মায়ের কোলে শিশুর মতো। শুয়ে শুয়ে মাপতে থাকেন অন্ধকারের গভীরতা। সেই গভীরতা মাপতে মাপতে নিজের মনটাই ডুবে যায় অন্ধকারে। মনে পড়ে বাবার কথা। বাবা বলতেন, ঘর চেয়ে পর ভালো, পর চেয়ে জঙ্গল। জীবনের শেষ সাফল্যের খবরটা মা বৌ মেয়ের কানে পৌঁছানো গেল না, অথচ সন্দীপ অপরূপারা যেচে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

কিন্তু না, শবাসন ছেড়ে ছট্‌ফট্ করেন মৈত্র সাহেব। খবরটা তিনি জানাবেনই। কাল হোক, পরশু হোক কিংবা একমাস পরে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবেন শ্রেণীবদ্ধ কলমে। তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, লিভ স্যালারির টাকা পরমা আর প্রতিভা মৈত্রকে ভাগ করে দিয়ে স্বেচ্ছা অবসর নেবেন। পেনশনের টাকা ই সি এস করে পাঠিয়ে দেবেন মাকে—বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানায়। আর নিজে? সংসারে মুখে 'ধুস্ শালা'

ছুঁড়ে একতারা হাতে নেমে পড়বেন গ্রাম ছাড়া সেই রাঙা মাটির পথে, যেখানে আপন পর কেউ থাকবে না। থাকবে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

ডানপাশ ফিরে কোল-বালিশটা টেনে নেন মৈত্রসাহেব। ঘুমের টালমাটাল দাপটের ভিতরে ডুবতে ডুবতে মনে পড়ে অনেক, অনেকদিন আগে পড়া নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার কয়েকটা লাইন—

অথচ কাকে বলে ঘর,
কখনও কখনও আমি তাও ঠিক বুঝি না।
রাত্তিরটা যেখানে কাটে, সেটাই যথার্থ ঘর কিনা,
না বুঝে আবার নামি পথে।
দাঁড়ের ময়নাটি বলে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা,
আমি ঘর খুঁজতে থাকি হাটে-মাঠে পাহাড়ে পর্বতে।

পাটকেল

সাতসকালে আবার কি কুরুক্ষেত্র বাঁধলো?

লজ্জা-শরমের বালাই একেবারে ধুয়ে মুছে হজম করে ফেলেছে সব। ঘর-বার আপন-পর একাকার হয়ে গেছে। ঈশান কোণের হাওয়ায় পাটের দোলনায় বসে দোলে দোদুল দোলে ভঙ্গীতে দোল খেতে খেতে খবরের কাগজ চোখ রেখে চা পান করছিলেন বঙ্কুবাবু। আর মনে মনে লিখছিলেন বাজারের ফর্দ। হঠাৎই সব ভেঙে একেবারে চুরমার। কানের পর্দায় অমন ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ আছড়ে পড়লে কি আর মনের ভাবনা মনে থাকে? থাকে না।

কতদিন পরে বাবাজীবন এসেছে। এখন একটু যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? সরমার উপর সত্যি সত্যি রাগ হয় বঙ্কুবাবুর। এতদিন রাগ হতো না। হতো করুণা। আহা, বেচারা। দেমাক দেখাবার একটা প্রাণী তো দরকার। বঙ্কুবাবুর তবু অফিস ছিলো। অধস্তন কিছু কর্মচারি ছিলো। যাদের উপরে মেজাজ দেখিয়ে 'বড়সাহেব' শিরোপা মাথায় নিয়ে শেষপর্যন্ত অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু সরমা? সংসারে কে ছিলো সরমার? এক মেয়ে শম্পা আর এক ছেলে সুপ্রতিম ছাড়া?

শম্পার বিয়ে হয়েছে বরুণের সঙ্গে। তিন বছর যাবৎ শ্বশুর বাড়ির শনি গ্রহে সে স্থায়ী নিবাসী। মাঝে মধ্যে মা বাবার কাছে হুট হাট চলে আসলেও বরুণ আসতে পারে না। ব্যবসার ক্ষতির চেয়ে শ্বশুরবাড়ির আদর অনেক বেশি তেতো মনে হয় তার কাছে।

অন্যদিকে সুপ্রতিম বিয়ের পরেই সরমার সংসারের সদস্যপদ বাতিল করে শ্বশুরবাড়ির ঝোলে ঝালে অম্বলে মিশে আছে। শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার পর শাশুড়ির দেখভালের চিন্তাই সুপ্রতিমের ধ্যান জ্ঞান।

সুতরাং সরমাব কোনও দোষ চোখে পড়ে না বঙ্কুবাবুর। সারাজীবন খেয়ে না খেয়ে মানুষ করা মেয়ে পর হয়ে গেল। আর ছেলে, সে যে কোনওদিন বঙ্কুবাবু সরমার সংসারে ছিলো মনেই হয় না। ছেলের চেয়ে তবুও মেয়ে ভালো। দু'মাস ছ'মাসে এক আধবার অন্তত এসে বাবা মায়ের হাল হকিকৎ খোঁজ নেয়। হরলিক্স প্রোটিনেক্স লুঙি পাঞ্জাবী দিয়ে সেবা করে যায়। যে দু'একদিন শম্পা কাছে থাকে,

সেই ক'দিন সরমার মন মেজাজটাও টাটকা থাকে। বাকি দিনগুলোয় তো শুধু তিরিক্ষের ধু ধু।

আজ তো শম্পা আছে। সঙ্গে বরুণ। তিন বছরের শ্বশুর বাড়িতে আজ তার পঞ্চম দিন। আনন্দের তো সীমা থাকার কথা নয় সরমার। তবে কেন এমন বোমা ফাটলো? শব্দের গাম্ভীর্যে তো মনে হয় ডজন খানেক খতম। বোন চায়নার কাপডিস, নয়তো সৌখিন কাঁচের ডিনার সেট। কাদের যে গঙ্গা প্রাপ্তি হলো কে জানে?

চিন্তা আর ভয়ের দোলাচলে দোলনা ছাড়তে কষ্ট হয় বঙ্কুবাবুর। সঙ্গে লজ্জাও মিশে যায়। জামাই বাবাজীবনের সামনে হয়তো বালী-সুগ্রীবের লড়াই শুরু হয়ে গেছে মা আর মেয়ের। সকালের মুডটাই নষ্ট হয়ে যায়।

তবুও উঠে পড়েন বঙ্কুবাবু।

দোলনা ছেড়ে দুলে দুলে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ান। গলার স্বর খাদ নয় একেবারে খাদানে নামিয়ে জানতে চান—কি হলো? কিছু ভাঙলো নাকি?

হ্যাঁ ভাঙলো। তোমার জামাইয়ের হাত থেকে পড়ে কাপডিশ আর মায়ের লাথি খেয়ে কাঁচের গেলাস। একটু সরে দাঁড়াও, পায়ে কাঁচ ফুটবে—মেয়ের পরিবেশিত সংবাদ শুনে একটু আশ্বস্ত হন বঙ্কুবাবু। যাক তবুও বাঁচোয়া। বাবাজীবনের হাত থেকে পড়ে ভেঙেছে। কিন্তু সরমা? সরমা হঠাৎ কাঁচের গেলাস নিয়ে ফুটবল খেলতে গেল কেন?

কেটে-ছোড়ে যায়নি তো? হাতে পায়ে কাঁচ ফোটেনি তো? উৎকণ্ঠিত বঙ্কুবাবু সরমার খোঁজে রান্নাঘরের ভিতর ইতি উতি নজর ছুঁড়ে দেন—টিটেনাস দিতে হবে না কি?

কেন টিটেনাস দিতে হবে কেন? কাপ প্লেটের ভাঙা টুকরো পরিষ্কার করা স্থগিত রেখে বাবার মুখে দৃষ্টিপাত করে শম্পা।

না, কাঁচ তো বড়ো খারাপ জিনিষ তাই। কথায় বলে কাঁচ ভাঙলে জোড়া লাগে না—বরুণ বাবাজীবনের....।

ঘড়িটা দেখেছ একবার? কাঁচ প্রসঙ্গ নয়, রান্নাঘরের ভিতর থেকে একেবারে অন্য খাতে প্রশ্ন বইয়ে দেন সরমা।

কই না তো!

তা দেখবে কেন? দোলায় বসে দুলুনি খেলেই পেট ভরে যাবে, ঘরের ভিতর জামাই, তাই যথাসম্ভব মাখন মাখানো ধারালো স্বরে বঙ্কুবাবুকে শাসন করার চেষ্টা করেন সরমা।

ভাঙলো কি করে? কাপ প্লেট কাঁচের গেলাস? সরমাকে এড়িয়ে এবার মেয়ের কাছে জানতে চান বঙ্কুবাবু।

একটু আগেই তো বললাম। তোমার জামাইয়ের হাত থেকে পড়ে কাপ ডিস...।

হ্যাঁ হ্যাঁ! মনে পড়েছে। আসলে কি জানিস? বয়স মানে এজ। বয়স হচ্ছে তো তাই অনেক কিছুই মনে রাখতে পারি না, শম্পার উত্তর শেষ হওয়ার আগেই নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে নেন বঙ্কুবাবু।

সবই মনে রাখতে পারে। মানি ব্যাগে দশটাকা কম হলে চোদ্দবার কৈফিয়ৎ নেওয়ার সময় তো ভুল হয় না। আসলে কি জানিস? কাঠগড়ায় মেয়েকে সাক্ষী করার ভঙ্গিতে দাঁতে দাঁতে চাপেন সরমা—আসলে হলো গন্ধ। ওই যে কাঁচের গেলাসে আমার গন্ধ পেয়েছে। এত তাড়াতাড়ি ছাড়বে?

আহ! মা, একেই তোমার জামাইয়ের মেজাজটা দেখছো খিঁচড়ে আছে তার উপর যদি তুমি আর বাবা শুরু করো....

কেন? কেন? বাবাজীবনের মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে কেন? মেয়ের কথা মাঝপথে থামিয়ে জেনে নিতে চান বঙ্কুবাবু—চা ঠোঁটে দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম লিকার কম হয়েছে। চিনি বেশি। এত দামী চা পাতা আনি সেই টসের দোকান থেকে, তবুও তোর মা কোনওদিন এককাপ মেজাজী চা খাওয়াতে পারলো না।

নিজে করে খেলেই তো পারো। এদ্দিন না হয় অফিস ছিলো। এখন কি জমিদারিটা আছে শুনি? সারাদিন স্কিমে পাওয়া খবরের কাগজ মুখস্থ করা ছাড়া সংসারের কুটোটিও তো হাত দিয়ে সরাতে দেখি না—মুখ ঝামটা ঠিক নয়, অনেকটা সবক শেখাতে চেষ্টা করার মতো বলেন সরমা। বলেন, তবে রান্নাঘরের একদম নিভৃত কোণা থেকে বলেন।

চা তৈরি করাও একটা আর্ট। শিল্প। বুঝলে? আগেকার দিনে বড় বড় জংশন স্টেশনে লেখা থাকতো দেখোনি—চা পানের উপকারিতা। চা বানানোর পদ্ধতি ইত্যাদি ইত্যাদি—সরমার খাটো স্বরের চেয়েও ছোট স্বরে উত্তর দেন বঙ্কুবাবু।

সারা জীবনে কটা বড় জংশন স্টেশন দেখিয়েছ শুনি? দৌড় তো ওই মসজিদ পর্যন্ত—নৈহাটি আর ব্যাণ্ডেল। তাও দেখা হতো না, যদি কিনা—

মামার বাড়ি না থাকতো, মায়ের শূন্যস্থান পূরণ করে দেয় শম্পা। সিঙ্কের বুকে কেটলি ধুয়ে নতুন চা বানানোর তোড়জোড় শুরু করে—তুমি সরো। আমি দেখছি।

তাই দেখ। আটটা বাজতে চললো। বাবাজীবনের এখনও চা পান হলো না। ভারি অন্যায় কথা—মেয়েকে পরামর্শ ও পরোক্ষ সরমাকে মৃদু শাসন করে আবার পিছিয়ে আসেন। অনেকটা সেই যৌবনবেলায় ছাত্র আন্দোলন করার সময় শেখা One step forward, two steps backward ভঙ্গিতে। তারপর এসে দাঁড়ান বরুণের ঘরের দরজায়। অবসরপ্রাপ্ত বড়বাবুর মেজাজে নয়, এক্কেবারে নতুন চাকরি পাওয়া অধস্তন কর্মচারির সুরে জানতে চান—খবরের কাগজ দেবো?

না, সংক্ষিপ্ত এক শব্দের উত্তর শোনায় বরুণ।

সকালে বুঝি তুমি খবরের কাগজ পড়ো না? বরুণ বাবাজীবনের মেজাজে মাখন মাখানোর চেষ্টা করেন বঙ্কুবাবু। চাকরী জীবনে বড়বাবুর চেয়ারে বসে বড় বড় সব সাহেবদের মেজাজ মর্জি বুঝে কখনও সরষে, কখনও নারকেল, কখনও নন-স্টিক, কখনও সানফ্লাওয়ার কিংবা রাইস ব্যান তেল দেওয়ার অভ্যাস এখনও ভোলেননি বোঝা যায়।

পড়ি। তবে চা খাওয়ার পর, গম্ভীর উত্তর দেয় বরুণ।

ভালো। ভালো। খুউব ভালো হ্যাবিট। আমার আবার চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ না হলে ঠিক জমে না। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট তো খাই না, খাই খবর—নিজের অভ্যোস নিজেই গর্বিত হন বঙ্কুবাবু।

কি হলো? চা হলো? না কি রাস্তার দোকান থেকে মেরে আসবো? শ্বশুরমশাইয়ের তারিফ টপকে স্ত্রী শম্পার উদ্দেশে চিৎকার করে বরুণ।

কিরে শম্পা? কি হলো তোদের? মা মেয়ে দু'জনে মিলে এককাপ চা এখনও বাবাজীবনের হাতে তুলে দিতে পারলি না? কি কথার কি জবাব। মনে মনে বরুণের প্রতি ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে প্রকাশ করেন না বঙ্কুবাবু, বরং মেয়ে বউয়ের প্রতি বিরক্ত হন।

আপনাদের এখানে ভালো চায়ের দোকান কোনটা? বিছানা ছেড়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে দু'হাতে গৌর-নিতাই ভঙ্গিতে আলস্য ছাড়ে বরুণ।

আহা দোকানে চা খেতে যাবে কেন? ব্যস্ত হন বঙ্কুবাবু।

কি করবো বলুন! সকাল সকাল এককাপ গরম চা না হলে....

মেজাজ খারাপ হয়, তাই তো? জামাই বাবাজীবনের কথার ফাঁকটুকু পুরণ করে দেন বঙ্কুবাবু—হওয়াই উচিৎ। সকাল মানেই চা। চা ছাড়া কি সকাল মানায়?

তুমি তোমার কাজে যাও তো বাবা, বরুণ কোনও জবাব দেওয়ার আগেই চায়ের কাপ ডিস হাতে ঘরে ঢোকে শম্পা। দাঁড়িয়ে থাকা বরুণের সামনের বেড সাইড টেবিলের উপর চায়ের কাপ নামিয়ে স্বামীর মুখোমুখি হয়—চা তো একবার দেওয়া হয়েছিলো, না কি?

সেটা মোটেও চা ছিলো না, আবার বিছানায় বসে পড়ে বরুণ—ছিলো চারবত।

চারবত? চমকে ওঠেন বঙ্কুবাবু।

হ্যাঁ! চারবত। ঠান্ডা জলে চা পাতা ভেজানো সরবত, চারবত শব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়ে দেয় বরুণ।

মোটেও না, প্রতিবাদে টানটান হয় শম্পা—নিজের ঘুম ভাঙেনি সে কথা কে বলবে?

ঘুম ভাঙাতে জানতে হয়, শম্পার প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের মন্তব্য পেশ করে বরুণ।

হুঁ! ভারি আমার কচি খোকা! ঘুম ভাঙাতে জানতে হয়! বলিহারি কথা বাপু—চারবত। বাংলা ডিকশনারিতে নতুন শব্দ, বরুণের মন্তব্যের প্রতিবাদে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চায় শম্পা—তাই বলে তুমি কাপ-ডিস ছুড়ে ফেলে দেবে?

এতক্ষণে সঞ্জয়-রূপী শম্পার মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাপ-ডিশ টুকরো পর্বের সংবাদ জানতে পারেন বঙ্কুবাবু।

হাজারবার ছুড়বো। বলো তো এই কাপ-ডিসটাও ছুঁড়ে ভাঙতে পারি, বলতে না বলতেই বেড সাইড টেবিলের উপর থেকে গরম চা-য়ে ঠাসা কাপ প্লেট হাতে তুলে নেয় বরুণ।

ভাঙো, হাজারটা কাপ-ডিস ভাঙো। কিন্তু দোহাই তোমার চিৎকার করো না—আবার সেই এক পা এগিয়ে গিয়ে দুপা পিছিয়ে এসে রণে ভঙ্গ দেওয়ার ভঙ্গি করে শম্পা।

না, চিৎকার করবো না, গলার স্বর এবার খাদে নামে বরুণের—টাঙ টুইস্টার খেলবো। পাখি পাকা পেঁপে খায়। তেলে চুল কালো, চুলে তেল ভালো।

দরকার হলে তাই খেলবে। তবে মনে মনে। পাড়া মাথায় করে নয়, বলতে বলতে বঙ্কুবাবুকে সুইং করে দরজার ফাঁক গলে ঘর ছাড়ে শম্পা। এর পরেও বাবাজীবনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচিন মনে হয় না বঙ্কুবাবুর। সুতরাং নিজেকে আবার ফেরৎ পাঠান রান্নাঘরে। স্ত্রী কন্যার পাশে। সরেজমিনে মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্কটা বুঝে নিতে।

কি রে রাত্রিবেলা কি ঝগড়া করেছিস বাবাজীবনের সঙ্গে, রান্নাঘরে ঢুকে মেয়ের কানে সোজা সাপটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন বঙ্কুবাবু।

কেন? ঝগড়া করবো কেন? প্রশ্নবোধক পাল্টা উত্তর শোনায় শম্পা।

তাই তো। ঝগড়াই বা করবে কেন! মনে মনে ভাবেন বঙ্কুবাবু। ওদের এখন ফুটফুটে বয়েস। দাম্পত্যে ডগমগ হয়ে ডুবে থাকার সময়। অন্তত বঙ্কুবাবু আর সরমা তো তাই ছিলেন। বিয়ের পর তিনটে বছর তো তুড়ি মারতে উড়ে যায়। হঠাৎ স্মৃতির সুতোয় কোথায় যেন টান পড়ে। স্ত্রী কন্যার আড়ালে টুক করে একবার জিভ কেটে শুধরে নেন ভাবনাটা। কারণ তাদের দাম্পত্যের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তো সুপ্রতিম চলে এসেছিলো।

তুই নিশ্চয়ই বরুণকে কিছু বলেছিস। নইলে জামাই তো আমার এমন ছিলো না—দোষারোপ করেন সরমা।

তুমি ঠিকই ধরেছো। ছিঃ শম্পা, ছিঃ। কতদিন পর বেচারা শ্বশুর বাড়ি এসেছে। একটু যত্ন আত্তি করবি....।

অম্বলে আর পাঁচফোড়ন সম্বড়া দিতে হবে না। রুটি হয়ে গেছে। খেয়ে দেয়ে এবার বাজারমুখো হও—মেয়ে নয় উত্তরের লঙ্কাপোড়া ঝাঁঝ ওড়ান সরমা

এবং অবশ্যই উদারার নি রে গা সুরে।

রুটি? বাবাজীবনকে রুটি খেতে দেবে? ঠান্ডা মাথায় জামাই-ভোগের মেনুটা একবার জেনে নিতে উদ্‌গ্রীব হন বঙ্কুবাবু।

আহ বাবা! কেন কথা বাড়াচ্ছো বলো তো? হিংয়ের কচুরী কি তোমার পেটের সহ্য হবে? বলতে বলতে দু'খানা রুটি আর একদলা আখের গুড় স্টেনলেস স্টীলের প্লেটে রেখে বঙ্কুবাবুর সামনে মেলে ধরে শম্পা।

ঘরে বড়সাহেবের চেয়েও বড় অতিথি একমাত্র জামাই। সুতরাং লোভের লোলুপ কামনা মনের আড়ালে লুকিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি রান্নাঘর ছাড়েন বঙ্কুবাবু। লুচির চেয়ে সামান্য একটু বড় রুটি জোড়ার দিকে তাকিয়ে প্রাণ ভরে গাইতে ইচ্ছে করে—হরি দিন তো গেল, সন্ধে হলো। কিন্তু না, পারেন না। বরং গুণগুণ সুরে ভাজতে থাকেন রবীন্দ্রনাথের গান—আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার/তুমি সদা নিকটে আছ বলে/স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা/গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা।

বাহ্! আপনার গানের গলাটা তো বেশ ভালো, ঘর ছেড়ে কখন যে বরুণ বাবাজী সামনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করেননি বঙ্কুবাবু।.

কী যে বলো বাবাজীবন, লজ্জার শামুক খোলে গুটিয়ে যাওয়ার দশা হয় বঙ্কুবাবুর—সারাজীবন ফাইলের ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে গানের গলায় ঝুলকালির পলেস্তারা পড়ে গেছে।

একটু সাফ সুতরো করে কোনও একটা ব্যাণ্ডের ব্রাণ্ডে ফেলতে পারলে কিন্তু দারুণ হবে, বরুণ তারিফ না তামাসা করছে বুঝতে পারেন না বঙ্কুবাবু—আপনার এতবড়ো গুণের কথাটা শম্পা তো কোনওদিন বলেনি।

সত্যি সত্যিই আমি গানটান জানি না। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা কখনও শোনেওনি, রুটি আখের গুড়ের প্লেট হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্কুবাবু। গান যে একেবারে জানতেন না তা নয়। কিন্তু....।

আসুন না, ভেতরে এসে বসুন, দু'হাত প্রসারিত করে আহ্বান করে বরুণ।

আর ঠিক তখনই ইয়া বড়ো চিনেমাটির প্লেটে হিংয়ের কচুরি, আলু ফুলকপির ডালনা, তেল চপচপে গোল গোল বেগুন ভাজা এবং অন্য একটা প্লেটে চারটে রাজভোগ হাতে ঘরে ঢোকে শম্পা। বরুণের চোখে চোখ রেখে নির্দেশ দেয়—নাও, ঠান্ডা হওয়ার আগে খেয়ে নাও।

আর একটা প্লেট নিয়ে এসো, স্ত্রীকে গম্ভীর আদেশ দেয় বরুণ।

না না বাবাজীবন। এই ক'টা কচুরি আর প্লেটে তুলতে হবে না। এটাই তো খাওয়ার বয়েস, রে রে করে জামাইয়ের প্রতি জামাই আদর ছড়িয়ে দেন বঙ্কুবাবু।

আপনার গুড়-রুটির প্লেটটা শম্পাকে ফেরৎ দিয়ে দিন।

মানে? ভ্রু জোড়া কপালে ওঠে বঙ্কুবাবুর।

খুউব সোজা। আমি যা যা খাবো আপনিও তাই খাবেন। বলেই শম্পাকে ধমক দেয় বরুণ—কি হলো দাঁড়িয়ে রইলে যে? কথা কানে যাচ্ছে না?

না, বাবা না। ওঁর পেটে সইবে না। ছেড়িয়ে-ধেড়িয়ে একাকার করবে, স্বামী-কন্যাকে টপকে সামনে এসে দাঁড়ান সরমা।

মানে? শাশুড়ির বক্তব্য শুনে অবাক হয় বরুণ।

পেট খারাপ হলে তোমার শ্বশুরমশাইয়ের কোনও সাড় থাকে না। কাপড় চোপর নোংরা করে...বাকিটা জামাইয়ের কানে তুলতে লজ্জিত হন সরমা।

হোক নোংরা। আপনারা আছেন কি করতে? পরিষ্কার করবেন, বলেই শম্পার দিকে নজর ফেলে বরুণ—শহীদ বেদী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে।

দাও, হ্যাঁচকা টানে বঙ্কুবাবুর হাত থেকে রুটি আঁখের গুড়ের থালা ছিনিয়ে নেন সরমা। তারপর কপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, কাঁচা-পাকা চুলের গুচ্ছ সিঁথির মোড়ে ঠেলে চোখের কঠোর ঝলক ছুঁড়ে দেন বঙ্কুবাবুর মুখমণ্ডলে। ইংরেজি এবং ইদানিং চলিত 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ বুঝিয়ে দেন মনের কথা—আমি কি কিছুই বুঝি না ভাবছো? গুড়-রুটির থালা জামাইয়ের সামনে মেলে আদিখ্যেতা দেখানো? হিঙের কচুরি খাওয়ার শখ? মেটাবো, সব মেটাবো। উপোস করিয়ে চিড়ের কাথ খাইয়ে রাখবো।

আপনি বসুন, চেয়ার টেনে বঙ্কুবাবুর সামনে রাখেন বরুণ।

তুমি শুরু করে দাও। কচুরি ঠান্ডা হয়ে যাবে—সরমার চলে যাওয়ার চলমান দৃশ্য তখনও বঙ্কুবাবুর মন থেকে মুছে যায়নি।

খাওয়া দাওয়ার পর বাজারের থলি হাতে উঠোনে নামতেই বঙ্কুবাবুর পিছু নেয় বরুণ—চলুন।

এই রোদ্দুরের মধ্যে তুমি আর কষ্ট করবে কেন বাবা। ঘরে বসে বরং....

পেসেন্স খেলবো?

বাবাজীবনের প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পান না বঙ্কুবাবু। বরুণকে পাশে রেখেই বাজার সারতে হয়। গোপালের রেওয়াজী খাসির মাংস। ট্যাপার ইঞ্চি চিংড়ি। রতনের রুই থেকে একেবারে জীবনের তরকারি। কোথাও একটি টাকাও খরচ করতে দেয় না বরুণ। বাজার শেষে রিকসায় সওয়ার হয়ে মনটা একটু ফুরফুরে হয় বঙ্কুবাবুর। পাশে বসা বরুণকে মনে হয় সুপ্রতিম। অবসর প্রাপ্ত বাবার পাশে লায়েক ছেলে।

আপনি একটা ছেলে রাখতে পারেন না? মানে কাজের লোক? বঙ্কুবাবুর স্বপ্নের ঘুড়ি ভো-কাট্টা করে জানতে চায় বরুণ।

দরকার কি? নিজের ছেলেই যখন পর হয়ে গেছে—দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে উদাস হন বঙ্কুবাবু—তাছাড়া রোজ তো আর বাজার করার দরকার হয় না।

ক্যাশ-ট্যাস কতো আছে ব্যাঙ্কে?

তেমন কিছু নয়, প্রশ্ন তো নয়, যেন বিষ মাখানো তীরের আঘাতে আহত হন বঙ্কুবাবু।

দশ, বিশ, পঁচিশ লাখ? রিপিট করে বরুণ।

পে কমিশনের আওতায় পড়লে লাখ দশেক...।

দরকার নেই। আপনি শুধু প্রচার করে দিন। শম্পার দাদা-বৌদির কানে যে করেই হোক গুজব একটা গুজে দিন। আপনার স্থাবর অস্থাবর আর সেটেলমেণ্টের লাখ বিশেক নগদ আপনি আমাকে দান করে দেবেন—

বিশ্বাস করো বাবা—চলন্ত রিক্সার ঝাঁকুনি উপেক্ষা করে বরুণের হাত চেপে ধরেন বঙ্কুবাবু।

দূর মশাই, বিশ্বাস করতে যাবো কোন দুঃখে, এক ঝটকায় হাত টেনে নেয় বরুণ।

আমরা আর ক'দিন। তারপর যা থাকবে সবই তো তোমাদের, করুণ সুরে বেজে ওঠেন বঙ্কুবাবু।

আপনি কি সত্যি সত্যি দান করবেন? দান করার ভান করে ছেলে ফেরাবেন। আপনার দ্বারা কিচ্ছু হবে না। রুটি আঁখের গুড় আর গুচ্ছের মুখ ঝামটা খেয়েই জীবন কাটাতে হবে। বোনলেস। মেরুদণ্ডহীন বাপ অথবা স্বামী। মোষ্ট ইম প্রাকটিক্যাল। আপনারা শুধু গুজবে কানই দিতে পারেন। গুজব ছড়াতে পারেন না, বরুণের কথার একটি শব্দও কানে ঢোকে না বঙ্কুবাবুর। কারণ ততক্ষণে রিকসা দাঁড়িয়ে পড়েছে 'সরমার সংসার' বাড়ির সামনে।

দেখো বাবাজীবনের কাণ্ড দেখো—বাজারের থলি রান্নাঘরের বারান্দায় নামিয়ে উচ্ছ্বসিত হন বঙ্কুবাবু—একগাদা টাকার বাজার করেছে।

শ্বশুরের স্বভাব টের পেয়েছে, মাছ মাংসের থলি হাতে তুলে নিয়ে স্বামীকে একটু ঠুকে দেন সরমা। বঙ্কুবাবুর কৃপণ বদনামটা সরাসরি বা শুনিয়ে একটু ঘুরিয়ে জানিয়ে দেন বরুণকে। কিন্তু না, রাগ করেন না বঙ্কুবাবু। রাগ করবেনই বা কেন? বরং আনন্দে মাথা নাড়েন। পৃথিবীর শাশ্বত সত্যটা আর একবার প্রমাণিত হওয়ায় খুশি হন। যাদের জন্য খরচ সংকোচ করতে বাধ্য হয়েছেন, তারা বলেন কৃপণ।

রেড মিট এখানে কত করে? গর্বে প্রগলভা হয় শম্পা।

দু'শো আশি। কিন্তু চা কোথায়? চা, রুমাল মেলে মুখ মুছে নেয় বরুণ।

চা? এখন তুমি চা খাবে?

খাক না। চায়ের কি কোনও টাইম আছে? তাছাড়া বাজার ফেরৎ এক চুমুক চা মন্দ লাগে না। যাও, দু'কাপ চা বানিয়ে আনো—শম্পাকে পরামর্শ দেন বঙ্কুবাবু।

তুমিও এখন চা খাবে? বাবার বায়নায় বিরক্ত হয় শম্পা।

আমি তখনই ভেবেছিলাম। বাজার থেকে মেরে আসলেই ভালো হতো। চলুন, সামনেই তো তিনমাথার মোড়ে দোকান দেখলাম, শ্বশুরমশাইয়ের হাতে টান দেয় বরুণ, চলুন। চলুন।

না, কোথাও যাবে না। চা খেতে হয় বাড়ি বসেই খাবে—তর্জনী উঁচিয়ে প্রায় তেড়ে আসে শম্পা।

আঙুল নামিয়ে কথা বলো, রুখে দাঁড়ায় বরুণ।

তোমার ভয়ে? নামাবো না আঙুল। কি করবে শুনি।

ভেঙে দেবো। মটাস করে আঙুল ভেঙে দেবো।

দাও তো দেখি, কেমন ক্ষমতা—মোরগ লড়াইয়ের ভঙ্গিতে ঘেঁটি টান করে শম্পা।

দেখছেন তো! শেষপর্যন্ত একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেলে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না, বঙ্কুবিহারীর এজলাসে আগাম নালিশ জানায় বরুণ।

আহ! কি শুরু করলি তোরা, রান্নাঘর ছেড়ে দমকল হতে চান সরমা—এখুনি পাঁচটা পড়শী জানতে চাইবে, ও দিদি, তোমাদের বাড়ি সকাল সকাল ডাকাত পড়লো কেন? আমার হয়েছে যতো জ্বালা।

হওয়াই উচিৎ।

কেন বাবা? আমি কি করলাম? বরুণের অযাচিত জবাব শুনে অবাক হতেও ভুলে যান সরমা।

মেয়েকে ছোটবেলা থেকে আচার ব্যবহার শেখাতে হয়, উচিৎ কথা বলার মতো বলে ফেলে বরুণ।

ঠিক! ঠিক বলেছ! তোমার বাবা-মায়েরও উচিৎ ছিলো ছেলেকে শাসন করা। আদরে আদরে....।

শ-ম্-পা! চিৎকার করে মেয়েকে শান্ত করে বঙ্কুবাবু।

আর ঠিক তখনই সামনের বাড়ির গোধূলির মা বিড়াল গতিতে গলি-রাস্তা পার করে এসে দাঁড়ান বঙ্কুবাবুদের উঠোনে—কি গো দিদি, শম্পা অমন চিৎকার করছে কেন?

আনন্দে! আপনার মাথায় বাজ পড়বে, সেই আনন্দে—

কথার কি ছিরি। আমার মেয়ে হলে মুখে কালমেঘের রস ঠুসে দিতাম এক কলস। ছিঃ ছিঃ। পাড়া প্রতিবেশী, বিপদে আপদে খোঁজ নিই কিনা, তাই আমার মাথায় বাজ ফেলতে পারলি, শম্পার কথার প্রতিবাদে দুই পা চারবার উঠোনে ঠুকে নেন গোধূলীর মা—বালাই ষাট। আমার এখনও দুই মেয়ের বিয়ে বাকি। তোর বাপের তো সে সব পাঠ চুকে বুকে গেছে। বাজ পড়ুক তোর বাপের মাথায়। অসভ্য অভদ্র মেয়ে কোথাকার। বড়লোক বর পেয়ে একেবারে হাতির সাত পা

দেখেছে।

আহ! দিদি, আপনি একটু চুপ করবেন—অনুরোধ করেন সরমা।

করবো। ঠিক, চুপ করবো। যেদিন তোমাদের দেমাক ভাঙবে, সেদিন ঠিক চুপ করবো। একটা তো মোটে ছেলের বউ। তার সঙ্গেও ঘর করতে পারলে না। আর পারবেও না কোনদিন, দু'হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঠালি কলা দেখাতে দেখাতে নিজের বাড়ি ফিরে যান গোধূলীর মা।

এ সব তোমার জন্যে। মান সম্মানের তো বালাই নেই—বঙ্কুবাবুকে উদ্দেশ্য করে জামাইয়ের সামনেই মুখ খুলতে বাধ্য হন সরমা।

শুধু শুধু নিরিহ নিপাট মানুষটাকে দোষারোপ করছেন কেন? প্রতিবাদ করে বরুণ—আসল কালপ্রিট তো আপনার মেয়ে। এককাপ চায়ের জন্যে একেবারে লঙ্কা কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলো।

দেখো, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবে না, সরাসরি থ্রেট করে শম্পা, সকাল থেকে একের পর এক ক্যাচালটা কে করছে শুনি? আমার তো মনে হয় তুমি প্লান করে আমাদের হ্যাক্‌ল করছো।

বেশ, তাই যদি হয় আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি—তাড়া খাওয়া হরিণের চনমনে পায়ে ঘরে ঢোকে বরুণ।

তোমারও কি মাথা খারাপ হলো বাবাজীবন? চুরির দায়ে ধরা পড়া অপরাধীর মতো বরুণের পিছন পিছন ঘরে ঢুকে দাঁড়ান বঙ্কুবাবু। ধমক দেন সরমাকে—এখনও এককাপ চা করতে পারোনি।

মা, শিগ্‌গির এসো। মাছের থলি নিয়ে হুলোটা চম্পট দিয়েছে, রান্নাঘর থেকে তারসপ্তকে চিৎকার করে শম্পা।

যাক গে, সব নিয়ে যাক। আমি আর পারিনে, কোমরের বাতের ব্যথা মনের ভিতর চেপে রান্নাঘর মুখো হন সরমা। পাড়া খেদানো হুলোর উদ্দেশে হা রে রে রে তেড়ে যান বঙ্কুবাবু।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয় বরুণ। শম্পার কাছে জানতে চায়—তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

কোন হলে? সকালের সব এপিসোড ভুলে ডগমগ হয় শম্পা।

জঙ্গল মহলে।

মানে?

বাড়িতে। বাড়ি ফিরে যাবো। তোমার কাছে তো আমাদের বাড়িটা জঙ্গল মহল, তাই বললাম, শান্ত সমাহিত মেজাজে জানিয়ে দেয় বরুণ।

আজই, এখনই বাড়ি যেতে হবে কেন? তুমি যে বলেছিলে কয়েকদিন থাকবে? বিছানার উপর গ্যাট হয়ে বসে শম্পা।

আমি থাকলে তোমাদের প্রবলেম হবে। তোমার মা বাবার অসম্মান হবে। পড়শীরা অপমান করে যাবে। ইলিশ মাছের থলি নিয়ে হুলোয় হুল্লোড় করবে, একে একে শম্পার কাছে এতক্ষণের সব ফিরিস্তি উজাড় করে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত হয় বরুণ।

এগুলোর কোনটা বেঠিক শুনি? সদ্য পার্লার থেকে সুতোর টানে ছেঁড়া ভ্রুযুগল তিনশ ষাট ডিগ্রি কোণে স্থাপন করে শম্পা। কিন্তু না, উত্তর দেওয়ার তোয়াক্কা করে না বরুণ।

উত্তর দিচ্ছে না যে, বিছানা ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে বরুণের পিঠে ঠেলা দেয় শম্পা—তুমি যাবে যাও। আমি যাবো না।

উত্তর দেয় না বরুণ। শুধু মৃদু হেসে ঘাড় দোলায়। মোজা পরা শেষ করে আর একবার ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে ছুড়ে দেয়। ধীর পায়ে ঘরের বাইরে আসার আগে আরও ধীর গলায় শম্পাকে জানিয়ে দেয়—বালিশের নিচে তিন হাজার রেখে গেলাম। প্রয়োজনে খরচ করো।

এবার সত্যি সত্যিই পিঁত্তে আগুন লাগে শম্পার। এমন তো কোনওদিন হয়নি। স্ত্রীকে রেখে যাওয়ার আগে এই ড্রেসিং টেবিলের সামনেই দাঁড়িয়েই শম্পার কবুতর বুকের উষ্ণতা অনুভব না করে বরুণ তো কখনও ঘর ছাড়েনি। কি এমন অন্যায় হলো যে সব উলট পালট করে তিনদিন থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসা বরুণকে এখনই ফিরে যেতে হবে? বাবা মা শুনলে কি ভাববেন? মায়ের কষ্ট হবে। বাবা দুঃখ পাবেন। সব দায়ের পাহাড় এসে চেপে বসবে শম্পার ঘাড়ে। অথচ কেন?

বাবা মাকে একবার ডাকো, বারান্দায় বসে জুতো পরা শেষ করে বরুণ।

শম্পাকে আর কষ্ট করে ডাকতে হয় না। আঁচল বিছিয়ে মেঝেতে শুয়ে ভাতঘুম উপভোগ করা ছেড়ে নিজেই বরুণের সামনে এসে দাঁড়ান সরমা। পাশে বঙ্কুবাবুও।

আমি আসি। আপনাদের খুব বিরক্ত করে গেলাম। পড়শী দিয়ে অপমান করিয়ে গেলাম। কিছু মনে করবেন না, মাথা নুইয়ে শ্বশুর শাশুড়ির পায়ে হাত ঠেকায় বরুণ।

থাক বাবা, থাক। কিন্তু এমন তো কথা ছিলো না, জড়তার পরতে জড়িয়ে থাকেন সরমা। বাকহীন উদাস চোখ চশমায় ঢাকেন বঙ্কুবাবু।

আমার কাজ শেষ, টানটান খুশি ঝলমল চোখে জানায় বরুণ।

কাজ শেষ মানে? কি কাজ ছিলো বাবা। সেই একবার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বাজারে যাওয়া ছাড়া তো....। কথা শেষ করতেও কষ্ট হয় সরমার।

টাট মানে বাংলায় পাটকেল ছোঁড়ার কাজ, নির্বিকারে শোনায় বরুণ।

তোমার হেঁয়ালিটা ভালো বুঝতে পারি না বাবা। হয়তো বয়েস হয়েছে তাই—

বাবাজীবনের কথা শুনে মনে মনে ক্ষুন্ন হন বঙ্কুবাবু।

আপনাদের মেয়ে আমার সংসারে টিট মানে ঢিল ছোঁড়ে রোজ সারাক্ষণ। উঠতে বসতে অপমানিত হন আমার মা বাবা ভাই বোন। আজ সকাল থেকে আমি স্রেফ নাটক করলাম। সামান্য একাঙ্ক নাটক। এই নাটকের জেরে আপনারা যেটুকু দুঃখ পেয়েছেন তার জন্য আমি অনুতপ্ত। এই অনুতাপটুকু শম্পার গায়ে লাগানোর চেষ্টা করবেন প্লিজ। শম্পার জেদ সামান্য কমলে আমার সংসারে বাবা মা একটু শান্তি পাবেন—বলেই এক লাফে বারান্দা ছেড়ে উঠোন। উঠোন ছেড়ে রাস্তায় পড়ে বরুণ—এই রিক্সা দাঁড়াও।

দেখলে তো মা, কেমন কুচুটে কুচুটে বিচুটি পাতার মতো কথা গায়ে মাখিয়ে দিয়ে গেল? কড়া বিকেলের চড়া আলো উপেক্ষা করে শম্পার চোখে ছল ছল করে ওঠে বাদল মেঘ।

কি হলো? কথা বলছো না যে? বুকে ব্যথা করছে! সরমা ছুটে এসে নাড়িয়ে দেন স্থবির বঙ্কুবাবুকে। জামাইয়ের রিক্সা প্যাক বাজাতে বাজাতে ততক্ষণে পাড়ার গলি পার করে দিয়েছে।

না ভাবছি, বলেই দু'হাত আকাশে তুলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু হন বঙ্কুবাবু—ব্রেভো! বরুণ ব্রেভো! আমি আজীবন টুপি খুলে তোমাকে সম্মান দেখাবো—ব্রেভো।

স্বামী একটি গৃহপালিত জন্তু

'স্বামী' শব্দের অর্থ 'পতি'। 'পতি' অর্থাৎ পতনেই যার ইতি বা শেষ—মোদ্দা কথা, গঙ্গাপ্রাপ্তি! স্বামীকে কেউ কেউ সোয়ামি অর্থাৎ 'শোয়াই আমি'-ও বলে থাকেন। কেউ বলেন 'মরদ', মানে—(মরমে) মরে ত্রিভঙ্গ, 'দ' মানে দড়কঁচা মেরে যান যিনি। অর্থাৎ মরমে মরে দড়কঁচা হয়ে থাকা একটি প্রাণী। স্বামী কারো কাছে 'ভাতার'। অর্থাৎ—ভাত আর...'ভাত' মানে খাবার আর 'আর' মানে আনুষঙ্গিক মানে—কাপড়-চোপড়, গয়নাগাঁটি, ঘরবাড়ি, গাড়িটাড়ি ইত্যাদির সরবরাহকারী। 'স্বামী' বোঝাতে 'মিন্‌সে' শব্দের চল আছে গ্রামে-গঞ্জে। সাহেবরা Meaningless দ্বিপদদের 'মিন্‌সে' সম্বোধন করতেন বলেই স্বামীরা সব মিন্‌সে। 'বর্বর' শব্দের অপভ্রংশ 'বর' নামেও স্বামীরা সর্বাধিক পরিচিত। আধুনিক সমাজের ললনাকুল বিশ্বায়নের দাপট শুরু হওয়ার অনেক আগেই স্বামী-কে 'হাজবেন্ড' বানিয়েছেন। হাজবেন্ড হল দু'টি ইংরেজি শব্দের মিলিত অপভ্রংশ। হ্যাজ (has) আছে, bent বাঁকা। বাঁকা কিংবা মেরুদণ্ডহীন কুঁজো হয়ে আছেন যিনি তিনিই ললনাকুলের হাজবেন্ড।

স্বামীদের দেখতে অবিকল মানুষের মতো। কেউ কেউ স্বামীদের 'মানুষ' বলে ভুলও করেন। মতান্তরে জানা যায় মানুষের মান এবং হুঁশ বাদ দিলে যে দ্বিপদ জন্তুটির সন্ধান পাওয়া যায় তারাই স্বামী। এদের একটি ঘিলুহীন, স্ববোধ, সুবুদ্ধিহীন মাথা, দু'টি বধির কান, দৃশ্যপঙ্গু (অর্থাৎ দেখেও না দেখতে পাওয়া) দু'টি চোখ, স্বাদহীন একটি জিভ, বাক্যহীন একটি মুখ আছে (অন্তত থাকার কথা)। এদের শরীর আছে কিন্তু তাকৎ নেই। দু'টি হাত অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রতিবাদী মুষ্ঠি নেই। দু'টি পা থাকলেও তা কেবলমাত্র রোজগারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া স্ব-ইচ্ছায় চালনা করার স্বাধীনতা নেই। এদের মাথায় চুল, গালে দাড়ি ও ঠোঁটের ওপর গোঁফ পরিলক্ষিত হয়। কাতারে কাতারে গোঁফহীন স্বামীরাও সংসারে অকাতরে বসবাস করেন।

স্বামীত্বে উত্তরণের পূর্বে এদের স্বভাবে সিংহের বলিষ্ঠতা থাকে। ক্রমে ক্রমে স্ত্রী-প্রভুর অঙ্গুলি হেলন, লাল, গোল কিংবা চ্যাপ্টা চোখের ধমক-ধামকে মুষিকের স্বভাবপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং সাধারণভাবে স্বামীরা অতি নিরীহ মিন্‌মিনে স্বভাবের

মিন্‌সে। স্ত্রী-প্রভুর প্রতি আনুগত্যহীনতায় চরম অশান্তি উদ্রেক হওয়ার ভয়ে এঁরা চিরকাল বশংবদ থাকতে ভালোবাসেন। ব্যতিক্রমী স্বামীরা আদালতের দুয়ার পর্যন্ত দৌঁড়ে খোরপোষসহ নানাবিধ শাস্তি ভোগ করে থাকেন। যদিও শাস্ত্রে কথিত আছে স্বামী স্ত্রীর সহধর্মী, তথাপি ধর্মের কূট-কচালে 'মৌলবাদী' আখ্যায় ভূষিত হতে পছন্দ করেন না স্বামীকূল। নীতির উদারতা প্রদর্শন পূর্বক নীতিহীন জীবনে দৈনন্দিন উদর-পূর্তিতেই তাঁদের আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। ধম্মোকম্মো যা করার স্ত্রীরাই করুক। স্বামী নির্বিকার হয়ে নিরাকার ব্রহ্মের মতোই ভূমিকাহীন জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। চরিত্রগত ভাবে স্ত্রীরা পরশ্রীকাতর হয়ে থাকেন, কিন্তু স্বামীদের সেই সুনাম (কিংবা বদনাম) নেই। তাঁরা কিঞ্চিৎ পরস্ত্রীকাতর, কারণ এপারের নদীর ভাবনায় থাকে ওপারের সুখের স্বপ্ন। পরস্ত্রীকাতর হলেও স্বামীরা পরস্ত্রী গমনে ভীত হন, কারণ নিজ স্ত্রীর কানে সে সংবাদ পৌছালে ঝাঁড়ুর বাড়িতে দেহের ছাল উঠে যাওয়ার গ্যারান্টী থাকে। সুতরাং পরস্ত্রীর লোভ মনের আড়ালে লুকিয়ে মনে মনে পরস্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য হন।

এ চরাচরে ইহলোকের ঘরে ঘরে স্বামীদের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষ বিবাহিত হয়ে স্বামীতে রূপান্তরিত হন। আমরা জানি, জীবনচক্রের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে শুঁয়োপোকা প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু স্বামীদের ক্ষেত্রে প্রজাপতি অর্থাৎ মানুষ (সুন্দর স্বচ্ছ সাবলীল) বিবাহিত জীবনের চাকে ঘুরতে ঘুরতে কুৎসিত কদাকার শুঁয়োপোকায় পরিণত হয়ে 'স্বামী' রূপ ধারণ করেন। স্বামী প্রাপ্তির নানাবিধ উপায় আছে। উদাহরণস্বরূপ দু'একটি পন্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রাক বিবাহঘটিত প্রেমের মাধ্যমে—একটি সুদর্শন সুপুরুষ যুবক দিনের পর দিন গড়ের মাঠে কিংবা পার্কের কোণে অথবা নন্দন-র নান্দনিক সাংস্কৃতিক কাননে ঘাস (অথবা ঘাসফুল) দাঁতে কাটানোর অভ্যাস করিয়ে ভবিষ্যৎ তৃণভোজী প্রাণীতে (অহিংস) পরিণত করার মহড়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়-পরিজন, সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাত্রী-নাম্মী ভবিষ্যৎ প্রভুর বিজ্ঞাপিত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত অভিভাবকদের হাজার কথার জালে বন্দী করার মাধ্যমে। তৃতীয়ত, নগদ অর্থ ও প্রচুর দানসামগ্রীর দৌলতে 'স্বামী' নামক জন্তু ক্রয় করা যেতে পারে। চতুর্থত, ডেসপারেট অর্থাৎ মরীয়া হয়ে ভগবানের প্রসাদী সিঁদুর কপালে লেপ্টে 'স্বামী' নামক অতিশয় প্রভুভক্ত জন্তুটিকে পাওয়া যায়। এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে নুন আনতে পান্তা ফুরোলেও স্ত্রী আনতে স্বামী ফুরোয় না। আইনের অনুশাসনে এক স্ত্রীর নির্দেশ থাকলেও চোরাগোপ্তা একাধিক স্ত্রী-প্রভু পালন করার রেওয়াজ এখনো প্রচলিত। অনুরূপভাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বন্ধুর ছদ্মবেশে একাধিক স্বামী পালন করে স্ত্রীও গৌরবান্বিত হন। অতএব হাত বাড়ালেই বন্ধু পাওয়া যাক কিংবা না যাক স্বামী পাওয়া যায়। স্বামীর সন্ধানে আসমুদ্র হিমাচল দৌড়তে হয় না। জপতপের

প্রয়োজনও নেই। যদিও ধান (এক্ষেত্রে কুমারীত্ব) ভাঙতে গ্রামে গঞ্জে এখনও শিবের গীত গাওয়ার রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। বক্র চোখের চাহনি, দেহের লোভ ইত্যাদির মাধ্যমেও স্বামীপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। অন্য একপ্রকার স্বামীদের সন্ধানও চরাচরে পাওয়া যায়। তারা পলায়নবাদী স্বামী। সংসার ধর্মের প্রতি অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞ। অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্মের বিপরীত স্রোতে বহমান হয়ে সংসার-মায়ামোহ (!) ত্যাগপূর্বক নিজেদের ঈশ্বরের দূত মনে করেন। অতএব এই রচনায় তাঁদের প্রসঙ্গ নিতান্তই অমূলক, অর্থহীন। তাঁরা ধর্মানন্দে ব্রহ্মানন্দ জীবনজাপন করুন।

স্বামীরা অতিশয় পত্নীনিষ্ঠ ভদ্রলোক। কর্মঠ, বিনয়ী এবং 'ইয়েস ম্যাডাম'। বিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর (কেউই সাধারণত ফেল করে না) থেকেই স্ত্রীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন হিসেবে চোখের মণির মতো রক্ষা করার চেষ্টায় তৎপর থাকেন। এই পর্যায়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে অত্যধিক আসক্ত থাকার কারণে স্ত্রীরা সহজেই তাঁদের সত্ত্বা হরণ করতে সমর্থ হন। বিবাহ-উত্তর দিনগুলির একেবারে প্রথম পর্যায়ে স্বামীরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। মানসিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ এই বুঝি 'স্ত্রীর পর্যাপ্ত ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে অসমর্থ হলাম' গোছের চিন্তায় নিজের প্রাক বিবাহিত জীবনে অর্জিত যাবতীয় সম্বল, যথা—ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, পছন্দ-অপছন্দ, জয়-গৌরব ইত্যাদি উজাড় করে কৌপীন সর্বস্ব হয়ে ওঠেন। ফুলশয্যার ফুলেল বিছানায় বসে তারিয়ে তারিয়ে নিজের যাবতীয় দুর্বলতা—পাড়ার টেঁপির সঙ্গে ইন্টু-পিন্টুর খবরাখবর সব শুনিয়ে নববধূকে নবআনন্দে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি ঢেলে একেবারে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে যান। গৃহপালিত গার্হস্থ্য জীবনের সেই শুভ সূচনা। বিয়ের পর দু'এক বছর (নিদেনপক্ষে) ডালপালাহীন ফুরফুরে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চিত থাকার বাসনায় প্ররোচিত স্বামী নেশাগ্রস্থের মত্ততায় বুঁদ হয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে আনাড়ি 'পিল' সেবনে (বিজ্ঞাপনের বাহুল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে এবং লজ্জাবশত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই) গর্ভসঞ্চারে স্ত্রীর মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার দশা হয়। স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান উৎপাদন রীতিমতো বর্বরতা। অন্তত দু'বছর ফুরফুরে জীবন যাপন, স্বামী-শাশুড়ি- দেওর-ননদের মুণ্ডু চর্বণ, নিজের মা-ভাই-বোনের শখ-আহ্লাদ পূরণ না করে সন্তান ধারণ এবং পালনের হ্যাপা নিতে চান না স্ত্রীকূল (বিশেষত শহুরে এবং আধা শহুরে স্ত্রীরা)। সুতরাং ট্যাঁকের কড়ি নার্সিংহোমে গুঁজে চুপি চুপি অ্যাবরশন। শুরু হয় ভবিষ্যৎ যাবতীয় শারীরিক জটিলতা কেনার মহড়া। (প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন, বিবাহ অর্থ ধ্বংসকারী রোগবীজ কেনার অন্যতম উৎকৃষ্ট ও সহজ মাধ্যম।) দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্তানের পিতৃত্ব স্বামীদের কতটা গৌরব বর্দ্ধন করে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতান্তর আছে। তবে স্ত্রীরা আহ্লাদিত হন, কারণ স্বামীদের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ বাড়ে। সন্তানের এক বছর বয়স পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ স্বামীদের অপরিহার্য, কারণ সন্তান উৎপাদন করার পর দৈহিক ক্ষয় পূরণের স্বার্থে

স্ত্রীর অফুরাণ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। হাঁ মুখে কিঞ্চিৎ নাসিকা গর্জনের সুর ছড়িয়ে আলুথালু বেশে গভীর নিদ্রাদেশে গমনের চেয়ে ভালো বিশ্রাম আর কী হতে পারে? অতএব অবলা শিশুর মুখে ঘড়ির কাঁটায় ফিডিং বোতল, জলের শিশি তুলে দেওয়া এবং হিসি করে ভেজানো কাঁথা-তোয়ালে (এখন কাঁথা পাওয়া যায় না, কারণ কাঁথার কারিগর ঠাকুমা-দিদিমারাও ক্রমাগত আধুনিক হয়ে উঠেছেন অথবা বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়েছেন) বদলানোর জন্যে স্বামীর পাহারাদারি রাত্রি-জাগরণ 'স্বামী-ধর্মের' অবশ্য কর্তব্য কর্ম। তৃতীয় পর্যায়ে ভাঙনের গান। সন্তান এবং সংসার ঘিরে ক্রমাগত নালিশ স্বামীদের বধির কানকে আরো বধির ঝামার মতো ঝরঝরে করে তোলে। স্ত্রী-ধন জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, বাকি সব বেনোজলে ভেসে আসা পরজীবী মাত্র। শাশুড়ি-ননদ-দেওর সুখের ফুলে বিষের কাঁটা। হাম দো হামারে দো (এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়) নিয়েই তো জীবন। তাছাড়া এখন কত সুবিধে—ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাট হাওয়ার ঋণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে ব্যাঙ্ক। চারচাকায় সওয়ার হওয়ার সওদাগর ফিনান্সারের অভাব নেই। (ই এম আই যোগাতে লিপস্টিকের পয়সা ফুড়ুৎ হলে তো চলবে না বাপু! বিয়ে করার সময় মনে ছিল না, সংসার করতে হবে?) সুতরাং অসহায় স্বামী সিগারেট ছেড়ে বিড়ি (তারই বা দাম কি কম?), বাস ছেড়ে পয়দল, টিফিন ছেড়ে কর্পোরেশনের জল পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করেন। চতুর্থ পর্যায়ে সন্তানের শিক্ষা নিয়ে চলে স্বামী-স্ত্রীর দলমাদল কামানের যুদ্ধ। ডাক্তার না ইঞ্জিনীয়র, সংস্কৃতিমনা (ধুস, সে মন তো কবে মরে পচে হেজে গেছে) স্বামী চান সন্তান তার শিল্পী হোক, কবি হোক। স্ত্রী ধমকে ওঠেন—নৈব নৈব চ। আমার সন্তান তোমার মতো মিন্‌মিনে মিন্‌সে হবে? মোটেও না। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হবে। এম.বি.এ. হবে। সেই সঙ্গে হবে ক্রিকেটার, মিউজিসিয়ান, ড্যান্সার। এক্কেবারে মডার্ন। সেলিব্রিটি। রাস্তার লোক টেরিয়ে তাকিয়ে থাকবে। বলবে ওই দ্যাখ—পাপুর মা যাচ্ছে। (শেষপর্যন্ত অবশ্য 'ধুস শালা' হয়।) পঞ্চম পর্যায়ে কোলেস্টেরল, প্রেসার, বাত, অম্বল, ফিসার, ফিসচুলা, গাঁটের ব্যথা ইত্যাদি স্বামীদের শরীর অলংকৃত করে রাখে। সম সময়ে স্ত্রী-রোগ পীড়িত স্ত্রী-প্রভুর চিকিৎসা নির্বাহের কারণে স্বামীরা সাধারণত ডাক্তার-বিমুখ হন এবং বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে (বাঙালীরা কমবেশি সবাই এক একজন ডাক্তার—এ্যালোপাথি কবিরাজি হোমিওপ্যাথি-র বিশারদ) নাক্সভমিকা, রাসটক্স, তেলাকুচা পাতার রস, উচ্ছের কাথ, ত্রিফলার জল ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাবিজ-কবজ, শেকড়-বাকড় অঙ্গে ধারণ করে বেঁচেবর্তে থাকার আনন্দে মশগুল থাকেন। ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ পর্যায় স্বামীদের গৃহপালিত জীবনের মোক্ষদানন্দ জীবন। পার্কের কোণে, প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে কাটে সকাল-সন্ধে। অলস দুপুরে মনের ঝুলি ঝুড়ি হাতড়ে স্মৃতি রোমন্থনের ফাঁকে ফাঁকে থাকে স্ত্রী-প্রভু নির্দেশিত সংসারের টুকিটাকি কাজ। আর নিদ্রাহীন রাতে ফ্ল্যাট কিংবা ঘরের অব্যবহৃত কোণে একলা চলার শপথে দৃঢ় স্বামী

তোষকহীন (পিঠে স্পণ্ডেলাইটিসের ব্যথা না থাকলেও তোষক তখন বিলাসিতার বিছানা) খাটে শুয়ে শুনতে পান সেই গানের সুরেলা আহ্বান—হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল...

স্বামী নিঃসন্দেহে একটি উপকারী প্রাণী। সভ্য সমাজে জীবনধারণের জন্যে যে তিনটি মহার্ঘ্য বস্তুর দরকার তা হল অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান। বিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই স্বামীরা স্ত্রীদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান করতে জীবনযুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের কৃতার্থ করেন। কিছু কিছু স্বামী স্বভাবের দোষে মাঝে মাঝে ফোঁস করলেও কামড়ান না এবং স্ত্রীদের কোনো দোষ ফাঁসও করেন না। স্বামীরা চাটুকারিতা পছন্দ করেন। এরা স্ত্রীদের সামান্য হাসিমুখ দেখলে মনে মনে গর্ব অনুভব করেন। বাহু-সংলগ্ন অবস্থায় স্বামীদের কাছে যে কোনো বায়না করা যায়। স্বামী জন্তুটিকে শিখণ্ডীর মতো ব্যবহার করে সংসার যুদ্ধ জয় করা যায়। স্বামীর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় ধন-সম্পত্তিতে স্ত্রীর আইনানুগ উত্তরাধিকার থাকে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের লিখিত অলিখিত দায় দায়িত্বও প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং স্ত্রী-প্রভুরা মুক্তকচ্ছ জীবনযাপন করতে পারেন। স্বামী মারা গেলে চাকরি, পেনশন সহ নগদ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। একগুচ্ছ দেবরের সহানুভূতি প্রাপ্তি হয়। ক্ষেত্রবিশেষে পুনরায় বিয়ে করে নতুন একটি 'স্বামী' পোষার আনন্দেও মেতে থাকা যায়। সুতরাং স্বামীর উপকারিতা বহুমুখী, বহুবিধ, বহু ধারায় বর্ষিত।

কিছু ট্যারা অর্থাৎ 'গুঁয়ে' স্বামী অবশ্যই সংসারে অপকারের কারণ হন। এইসব স্বামীদের মগজে গিজ্‌গিজ্ করে সেকেলে মৌলবাদী চিন্তা। এঁরা অনেকাংশে নিজেদের হামবড়া 'মরদ' প্রতিপন্ন করতে চেয়ে স্ত্রীদের বিড়ম্বনা ও অশান্তির কারণ হয়ে ওঠেন। এই গোত্রীয় স্বামীদের মন অতিশয় সন্দেহপ্রবণ হয়। ফলে স্ত্রীদের যথেচ্ছাচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ব প্রবণ. ঋজু মেরুদণ্ড যুক্ত স্বামীদের সন্ধান যদিও পাওয়া যায় না, তবুও 'ব্যতিক্রম' হিসেবে একটুকরো এমন হীরে কোনো স্ত্রীর ভাগ্যে পতিত হলে সংসারের অশান্তি বৃদ্ধি পায়। স্বামীরা মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃভক্ত, ভগ্নীভক্ত হলেও সাংসারিক অশান্তির চাষ শুরু হয়। উপার্জন-অক্ষম স্বামী অন্ন ধ্বংস করে সংসারের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন। বিপরীত মেরুতে প্রকৃত অর্থে স্ত্রী-রা তেমন বেকার নন কারণ রান্না বান্না ঘরকন্যায়. শিশু প্রতিপালন এবং শিশু-শিক্ষিকার (মাইনে করা আন্টি থাকা সত্ত্বেও) ভূমিকায় নিজেদের বহাল রেখে স্বামীর সাশ্রয় করেন। পরস্ত্রীকাতর স্বামীরা উঠতে বসতে নিজ নিজ স্ত্রীদের শ্লাঘার কারণ হন। পরস্ত্রীর রূপ-গুণ বর্ণনায় বিভোর হয়ে স্ত্রী-প্রভুকে উপেক্ষার করুণ দৃষ্টিতে দেখেন। পরস্ত্রীকাতরতা অবশ্যই গৃহপালিত জন্তুদের পক্ষে চরম বেমানান। 'পরকীয়া' শাস্ত্র সম্মত হলেও সংসার-সম্মত নয় (যদিও এই দোষে দুষ্ট স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই। স্বামীদের মতে নিজের স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীর সব মহিলাই সুন্দরী আর

স্ত্রীরা ভাবেন নিজের পোষা জন্তুটি ছাড়া অন্যরা কাটেও না গুঁতায়ও না।)

বিশ্ব-আলয়ে যতদিন জীবনের চিহ্নমাত্র থাকবে ততদিন 'স্বামী' থাকবেন। কারণ বিয়ে নামক বন্ধন বা জেলযাত্রা মাকাল ফলের মতোই সুদৃশ্য কিংবা কিংশুক পলাশের মতোই মনোরম। সে ফল বা ফুলে না আছে স্বাদ, না আছে গন্ধ। স্বাদগন্ধহীন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত স্বামীরা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ এবং উপযুক্ত স্বামী। 'লোকরহস্য' উন্মোচনে শ্রীমৎ স্বামী বঙ্কিমচন্দ্রকে আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে, যদিও তিনি বর্তমান প্রজন্মের কাছে নামগোত্রহীন, সেকেলে। অপকারিতার তুলনায় স্বামীর উপকারিতা অজস্র ও অপ্রতুল। মনুষ্যকুলে এরা দু'কানকাটা, লাজলজ্জা-ভয়-ডরহীন জীব। স্ত্রীর স্তাবকতা করতে করতে এরা 'স্ত্রৈণ' নামক শিলাখণ্ডে পরিণত। নুড়ি-পাথরের মতো এরা খলের ('খল' মানে চতুর) বুকে স্ত্রী-যাদুকরের নুড়ি (অঙ্গুলি) হেলনে পিষ্ট হয়ে সুখাবিষ্ট থাকেন। গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে সংসারে 'স্বামী'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণী বিরল। প্রাচীন সমাজের সেইসব সংস্কারকদের ধন্যবাদ, যাঁরা 'স্বামী' পোষ মানানোর যন্ত্রী 'স্ত্রী' নামক কৌশল আবিষ্কার করে পৃথিবী নামক গ্রহে 'বিপ্লব' এনেছিলেন।